# খজুদা সমগ্র ৫

বুদ্ধদেব গুহ

# ঋজুদা সমগ্র ৫

## বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ

**প্রথম সংস্করণ** জানুয়ারি ২০০৪ **মুদ্রণসংখ্যা** ২০০০
**দ্বিতীয় মুদ্রণ** ফেব্রুয়ারি ২০০৫ **মুদ্রণ সংখ্যা** ২০০০

© বুদ্ধদেব গুহ

ISBN 81-7756-407-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীর কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০০.০০

# ভূমিকা

ঋজুদা কাহিনিগুলি শুধুমাত্র কিশোর পাঠ্য নয়, বাড়ির সকলেরই সমান ভাললাগার।

'ঋজুদা সমগ্র'র পঞ্চম খণ্ডে পাঁচটি ঋজুদা কাহিনি সংকলিত হল। এর মধ্যে একটি, 'ফাগুয়ারা ভিলা' গোয়েন্দা কাহিনি। তোমরা এবং তোমাদের বাড়ির অন্যরা যাঁরা 'ঋজুদা সমগ্র'র আগের চারটি খণ্ড পড়েছ তারা জানো যে 'অ্যালবিনো', 'রুআহা', 'ঋজুদার সঙ্গে সেশ্যেলস আইল্যান্ডে' এবং 'কাঙ্গপোকপি'-র মধ্যে 'রুআহা' পূর্ব আফ্রিকার রুআহা ন্যাশনাল পার্ক ও রুআহা নদীর উপত্যকায় বিশ্বাসঘাতক ভুষুণ্ডাকে শিক্ষা দেওয়ার কাহিনি, 'ঋজুদার সঙ্গে সেশ্যেলস আইল্যান্ডে' জলদস্যুদের দুই পরিবারের মধ্যে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন নিয়ে বিবাদের প্রেক্ষিতে লেখা, 'কাঙ্গপোকপি' মণিপুর আর বার্মার (এখন যার নাম মিয়ানমার) পটভূমিতে একটি মস্ত বড় হিরে চুরির রহস্যভেদের গল্প।

এই অবসরে বলে ফেলি যে, কোনও ঋজুদা কাহিনির পটভূমিই কল্পিত নয়। পূর্ব আফ্রিকা থেকে ভারত মহাসাগরের সেশ্যেলস আইল্যান্ডস, বা মণিপুর মিয়ানমার বা আন্দামান আইল্যান্ডস, বা ভারতের নানা প্রান্তের সব বনভূমিতে আমি নিজে ঘুরে আসার পরই ঋজুদা কাহিনি লিখতে বসেছি তোমাদের জন্যে। তাই এগুলি শুধুমাত্র গোয়েন্দা বা শিকার কাহিনি নয়, এগুলি পড়লেও বাড়ি সুদ্ধ সকলের নতুন নতুন নানা জায়গাতে বেড়িয়ে আসার সুযোগ হবে এই সব লেখার মাধ্যমে। নিজে সশরীরে গেছি প্রতিটি জায়গাতেই। ওই সব জায়গা, মানুষজন এবং আরও নানা বিষয়ে ফিরে এসে অনেক পড়াশুনোও করতে হয়েছে যে তা বই পড়লেই তোমরা বুঝবে।

এই খণ্ডে 'ফাগুয়ারা ভিলা' ছাড়া অন্যান্য যে কাহিনিগুলি আছে তাদের একটি 'ঋজুদার সঙ্গে আন্ধারী তাড়োবাতে'। আন্ধারী-তাড়োবা টাইগার রিসার্চ মহারাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত পুরনো পার্ক। এখন অবশ্য ছত্তিশগড়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানে একরকমের গাছ দেখতে পাওয়া যায় তাদের নাম ভূত-গাছ—Ghost Tree বা Karu Gum Tree। এমন রহস্যময়ী ভয় পাওয়ানো গাছ পৃথিবীর আর কোনও দেশে আছে কি না জানি না।

যেসব পত্র-পত্রিকার পুজোসংখ্যাতে ওই সব কাহিনিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল

তাঁদের সম্পাদকদের অনুরোধে অনেকসময়ে ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে গাজোয়ারি করে শিকার কাহিনি ঢোকাতে হয়েছে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। শিকার কাহিনি লেখার আর বেশি লেখক নাকি এখন তাঁরা পান না তাই আমার ওপরে এমন জোরজার করেন। 'কেশকাল-এর বাঘিনী' ছত্তিশগড়ের কেশকালঘাটির পটভূমিতে লেখা। 'ছোটিডোঙ্গরির চিতা' ছত্তিশগড়ের বস্তারের নারায়ণপুর ও অবুঝমার-এর মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট গ্রাম ছোটিডোঙ্গরির পটভূমিতে লেখা। 'লিলি সিম্পসন-এর বাঘ', পালাম্যুর রুদ-এর পটভূমিতে লেখা। এই সব কাহিনির প্রত্যেকটিতেই ঋজুদা এবং তাঁর তিন সার্গিদ রুদ্র, তিতির এবং ভটকাই আছে।

মহারাষ্ট্রের আন্ধারী-তাড়োবা এবং ছত্তিশগড়ের নানা পাহাড় পর্বত দেখা সম্ভব হত না নাগপুরের প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং তাঁর বন্ধুদের উৎসাহ ছাড়া। সব বন্দোবস্ত ওঁরাই করেছিলেন এবং শুধু বন্দোবস্ত নয়, রাজকীয় বন্দোবস্ত। তাই ঋজুদা কাহিনির এই খণ্ডটি আমি তাঁদের উৎসর্গ করে তৃপ্তি বোধ করেছি। তাঁদের ঋণ শোধনীয় নয়, তবে স্বীকার অবশ্যই করা যায়। সেই ঋগ শোধার চেষ্টা নয়, স্বীকার করারই উদ্দেশ্যে এই উৎসর্গীকরণ।

ঋজুদা কাহিনি লিখতে আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। তোমরা যারা ঋজুদার কাহিনিগুলি পড়ো তাদের এসব কাহিনি পড়তে ভাল লাগলেই আমি ধন্য হব। তোমাদের প্রত্যেককে আগামী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে—

ডিসেম্বর, ২০০৩

লেখক

সূচি

ঋজুদার সঙ্গে আন্ধারী তাড়োবাতে ১১
ফাগুয়ারা ভিলা ৭৭
ছোটিডোঙ্গরির চিতা ১৩৫
কেশকাল-এর বাঘিনী ১৬১
লিলি সিম্পসন-এর বাঘ ২০৫

গ্রন্থ-পরিচয় ২৪৮

# ঋজুদার সঙ্গে আন্ধারী তাড়োবাতে

কী সুন্দর হ্রদটা, না? কী নাম বললে? তাড়োবা হ্রদ? তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। ভারতে আর কোনও অভয়ারণ্যেই এত বড় ও সুন্দর হ্রদ নেই।

ভটকাই বলল, শুনেছি রানথামবোরে আছে। রাজস্থানের রানথামবোরে।

রানথামবোরে আমি গেছি। সে হ্রদ এই হ্রদের চেয়ে অনেকই ছোট। তা ছাড়া সেটি হ্রদ নয়, পুকুর গোছের ব্যাপার। রাজার শুটিং লজ ছিল। রানথামবোরের দুর্গও ছিল। হয়তো পরিযায়ী পাখিরা এসে বসবে বলে, এবং রাজস্থানের প্রখর রুখু গ্রীষ্মে লজের কাছে ওই জলা থাকাতে একটু ঠান্ডাও হবে বলেই খোঁড়া হয়েছিল ওই পুকুরটি।

আমি বললাম, আরও একটা কারণ হয়তো ছিল।

তিতির বলল, কী কারণ।

রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যের জংলি জানোয়ারেরা জল খেতে আসত ওই জলাতে, শিকারের সুবিধা হত হয়তো।

ঋজুদা বলল, তা মনে হয় না। তখনকার দিনে রাজা-রাজড়ারা অঢেল এবং দৃষ্টিকটু সংখ্যাতে শিকার যে করতেন তা ঠিক, সেই শিকারের পরিমাণ অনেক সময়েই লজ্জাকরও হয়ে উঠত কিন্তু তাঁরা তবুও অধিকাংশ সময়েই শিকার করতেন শিকারের আইন মেনেই। তৃষ্ণার্ত জানোয়ার যখন জল খেতে আসে তখন তাকে মারাটা কোনও ভাল শিকারির কাজ নয়।

ভটকাই বলল, ভালই ব্যাপার। জল খেতে আসার সময়ে তাদের মারাটা খারাপ কাজ আর জল খেয়ে ফিরে যাবার সময়ে মারাটা ভাল কাজ। নিজেদের চোখ-ঠারার এর চেয়ে কু-দৃষ্টান্ত বোধ হয় খুব বেশি নেই।

ঋজুদা হেসে বলল, ভালই বলেছিস।

তারপরে বলল, তা নয়। ব্রিটিশ আমলে আমরা যখন আইন মেনে শিকার করতে দেখেছি জেঠুমনিদের তখন তো গরমের সময়ে সব শিকার করাই বারণ

ছিল। তখন ছিল closed-season. শিকারেও closed-season ও open-season ছিল। তা ছাড়া, ভারতের সব জঙ্গলেই বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ ছিল পয়লা জুলাই থেকে তিরিশে সেপ্টেম্বর। বেড়াতে যেতেন হয়তো কেউ কেউ এবং বনবিভাগের আমলারা যেতেন কাজে কিন্তু অন্যদের ঢোকা মানা ছিল। শিকারের তো প্রশ্নই ওঠে না। এখনও সব জঙ্গলই ওই সময় বন্ধ থাকে।

তাই? তিতির বলল।

হ্যাঁ। তবে রানথামবোরের জলার সঙ্গে ওই তাড়োবা হ্রদের এক ব্যাপারে মিল আছে।

কোন ব্যাপারে?

ভটকাই জিগ্যেস করল।

ভটকাই যে অনেকক্ষণ চুপ করে ধৈর্য ধরে ঋজুদার কথা শুনল তা দেখে অবাক হলাম। এবারে নাগপুরে আসার পর থেকেই দেখছি ওর চরিত্রে চাপল্য কিছু কমেছে। ঋজুদার প্রশ্রয়ে ক্রমেই ও একটি বাঁদরে পরিণত হচ্ছে। মাঝে মাঝে সত্যিই অসহ্য লাগে।

এই দুজায়গার জলেই কুমির আছে। মানুষ নামলে তো ধরেই, এমনকী পাড়ে উঠে এসেও ধরে। আর জলে নামলে তো কথাই নেই। শম্বর বা হরিণেরা গরমের সময়ে জল খেতে নামলে তাদের হাঁটু বা গোড়ালি কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যায়। একে কুমিরের দাঁতের কামড়, তার উপরে জলে ডুবে দমবন্ধ হয়ে মরার কষ্ট।

ঈসস।

তিতির স্বগতোক্তি করল।

মহারাষ্ট্রের এই তাড়োবা টাইগার রিজার্ভ কিন্তু আমাদের দেশের অন্যতম পুরনো অভয়ারণ্য। বেতলা, হাজারিবাগ, কাজিরঙ্গা ইত্যাদিরা এর জন্মের অনেকেই পরে জন্মেছে। গোঁন্দ আদিবাসীদের বাস ছিল এই পুরো অঞ্চলে। আগে এই সব অঞ্চলকে বলত চান্দা। এখনও চন্দ্রপুর বলে বড় জায়গা আছে। ওখানের প্রবল প্রতাপ গোঁন্দ রাজাদের সকলেই সমীহ করত। তাদের রমরমা ছিল নাগপুর অবধি বিস্তৃত—আগের বিদর্ভ আর কী! ফেরার সময়ে আমরা চন্দ্রপুর হয়ে ফিরব নাগপুরে। তখন দেখবি ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের একটি থার্মাল স্টেশানও আছে সেখানে।

বাঃ!

আমি বললাম।

তিতির বলল, ঋজুকাকা তুমি প্রথম কবে এসেছিলে এখানে?

সে কি আজকের কথা! তখন আমি স্কুলে পড়ি। জেঠুমনির সঙ্গে এসেছিলাম। তখনও গোঁন্দদের বস্তিগুলোকে অভয়ারণ্য এলাকার মধ্যে থেকে বনবিভাগ সরিয়ে নেননি। সেই সময়ে এখানে একটা কানা বাঘ গোঁন্দদের গোরু-মোষ তো মেরে শেষ করছিলই, মানুষ ধরাও আরম্ভ করেছিল। কার্নিটকার সাহেব, এস. পি.

কানিটকার, তখন মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগের একজন হোমরাচোমরা ছিলেন। জেঠুমনির পূর্ব-পরিচিত। নাগপুরে জেঠুমনি একটা বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন সেবারে। নাগপুরের বাঙালিদের স্কুল ও লাইব্রেরি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল। নাগপুর ক্লাবে জেঠুমনির সঙ্গে হঠাৎ এক রাতে কানিটকার সাহেবের দেখা হওয়াতে জেঠুমনিকে অনুরোধ করেছিলেন বাঘটা মেরে দিতে।

ভটকাই বলল, কেন মধ্যপ্রদেশে কি শিকারির খরা চলছিল যে কলকাতায় জেঠুমনিকে উনি ওই বাঘ মারার অনুরোধ করলেন? গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন করল ঋজুদাকে। রীতিমতো অপ্রতিভ করে দিল।

শিকারির অভাব কোনওদিনই কোথাওই ছিল না। কিন্তু শিকারি মাত্রই যে সম্ভ্রান্ত তা বলা যায় না। অনেক শিক্ষিত শিকারিও চুরি করে জানোয়ার মারেন। শিকারের শখ ঘোড়ার শখের চেয়েও সাংঘাতিক। তোর রেসুড়ে বড়মামুর থেকে আমার শিকারি জেঠুমনি অনেক বিপজ্জনক হতে পারতেন। কিন্তু হননি তাঁর সংযম ছিল বলে। তোর বড়মামু যেমন নর্থ ক্যালকাটার তেরোটি বাড়ি ঘোড়ার শখে বেচে দিলেন জেঠুমনিও শিকারের শখে অনেক বিপজ্জনক ও বে-আইনি কাজ করতে পারতেন। কানিটকার সাহেব তা জানতেন বলেই জেঠুমনিকেই অনুরোধ করেছিলেন। তা ছাড়া অভয়ারণ্যর মধ্যে বাঘ শিকারের অনুমতি দেওয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকিও ছিল। বিধানসভাতে এবং লোকসভাতেও প্রশ্ন উঠতে পারত। কানিটকার সাহেবের চাকরি চলে যেতে পারত। মধ্যপ্রদেশের কোনও শিকারিকে এই অনুরোধ করলে ব্যাপারটা জানাজানিও হয়ে যেতে পারত। নানা কথা ভেবেই ওই অনুরোধ তিনি জেঠুমনিকে করেছিলেন চুপিসারে কাজ যাতে হাসিল হয়।

ভটকাই বলল, উপন্যাসের চেয়ে উপক্রমনিকা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কানা বাঘটা মেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত জেঠুমনি?

জেঠুমনি মারেননি তাঁর বকলমে আমিই মেরেছিলাম।

ভটকাই বলল, ছিঃ ছিঃ। তুমি! একটা কোটেশানের বইয়ে পড়েছিলাম, "When a man kills a tiger, he calls it sport but when a tiger kills a man he calls it ferocity." বেচারি কানা বাঘ!

বেশি ফিলসফাইজিং কোরো না ভটকাই।

তিতির বলল।

তোর বড় জ্ঞান বেড়েছে। বাড়ও বেড়েছে।

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, তোরা ওর পেছনে লাগলি কেন। ও খারাপ কিছু তো বলেনি।

ইতিমধ্যে বাংলোর বাইরে একটি গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। টায়ারের নীচে কাঁকরের কিরকির শব্দ।

তিতির বলল, ওই প্রদীপকাকুরা এলেন। আমরা এবার জঙ্গল দেখতে যাব তো? নাকি আরও চা খাবে তোমরা?

না, না, এবারে যাওয়া যাক। তাড়োবাতে রাত নেমে গেলে জঙ্গলে ঘোরাটা বে-আইনি। সন্ধে সাতটার পর জঙ্গলে থাকা মানা।

তাই!

হ্যাঁ।

প্রদীপকাকু, মানে নাগপুরের প্রদীপ গাঙ্গুলি, তাপস সাহা এবং সঞ্জীব গাঙ্গুলি একটি কালিস গাড়ি থেকে নামলেন। বাংলোর বারান্দাতে উঠে ঋজুদাকে বললেন, চা-টা খাওয়া হল? এবার কি বেরোবেন নাকি দাদা? ঘণ্টা দুয়েক ঘোরা যাবে।

ঋজুদা বলল, চলো চলো। আর দেরি করে কী হবে।

প্রদীপদা বললেন, আপনার জন্যে এই এয়ারকন্ডিশানড কালিস গাড়িটা আনিয়েছি। টাটা সুমোতে আসতে আপনার কষ্ট হয়েছে। এই কালিস গাড়িটা উঁচু আছে। তা ছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশান। এ গাড়িতে বসে জানোয়ার দেখতেও সুবিধা হবে।

ভটকাই ফিসফিস করে আমাকে বলল, Qualis, কালিস। কালিস মানে কী রে?

আমি জবাব দিলাম না।

আমরা টাটা-সুমোতে এসেছিলাম, সেটাও অবশ্য এয়ারকন্ডিশানড। যদিও জানুয়ারি মাসের শেষ কিন্তু মাঝে মাঝেই গরম হয়ে যাচ্ছে আবহাওয়া।

ঋজুদা বলল, জঙ্গলে ঘুরতে এখন কোন গাড়ি সবচেয়ে ভাল বলো তো প্রদীপ?

কোন গাড়ি?

মাহিন্দ্রর বোলেরো। সবদিক দিয়ে ভাল গাড়ি। টাটা সুমোর সামনের সিটটা একটু ছোট। লম্বা চওড়া মানুষের বসতে অসুবিধে। কালিসও অবশ্য ভাল গাড়ি কিন্তু বোলেরোর মতো নয়। তা ছাড়া দিশি গাড়ি। দেশের জিনিস যদি পাওয়া যায় তবে বিদেশি জিনিস ব্যবহার না করাই ভাল।

কেন টাটা সুমোও তো দিশি।

তা ঠিক, তবে বোলেরো নয়। বোলেরোর চেয়েও ভাল গাড়ি আনছে মাহিন্দরা, নাম Scorpion।

মানে, বিছে? ভটকাই বলল।

হ্যাঁ। গাড়ির মতো গাড়ি। আগামী বছরেই এসে যাবে।

টয়োটা-কালিসও তো দেশেই তৈরি হচ্ছে।

হলে কী হয়! তাদের মুনাফা তো সব জাপানেই চলে যাবে। মারুতির মালিকানাও তো এখন বেশিটাই জাপানি। তাদের মুনাফাও জাপানে যাবে। থাম্বস আপ, পেপসি, কোকাকোলা এইসব কোম্পানির পয়সা যাবে আমেরিকাতেই।

সত্যি! ভটকাই বলল, ছাতার বিশ্বায়ন করে দেশের কোন উপকারটাই বা হল! দিশি ব্যবসাগুলো সব লাটে উঠল। তা ছাড়া, ওরা যদি অনেক ভারতীয়কে চাকরি-টাকরি দিত তাহলেও না হয় বোঝা যেত, এখন তো কম্প্যুটারের ঝিং-চ্যাক

যুগ। খুব অল্প লোকেই মস্ত মস্ত কারখানা চালানো যায়।

তিতির বলল, সত্যি কথাই। মুনাফাও তো বিদেশে চলে যাচ্ছে, দেশের লোকের কর্মসংস্থানও হচ্ছে না তবে এই বিদেশিদের কাছে দরজা-জানলা খুলে দিয়ে দেশের উপকার কতটুকু হল?

প্রদীপকাকু আমাদের জাতীয়তাবাদী আলোচনার মধ্যেই বললেন, চলুন দাদা, এবারে ওঠা যাক।

প্রদীপকাকু, তাপসকাকু, আর সঞ্জীবকাকু গিয়ে ফরেস্টার সাহেবের জিপে উঠলেন। একজন ফরেস্ট গার্ড উঠল আমাদের কালিস-এর পিছনে। ঋজুদা সামনে আর আমরা তিনজন পেছনে। চলল গাড়ি।

## দুই

তাড়োবা হ্রদ-এর চারপাশ দিয়ে এই তাড়োবা টাইগার প্রিসার্ভ। এবং অভয়ারণ্য। পুরো নাম, তাড়োবা-আন্ধারী টাইগার প্রিসার্ভ। আন্ধারী একটি নদীর নাম।

মুম্বাই শহরের একটা পাড়ার নাম যেমন আন্ধেরী।

ভটকাই বলল।

না, সেটা আন্ধেরী, এ নদীর নাম আন্ধারী। গান্ধারীর বোন বলতে পারিস। আমি বললাম।

এই আন্ধারীকে এখন দেখা পর্যন্ত যায় না। জলরেখা পর্যন্ত মুছে গেছে কিন্তু বর্ষাতে এর রূপ নাকি হয় প্রলয়ঙ্করী। ঋজুদা নাগপুর থেকে আসবার সময়ে বলছিল।

তাড়োবা নামের কি কোনও মানে আছে?

তিতির শুধোল।

জনশ্রুতি আছে যে এক সময়ে এই উষর বনময় অঞ্চলে একদল মানুষ এই বনের মধ্যে পিপাসার্ত হয়ে মরতে বসেছিল তখন জঙ্গলের দেবতা 'তাড়ু' ওদের স্বপ্নাদেশ দিলেন যে ওরা যদি একটা নরবলি দেয় তবে দেবতা ওদের জল দেবেন।

অত্যন্তই বাজে দেবতা বলতে হবে। Very mean।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, তারপরে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ওরা একজন মানুষকে বলি দিল। তারপরই জঙ্গলের মধ্যে দেবতা তাড়ুর দয়াতে এই বিশাল হ্রদ-এর সৃষ্টি বলে এর নাম তাড়োবা বলে প্রচারিত হল।

গাড়ি চলছিল। আগে আগে জিপ চলেছে। আমরা কাচ উঠিয়ে এয়ারকন্ডিশনার খুব কম করে চালিয়ে দিয়েছি পাছে ধুলো খেতে হয়। দুপাশেই বাঁশের জঙ্গল।

অনেকটা অমরকন্টকের পথের অচানকমারের জঙ্গলের মতো। আমাদের উত্তরবঙ্গে বা আসামে বা ওড়িশাতে যেমন মোটা মোটা বাঁশ হয়, ওড়িশাতে যাকে 'ডবা বাঁশ' বলে, সেরকম বড় বাঁশ গাছ নেই এখানে; এমনকী বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে বাঁশঝাড় দেখি আমরা এই বাঁশগুলো তার চেয়েও অনেক সরু—মধ্যপ্রদেশের বাঁশের এই বোধহয় বিশেষত্ব। অনেকটা ওড়িশার 'কন্টা বাঁশ'-এর মতো এগুলো।

ইচ্ছে আছে বড়মামার শান্তিনিকেতনের বাড়ির বাগানের জন্যে কটি চারাগাছ নিয়ে যাব ফেরার সময়ে।

পথের দুপাশেই বাঁশ। ভিতরে ভিতরে অন্য গাছ-গাছালি আছে, অসন, শাল, হলুদ, ধ, সিধা, অর্জুন, শিমুল, সেগুন ইত্যাদি। সেগুনই বেশি।

হঠাৎ একদল হৃষ্টপুষ্ট শম্বর, দলের সবকটিই মেয়ে-শম্বর বাঁদিক থেকে ডানদিকে দৌড়ে রাস্তা পার হল।

ভটকাই বলল, জঙ্গলি ঘোড়া। দ্যাখ দ্যাখ।

তিতির বলল, ঘোড়া তো নয়, ঘোড়ার ডিম।

আমরা হেসে উঠলাম।

ভটকাই লজ্জা পেয়ে বলল, ঘোড়া নয়?

আমি বললাম, আজ্ঞে না। এগুলো শম্বর।

তার পরক্ষণেই একদল নীলগাই ডানদিকের জঙ্গল থেকে বাঁদিকের জঙ্গলে গেল ধড়ফড়িয়ে। এমন ধড়ফড় করে বলেই বোধহয় বিহারে এদের 'ঘোড়ফরাস' বলে। যদিও নামে নীলগাই মধ্যপ্রদেশের নীলগাইয়েদের চেহারাতে নীলের চিহ্নও নেই, যদিও অন্য অনেক রাজ্যের যেমন বিহারের, নীলগাইয়েদের চেহারাতে একটু নীলাভ ভাব থাকে।

ভটকাই বলল, এগুলো তো ঘোড়া!

আমি বললাম, হাজারিবাগের রাজডেরোয়াতে তো তুই দেখেছিস নীলগাই। তবুও চিনতে পারলি না?

অত ঘন ঘন জানোয়ার বেরিয়ে পড়লে চিনব কী করে।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। ঋজুদাও।

পরক্ষণেই ঋজুদা বলল, চুপ কর। ডানদিকে দ্যাখ।

তাকিয়ে দেখি একটা বড় লেপার্ড ডানদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে যাবে বলে এগোচ্ছে। আগের জিপটা চলে যাওয়ার অপেক্ষাতেই সে ছিল। জিপটা এগিয়ে যেতেই সে পথ পেরুবার জন্যে পা ফেলেছে, প্রায় শব্দহীন এঞ্জিনের কালিস গাড়িটা ও নজরই করেনি।

ঋজুদা ডান হাত দিয়ে ড্রাইভার মামাজির স্টিয়ারিং ধরা ডান হাতে হাত ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বলল। আমাদের গাড়ি আরও এগোলে লেপার্ড হয়তো রাস্তা না পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাবে, শেষ বেলার গোধূলি আলোতে তাকে রাস্তা পেরোতে দেখা যাবে না। হলও তাই। আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তেই সে বড় বড় পা

ফেলে লাল ধুলোর রাস্তাকে ডানদিক থেকে পেরিয়ে বাঁদিকে গেল। সে এক আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য।

সে বাঁদিকের ঘন বাঁশের জঙ্গলে মিলিয়ে যেতেই মৃদু গুঞ্জরন উঠল গাড়ির মধ্যে।

তিতির বলল, হোয়াট আ গ্রান্ড সাইট।

ভটকাই বলল, এমন দিনের আলোতে আর কখনও চিতা দেখেছ তুমি ঋজুদা?

অনেকবারই দেখেছি। যদিও চিতা, বাঘের চেয়েও অনেক বেশি সাবধানী এবং বেশি নিশাচর। তবে একবারের কথা বললে তোরা মজা পাবি।

বলো, বলো, আমরা ধরে পড়লাম।

আসামের তামাহাট থেকে যমদুয়ারের জঙ্গলে যাচ্ছি জেঠুমনির সঙ্গে। জেঠুমনি অত্যন্তই উদারহৃদয় মানুষ। যাওয়ার কথা ছিল জিপে কিন্তু সকলেই "আম্মো যাব" "আম্মো যাব" করাতে শেষ পর্যন্ত ট্রাক রিকুইজিশান করতে হল। ট্রাকে চড়ে, হোলডল, ঝুড়ি ঝুড়ি কমলালেবু, হাঁসের ডিম, নানারকম সবজি পাঁউরুটি, বিস্কিট, ঝুড়ি ভর্তি মুরগি নিয়ে যখন আমরা রাইমানা থেকে যমদুয়ারের দিকে ঢুকেছি তখন এমনই বিকেল। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট এক ঘণ্টার মধ্যেই সন্ধে নামবে। শীতকাল। আসামের বিরাট বিরাট শাল সেগুনের ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী সূর্যর আলোর লালচে আভা পশ্চিমাকাশে দেখা যাচ্ছে, এমন সময় দেখা গেল এক চিতা বাবাজি পথ পেরিয়ে অন্য দিকে যাচ্ছেন, এই চিতা বাবাজিরই মতন।

তা তোমরা গুলি করলে না কেউ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম। সে তো আর অভয়ারণ্য নয়।

গুলি কে করবে। সকলের বন্দুক রাইফেলই তো বাক্স-বন্দি অবস্থাতেই ছিল। আর সেই সব বাক্সর ওপরে ছিল মুড়ির বস্তা, ফুলকপি, বাঁধাকপি। জেঠুমনির এক আর্কিটেক্ট বন্ধু হাতের কমলালেবুই ছুড়ে মারলেন চিতার দিকে। নিরামিশাষীর নৈবেদ্য। চিতা একটু অবাক দৃষ্টি হেনে সোঁদা সোঁদা গন্ধের বড় বড় মহীরুহের গায়ের কাছে বর্ষার পরে গজানো নিবিড় ঝোপঝাড়ের আড়ালে অচিরেই মিলিয়ে গেল। অমন অপ্রস্তুতে কোনও চিতাই ফেলেনি আজ অবধি। তাড়োবা তো অভয়ারণ্য। যমদুয়ারের জঙ্গল তো আর পঞ্চাশের দশকে অভয়ারণ্য ছিল না। কিন্তু কপালে ছিল না, লেপার্ড মারা হল না।

যমদুয়ার? বেড়ে নাম তো জায়গার।

ভটকাই বলল।

শুধু নামই নয়। সত্যি সত্যিই যমদুয়ার। পশ্চিমবঙ্গ, ভুটান আর আসামের সীমান্তে অবস্থিত সেই যমদুয়ার। বাঘ, হাতি, বুনোমোষ, চিতা, শম্বর, নানা হরিণ, কী ছিল না সেই জঙ্গলে। ভুটানের মহারাজা হেলিকপ্টার করে এসে নামতেন যমদুয়ারে শিকার করার জন্যে। পাশ দিয়ে সংকোশ নদী বয়ে গেছে। মানাসের ছোট বোনের মতো। তার স্বচ্ছ জলের নীচ দিয়ে মহাশোল মাছেদের ঝাঁক সাঁতরে

চলে যেত আর পিংকহেডেড পোচার্ড থেকে শুরু করে নাকটা, গার্গনি, পিন-টেইল ইত্যাদি কত পরিযায়ী হাঁস এসে আস্তানা গাড়ত শীতকালে এই নদীতে। ভুটান থেকে ভুটানিরা পিঠে করে কমলালেবু বয়ে নিয়ে আসত। কচি শুয়োর, আরও কত কী। যমদুয়ারের কথা মনে হলেই রোমাঞ্চ জাগে মনে।

আমাদের তো নিয়ে গেলে না একবারও ঋজুকাকা।

তিতির বলল।

এখন আর যাবার উপায় আছে কি? আলফা ও বোড়ো জঙ্গিদের আড্ডা হয়েছে সেখানে, পালামৌতে যেমন হয়েছে এম.সি.সি.-র আড্ডা। এখন বনজঙ্গলের অধিকাংশই আর নিরাপদ নয়। বড় অস্থির এক সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে, জানোয়ার মেরে মাইলের পর মাইল জঙ্গল জানোয়ারহীন করে দিচ্ছে, গাছপালা কেটে মরুভূমি করে দিচ্ছে। ক্রুদ্ধ বাঘ যেমন লুকোনো শিকারির গুলি খেয়ে কে তাকে এমন ব্যথা দিল অদৃশ্যে থেকে তা বুঝতে না পেরে অন্ধ ক্রোধে তার নিজের লেজে কামড়ে ধরে, এই সব মানুষেরাও তেমনই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, তাদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কালের পর কাল, যুগের পর যুগ অন্যায় করা হয়েছে কিন্তু তার প্রতিবাদ নিজের নিজের লেজে কামড় দিলে কি করা হবে? যা তাদেরই পরম সম্পদ, তাদের অস্তিত্বর সঙ্গে, তাদের অতীত ইতিহাস, লোকগাথা, তাদের পুরাণ তাদের গান ও নাচের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যা, তারই সবকিছুর সর্বনাশ সাধন করে তারা কী পাবে তা তারাই জানে। ওদের বোঝানো দরকার। সহানুভূতি, সহমর্মিতার সঙ্গে ওদের বোঝাও দরকার। ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড এইসব নতুন রাজ্যের জন্ম হল বটে কিন্তু ওই বিচ্ছিন্নতাবাদকে সুসংহত না করতে পারলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাতে দেশ ও দেশবাসীর লাভ হবে না কোনওই।

তুমি বোঝাও না কেন?

আমি তো activist নই। রুদ্র যেমন তার কলম দিয়ে লিখেও অনেক অন্যায়ের উৎস মূলে আঘাত করতে পারে, সে তো আদিবাসীদের নিয়ে অনেক লিখেওছে, ও নিজে অনেক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে আমার তো তেমন করার ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া, তোরা তো জানিস, আমার আরও অনেক কিছু করতে হয়, মেধা পাটকার বা অরুন্ধতী রায় বা মহাশ্বেতা দেবীর মতো আন্দোলন করার সময় ও হয়তো মানসিকতাও আমার নেই। তাই আমি নীরব দর্শক হয়ে থাকি আর দুঃখ পাই। ওই পাগলপারা মানুষদের জন্যে দুঃখ পাই, ওই বৃক্ষহীন অরণ্যের মধ্যে দুঃখ পাই। জন্তু জানোয়ারহীন বনের জন্যে দুঃখ পাই, দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না আমি। জানি না, এই অন্ধ রোষের নিবৃত্তি কবে হবে।

অনেক গভীর বিষয়ে তলিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের

খবরে আমাদের দরকার কী?

দরকার আছে। সকলেই আদার ব্যাপারী বলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে এই দেশ ছারেখারে যাবে। এই দেশ তো তোরও। একথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

যাকগে, আমাদের তাহলে যাওয়া হবে না কখনও যমদুয়ারে?

রুদ্র দুদিকে দুহাত ছুড়ে বলল।

কখনও যাওয়া হবে কি না জানি না যমদুয়ারে, তবে শিগগিরি হবে না। এখন তো মানাস-এও যাওয়া যায় না, ছত্তিশগড়ের ও ঝাড়খণ্ড-এর অনেক জায়গাতেই যাওয়া যায় না। কত প্রিয় সব জায়গা, কত স্মৃতি, কত বনের কত মানুষের, সবই পিছনে ফিরে তাকালেই এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

আমরা সকলেই চুপ করে রইলাম।

সামনেই একটা মস্ত তৃণভূমি জেগে উঠল। তাতে কম করে এক হাজার চিতল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। দৌড়াচ্ছে, খেলছে।

বাঃ। হরিণ তো খুব বেড়েছে এদিকে।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল।

গার্ড পিছন থেকে বলল, গার্ডদাদার নাম বিষেন, হ্যাঁ স্যার। হগ ডিয়ারও বেড়েছে প্রচুর। শম্বর নীলগাইও বেড়েছে। আর সামনের বাঁদিকে মোড় নিলেই হয়তো একটা বাঘিনীকে দেখতে পাব আমরা। তার রোঁদে বেরুবার সময় হয়েছে এখন। তিনটি বাচ্চাও আছে তার সঙ্গে। এখন অবশ্য বেশ বড়ই হয়ে গেছে। গত বছর রেঞ্জার সাহেব ভিডিও ক্যামেরাতে ছবি তুলেছিলেন, বাংলোতে আছে ক্যাসেটটা, আপনারা দেখতে পারেন, তখন বাচ্চাগুলো ছোট ছিল।

ঋজুদা বলল, মনে করিস তো রুদ্র, বাংলোতে ফিরে গিয়ে দেখতে হবে ফিল্মটা।

গার্ড বলল, শুধু হরিণ ও অন্যান্য তৃণভোজীই নয়, ঢোলও বেড়েছে এদিকে। তিন চারটে দল আছে।

তিতির বলল, তিন চারটে!

হ্যাঁ মেমসাহেব।

ভটকাই বলল, কী সব বলছ তোমরা বুঝছি না। ঢোল তো বাজায় জানি। ঢোল-এর আবার দলই বা কী আর বাড়-বাড়ন্তই বা কী?

আমরা হেসে উঠলাম সবাই। গার্ড বিষেন বাংলা বোঝে না। সে আমাদের হাসিতে যোগ দিতে পারল না।

তিতির বলল, ভাব তো দেখাও এমন, যেন সবজান্তা। ভারতের বনে জঙ্গলে ঘোরো আর ঢোল কাকে বলে জানো না?

ঋজুদা ভটকাইকে আরও হেনস্থা থেকে বাঁচানোর জন্যে বলল, ঢোল মানে হচ্ছে জংলি কুকুর। ইংরেজিতে যাদের বলে ওয়াইল্ড ডগস। তারা যে জঙ্গলে থাকে সেই জঙ্গলে বাঘও সাবধানে থাকে।

বাঘ অবশ্য আরও সাবধানে থাকে যেখানে ডাঁশ থাকে।

আমি বললাম।

ডাঁশটা আবার কী বস্তু?

ভটকাই রীতিমতো চুপসে গিয়ে বলল।

আমি ঋজুদা আর তিতির পুব-আফ্রিকাতে সেতসি মাছির কামড় খেয়ে দেখেছি। যদিও তা আদৌ সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। কিন্তু তা বলে ডাঁশের কামড়। খেলে কি আর বাঁচব!

তারপরই ঋজুদাকে বললাম তুমি তো পৃথিবীর তাবৎ খাদ্য-অখাদ্য খেয়েছ, ডাঁশের কামড় কখনও খেয়েছ কি?

ঋজুদা হেসে বলল, একবার খেয়েছিলাম। একবারই যথেষ্ট আর খাবার কোনও ইচ্ছা নেই।

কোথায় খেয়েছিলে ঋজুকাকু?

তিতির বলল।

আরে ডাঁশ ব্যাপারটা কী তা জানার জন্যে আমি যে হাঁসফাঁস করছি সেদিকে তো তোমাদের কারও খেয়াল নেই, নিজেরাই কথা বলে চলেছ।

আমি বললাম, শোনো মিস্টার সবজান্তা ভটকাই। ডাঁশ হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয়। একরকমের মাছি। কাঁটালে মাছির দশ বারো গুণ বড় হয়। তার কামড়ে বাঘের মতো জানোয়ার পর্যন্ত দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে জঙ্গল ছেড়ে পালায়।

জঙ্গলে কথা বলা বারণ কিন্তু আমাদের গাড়ির সব কাচই ওঠানো এবং আমরা নিচু গ্রামেই কথা বলছিলাম তাই সম্ভবত বাইরে গাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে সে শব্দ যাচ্ছিল না।

গার্ড বলল, দেখিয়ে সাহাব।

মামাজি গাড়ি দাঁড় করাতেই আমরা দেখলাম পথের বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যের একটা শুঁড়িপথ দিয়ে বেরিয়ে এসে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, যাকে বিহারে বলে নরপাঠা। জবরদস্ত শিঙাল শম্বর। তার শিঙের বাহার দেখার মতো। চেহারাতেও প্রায় ঘোড়ারই মতো। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম আমরা।

তিতির ফিসফিস করে ভটকাইকে বলল, দ্যাখো ভটকাই, ঘোড়ার ফার্স্ট কাজিন।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, ঠিক এইরকম একটা শম্বর মেরেছিলাম ওড়িশার টুম্বকার জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে কিছু পেল্লায় পেল্লায় বাইসন আর শম্বর ছিল বটে। হাতিও ছিল বিস্তর।

তিতির বলল, এমন সুন্দর একটা প্রাণীকে মেরে তোমার অনুতাপ হয়নি ঋজুদা?

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, যখন মেরেছিলাম তখন আমি কলেজে পড়ি। ওই বয়েসে এক ধরনের বাহাদুরি-প্রবণতা থাকে সকলের মধ্যেই। তা ছাড়া

ভাল শট হলে জেঠুমনি হ্যান্ডশেক করতেন, পিঠ চাপড়ে দিতেন যাকে বলে pat on the back। তবে শুধু আমি একাই কেন কনজার্ভেশানের মস্ত বড় বড় প্রবক্তারা প্রথম জীবনে সকলেই শিকার করেছিলেন। ভাল শিকারিরাই পরে ভাল কনজার্ভেটর হন।

তিতির বলল, যেমন?

যেমন জিম করবেট, সালিম আলি, অ্যানন রাইট। আরও অগণ্য নাম বলতে পারি।

ভটকাই বলল, যেমন তুমি।

কাদের সঙ্গে কার তুলনা!

ঋজুদা বলল।

ঋজুদা যাই বলুক, আমাদের কাছে ঋজুদাই হিরো নাম্বার ওয়ান। শম্বরটা আধ মিনিটটাক দাঁড়িয়ে থেকে দৌড়ে পথ পার হল। আর আন্ধারী-তাড়োবা অভয়ারণ্য বলেই বন্যপ্রাণীদের ভয় ভেঙে গেছে। অন্য জায়গা হলে শম্বর এতক্ষণ দাঁড়াত না, মুহূর্তের মধ্যে পালাত এবং রাস্তাও পেরোত না, যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই ফিরে যেত।

অত বড় শিং আটকে যায় না জঙ্গলের ডালপালাতে?

ভটকাই শুধোল।

ঋজুদা হাসল, বলল, ছেলেবেলায় আমারও মনে এই প্রশ্ন জাগত। কিন্তু শুধু শম্বরই কেন, সব শিঙাল জানোয়ারই যখন জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে যায় তাদের শিংগুলি পিঠের উপর শুইয়ে দেয় প্রায়, মুখটা উঁচু করে। তাদের তখন দেখতে ভারী সুন্দর লাগে।

একটু পরেই সূর্য ডুবে গেল। এমন সময় হঠাৎ একটা ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলে উঠল পথের বাঁপাশে।

কী ব্যাপার?

গার্ড বিষেন বলল, পথের ধুলোর নীচে অদৃশ্য তার পাতা আছে। যে কেউই এই পথ মাড়িয়ে যাবে, সে বাঘই হোক আর চিতা বা চোরা-শিকারি বা তাদের গাড়ি, অটোম্যাটিক ক্যামেরাতে তাদের ছবি উঠে যাবে। পরদিন রেঞ্জ অফিসে এই ফিল্ম ডেভালাপ করা হবে।

বাঃ। চমৎকার ব্যাপার তো।

তিতির বলল।

ঋজুদাও বলল, তাড়োবাতে অনেক কিছুই আছে যা অন্য টাইগার প্রিসার্ভে নেই। বহু পুরনো তো এই প্রিসার্ভ। ওরা এখানে খুবই অর্গানাইজড।

ঋজুদার কথা শেষ হতে না হতে দেখা গেল পথের উলটোদিক থেকে একটা বিরাট ভাল্লুক, স্লথ বেয়ার গাড়ির দিকে আসছে। একেবারে ডোন্ট কেয়ার।

এ কীরে! কী চেহারা রে। এ যে দেখছি আমেরিকার ইয়ালোস্টোন ন্যাশানাল

পার্ক-এর বাদামি ভাল্লুকের মতো পেল্লাই। ও কি কালিস গাড়ির সঙ্গে কুস্তি লড়বে না কি?

ভটকাই বলল।

ততক্ষণে ভাল্লুক বাবাজি একেবারে কাছে এসে গেছে। কাছে আসতেই সে পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তার বুকের সাদা V চিহ্নটা পরিষ্কার দেখা গেল। V মানে ভিক্টরি, V মানে V.I.P.-র আদ্যক্ষর। সে আমাদের তার ভিজিটিং কার্ড দেখিয়ে জঙ্গলের ডানদিকে ঢুকে গেল।

গার্ড আমাদের দেখাল, এদিকে খুব বড় বড় উইয়ের ঢিপি আছে। উই খেতে যাচ্ছে। মহুয়ার সময় এখনও আসেনি। মহুয়ার সময়ে মহুয়া, আমের সময় আম, জামের সময় জাম, ভাল্লুকের এসব অত্যন্ত প্রিয় জিনিস।

সামনের জিপটাকে এবারে পেছনে আসতে বলে আমরা কয়েকটা নুনি দেখে বাংলোতে ফেরার পথ ধরলাম। নুনিগুলো বনবিভাগের বানানো। কিছু স্বাভাবিকও আছে। পাশে জলও আছে। ছোট ছোট পুকুর খুঁড়েছে। এই ঊষর মধ্যপ্রদেশে জল বিরল। অত বড় হ্রদ তাড়োবা অথচ কুমিরের জন্যে সেখানে জলে নামার উপায় নেই এদের।

কতগুলো কুমির আছে তাড়োবা হ্রদে?

ঋজুদা গার্ডকে শুধোল।

সেনসাস তো নেহি কিয়া হ্যায় মগ্‌গরকা লিয়ে হুজৌর। খয়ের পঞ্চাশ-ষাট তো হোগা জরুর। হর সাল আট দশ গো হিরণ পাকড় লেতা হ্যায়।

বোঝো একবার ব্যাপারখান!

ভটকাই ফুট কাটল।

ঋজুদা পথের দুপাশে কী যেন খুঁজছিল মাথা এপাশ ওপাশে করে। তারপরে হঠাৎই মামাজিকে বলল, গাড়ি থামাতে।

ঋজুদা বলল কাচগুলো নামা এবারে। এয়ারকন্ডিশনার বনধ কর দেনা মামাজি। বনের গন্ধ ও শব্দ নাকে আর কানে না গেলে জঙ্গলে এসে লাভ কী?

তারপর বলল, তোদের এইবার একটা জিনিস দেখাব যা তোরা কোথাওই দেখিসনি আগে, না অন্য কোনও জায়গায় দেখতে পাবি। ওই দ্যাখ, বলেই বাঁদিকে বনের গভীরে আঙুল তুলে বলল, ওই দ্যাখ ভূত।

সত্যিই তো! আমরা সবিস্ময়ে সকলে দেখলাম সদ্য-ডোবা সূর্যের মাছের রক্তধোওয়া একেবারে ফিকে লাল আলোর মধ্যে ধবধবে সাদা কী একটা দাঁড়িয়ে আছে। তিন চার মানুষ লম্বা, লম্বা লম্বা হাত ছড়িয়ে, অনেকগুলো হাত। মামদো ভূত দাঁড়িয়ে আছে।

ভটকাই বলল, ঈরে বাবা, ইটা কে গো?

তিতিরও যেন ভয় পেয়েছে মনে হল। বলল, এটা কী ভূত?

ঋজুদা বলল, ভূত-প্রেতের কি একরকম? ভুশন্ডির মাঠের কাঁড়িয়া পিরেত

থেকে পালামৌর জঙ্গলের দারহা ভূত, যারা রাতের বেলা একা মানুষ পেলেই তাকে কুস্তি লড়তে বলে আর সে মানুষ কুস্তি লড়তে গেলেই খাপু খাপু খাপু খাপু করে ডাকতে ডাকতে রাতের আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর বলল, তোরা তো জানিসই ওড়িশার কালাহান্ডি জেলায়, বাঘডুম্বা ভূত আছে। অরাটাকিরির বাঘ মারতে গিয়ে সেই ভূতের কথা তো তোরা শুনেছিস। এই বন-পাহাড়ের প্রকৃত ভারতবর্ষ তো হ্যালোজেন আর মার্কারি ভেপারের আলো-জ্বালা ভারতবর্ষ নয়, কম্প্যুটার ইন্টারনেট আর বিশ্বায়নের ভারতবর্ষ নয়, এই হল আদিম ভারতবর্ষ। এই পথের দুপাশে কত গোঁন্দ সৈন্যের স্মৃতি, কত আহত সৈন্যের দীর্ঘশ্বাস, কত মৃত সেনার আত্মা আছে তা কে বলতে পারে।

তিতির অনুযোগের স্বরে বলল, ভাল হচ্ছে না ঋজুকাকা। বলোই না ওটা কী?

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, ওটা একটা গাছ। এখন গাছে পাতা নেই, তাই আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে। একটাও পাতা নেই এখন। এই গাছগুলোর নাম Ghost tree, অন্য নাম Karu-Gum tree, একরকমের আঠা হয় এই গাছ থেকে।

তারপরই পুরনো কথা মনে পড়ে যাওয়াতে বলল, যখন জেঠুমনির সঙ্গে এখানে এসেছিলাম তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। একটা গোঁন্দ মেয়েকে ধরে ছিল কানা বাঘে। বছরের এই সময়েই। আমি মাচা বেঁধে বসেছিলাম। একা। জেঠুমনিরই নির্দেশে। যাত্রাপার্টি আর মানুষখেকো বাঘ শিকার এক কথা নয়। এখানে বাঘও একা শিকারিও একা। দুজনের বুদ্ধি, ধৈর্য আর সাহসের পরীক্ষা দিতে হয় একা একা। ভয় পেলে জেঠুমনি বা পিসিমার নাম ধরে চেঁচিয়ে লাভ নেই। যখন মাচাতে বসেছিলাম, তখন লক্ষ করিনি। রাত নামলেই দেখি ধবধবে সাদা শাড়ি পরা ভূত পেত্নী চারিদিকে। কী ভয় যে পেয়েছিলাম, কী বলব। জেঠুমনি বলতেন, সমস্ত ভয়েরই উৎস হচ্ছে অজ্ঞতা। ভারী রাগ হচ্ছিল জেঠুমনির কথা মনে পড়ায় তখন। ভাবছিলাম, সেই রাতেই তো ভূতেরা আমাকে নিয়ে গেন্ডুলি খেলবে। কাল অবধি বেঁচে থাকলে না জেঠুমনির কাছ থেকে এই ভয়ের উৎস জানা যাবে। তার আগেই তো দফা রফা।

সত্যি! না জানলে যে কোনও ভীরু ও অনভিজ্ঞ মানুষ জঙ্গলে হঠাৎ রাতের বেলা এই গাছ দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। ভারী আশ্চর্য তো।

ঋজুদা বলল, এই আমাদের সুন্দর দেশ। বিরাট, স্বরাট দেশ ভারতবর্ষ। কত বৈচিত্র্য এখানে, কত কী জানার, শেখার। এক জীবনে আমরা এর কতটুকুই বা জানতে শিখতে পারব। এমন দেশে জন্মে মানুষে যে কেন বিদেশে ছুটি কাটাতে যায় আমি ভেবেই পাই না।

আমি বললাম, আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় এক ধরনের হীনমন্যতাতে ভুগি। ভাবি, ইউরোপ আমেরিকা জাপান ঘুরে এসে বুঝি আমাদের লেজ গজালো।

ঠিক তা নয়।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, বিদেশে যাওয়া দোষের নয় কিন্তু একজন ভারতীয়র চোখ দিয়ে বিদেশকে দেখতে হবে। আমাদের সঙ্গে তাদের কোথায় অমিল, তাদের জনসংখ্যা কত কম, তাদের নিয়মানুবর্তিতা, তাদের আত্মসম্মানজ্ঞান, তাদের স্বয়ম্ভরতা কত অন্যরকম আমাদের চেয়ে, তারা কত আত্মবিশ্বাসী, পরমুখাপেক্ষী বা পরদয়া-নির্ভর কত কম এই সবই জানতে বুঝতে হবে। তবেই না দেশ বেড়ানো সার্থক। নইলে, দেশে ফিরে চালিয়াতি করাই যায় শুধু, গরিব বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে ফাঁকা বাহাদুরিই নেওয়া যায়। তেমন দেশ দেখতে যাঁরা যান তাঁদের যাওয়া-না-যাওয়া সমান।

কাল দিনের বেলা আবার এসে এই ভূত-গাছকে ভাল করে দেখতে হবে।

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, একটা নাকি? অজস্র আছে এই গাছ। তোদের কালকে হ্রদের ওপারে নিয়ে যাব—দেখবি। ওপারেই তো কানা বাঘটাকে মেরেছিলাম।

সেই বাঘ মারার গল্পটা আমাদের বলবে না?

ঋজুদা বলল, হবে 'খন। প্রদীপরাও শুনতে চেয়েছিল। আমরা তো আছি এখানে তিনদিন, হবে হবে, সময়মতো হবে। সকলে এক সঙ্গে হলে বলা যাবে।

## তিন

নাগপুর থেকে তাড়োবা এসেছিলাম আমরা চম্পা হয়ে অম্বা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে এসে উমরের ভিওয়ানপুর ও সারু নদী পেরিয়ে। তারপর জাম্বুল ও চিমুরঘাটা হয়ে ষোলো সতেরো কিমি এসে বাঁদিকে ঢুকতে হয় তাড়োবা যাওয়ার জঙ্গলের পথে। এই পথে উমরের এক বড় জনপদ। এ ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য জনপদ নেই ওপথে এলে তাড়োবা আর নাগপুরের মধ্যে। অন্য পথ দিয়েও যাওয়া যায়। সোজা চিমুর থেকে এসে চন্দ্রপুর, গোঁন্দদের 'চান্দা' পেরিয়ে মোহার্লি গেট হয়ে অন্যদিক থেকে ঢুকতে হয় তাড়োবাতে। তাড়োবা থেকে ও পথে নাগপুরে যেতে মোহার্লি গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে চন্দ্রপুর পেরিয়ে ওয়ারোরো ও বুটিবারি হয়ে ফিরতে হবে। নাগপুর থেকে আন্ধারী-তাড়োবার দূরত্ব একশো পঞ্চাশ কিমি আর চন্দ্রপুর থেকে পঁয়তাল্লিশ কিমি।

ঋজুদা জঙ্গল থেকে ভি.আই.পি. বাংলোতে ফেরার সময় বলল, কাল সকালে আমরা মোহার্লি গেট অবধি যাব। প্রদীপ বলছিল, সেখানে একটি ইনফরমেশান সেন্টার বানিয়েছে বনবিভাগ রেঞ্জার নীতিন কাক্কোডকার এর তত্ত্বাবধানে। সেটি নাকি দেখবার মতো।

ওদিকে গেলে, কপাল ভাল থাকলে ঢোলও দেখতে পারবেন সাহেব। গার্ড

বিষেন বলল, মোহার্লির নাম শুনে।

তাহলে তো খুবই ভাল। খুব ভোরে উঠে এক কাপ করে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা। ফিরে ব্রেকফাস্ট করব।

ঠিক আছে।

তিতির বলল।

ঠান্ডাও কমে গেছে। ভোরে উঠতে কষ্ট কী?

আফ্রিকার শীতকালে অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে ভুষুণ্ডার খোঁজে ঘুরতে যারা অভ্যস্ত তাদের আবার শীতের ভয় কী।

আমি বললাম।

তা ঠিক। তবে শীতের কথাই যদি বলিস সমতলে তবে আমি বলব হাজারিবাগের শীতের কথা।

তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই যখন আমার সঙ্গে মুলিমালোয়াঁতে গেছিলি 'অ্যালবিনোর পটভূমি'তে তখন তো শীত ছিল না, গ্রীষ্মকালই বলা চলে। তাই...

তারপর বলল, তুই 'গুগুনোগুম্বারের দেশে' আর 'রুআহা' বই দুটো কিন্তু ভারী ভাল লিখেছিলি রুদ্র। মাঝে মাঝে অবসর পেলে বইগুলো পড়ি, সেইসব দিনে ফিরে যাই। তোর কিছু মনেও থাকে। কী ডিটেইলস-এই না লিখেছিলি! 'ঋজুদা সমগ্র'র কোন খণ্ডে আছে যেন?

প্রথম খণ্ডেই তো। তোমার সমগ্রর হিসেব দিয়ে কী কাজ? তোমার কাছে তো আমার সব কটি বইই আছে।

তা ঠিক। তবে সমগ্রর সব খণ্ডই হাতের কাছে থাকলে যখন যেটা খুশি পড়া যায়।

তারপর বলল, পাঁচ খণ্ড বেরুবে না রে?

বেরুবে। নতুন বইগুলো লিখি আগে। এই তাড়োবা নিয়েও লিখব একটা আর তুমি যদি এপ্রিল মাসে ছত্তিশগড়ের বস্তারে নিয়ে যাও তবে সেই বস্তার নিয়েও লিখব আর একটা।

হ্যাঁ। মনে হয়, বস্তারে তোদের সকলেরই যাওয়ার সুযোগ হয়তো হবে। গভর্নর সিনহা সাহেবের অতিথি হয়ে যাব। এমনই কথা আছে। প্রিন্সিপাল ফরেস্ট সেক্রেটারি চক্রবর্তী সাহেবও এখন থেকেই সব ডি.এফ.ও.-দের চিঠি দিয়ে রেখেছেন আমাদের দেখভালের জন্যে সব ফরেস্ট ডিভিশনে। ছত্তিশগড় সরকার এয়ারকন্ডিশানড টাটা সুমো দেবেন একটা। রায়পুর ও জগদলপুর-এ এয়ারকন্ডিশানড হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত, নারায়ণপুরে পি. ডাব্লু. ডি.-র চমৎকার বাংলো আর বনবিভাগের ছোট্ট বাংলোতে থাকব আমরা। ভাগ করে। এসব বন্দোবস্তই করেছে প্রদীপ মৈত্র, রায়পুরের।

তিনি কে?

তিনি এই প্রদীপেরই বন্ধু। হিন্দুস্থান টাইমস-এর চিফ রিপোর্টার রায়পুরের। খুবই ভাল ছেলে। তোরা সুদীপ্তকেও দেখিসনি। সেও খুব ভাল। স্কলাস্টিক। নাগপুরের সবচেয়ে বড় স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। সুদীপ্ত ভট্টাচার্যি খুবই পড়াশুনো করে।

তাই?

তিতির বলল।

ওই প্রদীপকাকু আর অন্যান্যরা কী করেন? মানে, এবারে আমাদের যাঁরা নিয়ে এলেন।

প্রদীপ গাঙ্গুলি হল নাগপুরের ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর ইঞ্জিনিয়র। নাগপুর শহরের পথেঘাটে কত সব ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে দেখলি না। বিরাট চওড়া চওড়া সব রাস্তা, ফ্লাইওভার, এসবই প্রদীপের ডিপার্টমেন্টের কাজ। আর তাপস সাহা হল ভারত হেভি ইলেকট্রিকাল্স কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। ও খুব মেধাবী ছাত্র ছিল যাদবপুরের। টারবাইন স্পেশ্যালিস্ট। সারা বছর ওকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয় আর ওর স্ত্রী মুনমুন, সেও যাদবপুরেরই ছাত্রী, মেয়ে কুর্চিকে নিয়ে প্রায় একাই থাকে নাগপুরে।

প্রোষিতভর্তৃকা!

আমাদের সবাইকে তো বটেই এমনকী ঋজুদাকেও চমকে দিয়ে বলল ভটকাই।

সেটা কী বস্তু রে?

বাংলাতে খারাপ ঋজুদা জিগ্যেস করল।

যে মহিলার স্বামী প্রবাসে থাকেন তাঁকে বলে প্রোষিতভর্তৃকা।

বাবাঃ! ভটকাই তো বাংলাতে পণ্ডিত হয়ে উঠেছে রে।

ভটকাই চুপ করে থেকে প্রশংসাটা রেলিশ করল।

আর সঞ্জীবকাকু কী করেন? কথা বলেন কম কিন্তু এক মিনিট অন্তর ছবি তোলেন।

তিতির বলল।

ও ছবি তুলবে না তো কে তুলবে? সঞ্জীব তো দারুণ ফটোগ্রাফার। হিন্দুস্থান টাইমস-এর চিফ ফটোগ্রাফার। প্রফেশানাল ফটোগ্রাফার। ও এত ভাল ছবি তোলে যে ইচ্ছে করলে শিবকে বাঁদর আর বাঁদরকে শিব করে দিতে পারে ওর হাতের গুণে। ভারী মজার ছেলে। এই যে টুপিটা পরে আছি আমি নাইকের ওটা ওরই দেওয়া। গত বছর একটা মারাঠি গামছা দিয়েছিল, ভারী মোটা আর নরম। ওর স্ত্রী সুচিত্রা নাগপুরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তারও আসবার খুব ইচ্ছে ছিল। পারেনি। হয়তো বস্তারে যেতে পারে যদি স্কুল আর মেয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে পারে।

ভটকাই অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। ভেরি আনইউজুয়াল ফর হিম। এবারে

কিছু একটা কেলো করবে। ওর মৌনতাই তা বলছে।

আমিই ওকে খুঁচিয়ে দিয়ে বললাম, এ তো আর 'ডেভিল'স আইল্যান্ডে' যাবার সময়কার মোটর-বোট নয়। এখানের বাবুর্চিকেও কি পকেটে পুরেছিস না কি? রাতের খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? তুই তো একটি জিনিয়াস এ ব্যাপারে।

তা পকেটে পুরতে হয়েছে বই কী? ছ প্যাকেট সিগারেট এবং বহু ডজন গুটকা নিয়ে এসেছিলাম নাগপুর থেকে। এসেই কিচেনে ঢুকে ঘুষ দিলাম।

গুটকাটা কী জিনিস আবার?

ঋজুদা বলল।

সে আছে। তুমি এবারে পাইপ ছেড়ে দিয়ে গুটকা ধরো। পাইপে বড় ঝকমারি।

ভাল মনে করেছিস। অনেকক্ষণ পাইপটা খাওয়া হয়নি। এখন তো কাচ খোলা। ধরাই এবারে।

ঋজুদা বলল।

ধরাও।

খাবি তোরা আর বদনাম আমার।

ভটকাই বলল।

তা আজ রাতের মেনুও কি তুইই ঠিক করে দিয়ে এলি নাকি?

আমি বললাম।

বলতে পারিস, তাইই।

তিতির বলল, মেনু কী?

এই জঙ্গলে বেশি কী আর পাওয়া যাবে? তা ছাড়া, আসবার আগে নাগপুর থেকে বাজার করে নিয়ে এলেও কথা ছিল। প্রদীপকাকু তো বলেইছিলেন ঋজুদার তাড়াতেই তা পারলেন না। উমরের এমনই এক জায়গা যে তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। তোরাও সবাই তাড়া দিলি। সঞ্জীবকাকু মুরগিও জোগাড় করতে পারলেন না। ভিন্ডি আর পেঁপে নিয়েছেন বিস্তর, কিছু বেগুন টোম্যাটো, আলু পেঁয়াজ আর ডিম নিয়েছেন কিছু।

তা মেনুটা কী তা তো বলবি?

ভাত, যারা রুটি খাবে রুটি, ভাজা মুগের ডাল, লঙ্কা আর বেগুন ভাজা, স্টাফড টোম্যাটো।

কী দিয়ে হবে স্টাফিং। না মাছ আছে, না কিমা।

হবে আন্ডা দিয়ে। ডিমের ডেভিল খেয়েছিস তো? আজকে আমার ডিরেকশানে ডিম দিয়ে স্টাফড টোম্যাটো খেয়ে দেখিস। ফ্রিজে টক দই ছিল রায়তা বানাতে বলেছি। আর ক্যারামেল কাস্টার্ড—সুইড ডিশ।

সুইট ডিশ বলতে কি তুই একমাত্র ক্যারামেল কাস্টার্ডই জানিস?

হুঁঃ। একে মায় রাঁধে না তপ্ত আর পান্তা।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, তা কেন। সঞ্জীবকাকুর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। কাল চন্দ্রপুর থেকে মাটন আসবে, কলা ও অন্যান্য ফল, মুরগি, যথেষ্ট পরিমাণ আন্ডা এবং বাসমতি চাল। কাল তোদের দুপুরে পোলাও আর পাঁঠার মাংস খাওয়াব। আফটার লাঞ্চ সুইট ডিশ কালাকাঁদ। রাতে মুরগির রোস্ট, টোস্ট, আর সুইট ডিশ হবে ব্যানানা ফ্রিটারস। কানু ছাড়া যেমন গীত নাই আমি ছাড়াও তোদের গতি নাই।

অন্ধকার হয়ে গেছিল।

আমরা বাংলোর দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম। জিপটা, আগেই বলেছি, পেছনে পেছনে আসছিল। হঠাৎই পথের ডানদিকে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলে উঠল একসঙ্গে। চিতল হরিণের ঝাঁক, মানে, তাদের চোখে গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ল, তাই। হেড লাইটের আলোতে তাদের চোখগুলি সত্যিই জোনাকিরই মতো ঝিকমিকিয়ে উঠল।

বাঃ! মনটা ভরে গেল।

তিতির স্বগতোক্তি করল।

আন্ধারী নদীটা কোথায়? টাইগার প্রিসার্ভের নাম যে আন্ধারী-তাড়োবা। আর কোনও নদীই তো দেখলাম না! তাড়োবা হ্রদ ঠিক আছে, কিন্তু নদীও তো দেখা চাই।

আমি বললাম।

কাল সকালে মোহার্লি দেখে ফেরার সময় দেখাব। আসলে আন্ধারী ওই পুরা প্রিসার্ভ-এর মধ্যে দিয়েই বয়ে গেছে। ফরেস্টার সাহেবকে বলে দিলে তিনি গার্ডকে বলে দেবেন আমাদের দেখাতে। না বললেও হয়। উনি তো জিপে থাকবেনই। দিনের আলোতে ভাল করে দেখা যাবে।

তিতির বলল, এত বড় যে তাড়োবা হ্রদ তাতে পরিযায়ী পাখিরা আসেনি কেন। শীত তো এখনও আছে একটু একটু। সবে জানুয়ারির শেষ।

ঠিক বলতে পারব না।

ঋজুদা বলল।

আসবে কী করে? কুমিররা ঠ্যাং ধরে জলের গভীরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবে না।

বলেই ভটকাই বলল, একটা গল্প শুনবে ঋজুদা?

কী গল্প?

কুমিরের।

বল।

একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য বড়লোক তার ছেলেকে 'মানুষ' করার জন্যে একজন মাস্টারমশাই রেখেছেন। তা মাস্টারমশাই রোজই আসেন, পড়ান পৌনে এক ঘণ্টা এক ঘণ্টা। এদিকে বছর শেষের স্কুলের পরীক্ষাতে ছাত্র ট্যাঁড়াল।

ঢ্যাঢ়াল মানে কী?

ঋজুদা বলল।

আঃ। তোমার বাংলা ভ্যোকাবলরি বড় পুওর।

ভটকাই বলল, ঋজুদাকে।

আমি বললাম, ঢ্যাঢ়াল মানে ফেল করল।

অ।

পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বলল ঋজুদা।

তারপর বলো।

তিতির বলল।

তারপর মাস্টারমশাইকে তলব করলেন ছেলের বাবা। তাঁকে ভাল করে মিষ্টি-টিষ্টি খাইয়ে বললেন, এটা কী হল মাস্টের? এতই যদি পড়ালে পেটালে তো ছেলে আমার এমন সব নম্বর পেল কেন? এ জন্যেই কি আর পেরাইভেট মাস্টের রেখেছিলাম? সরকার যে প্রাইভেট টুশান বন্দ করার কতা বইলতেছেন ভালই কইরতেছেন।

মাস্টারমশাই বললেন, আমার কথাটা শুনুন স্যার। মানে, ব্যথাটা।

কী কথা আর ব্যথা, বলুন।

আমি তো চাঁদু খোকাকে সবই পড়িয়েছিলাম। কিন্তু একটা কুমির...

কুমির? তুমি বলছ কী মাস্টের। এ মদ্দি কুমির এল কোত্থিকি?

এল কোত্থিকি সে কথা তো আমিও ভেবে পাই নাই স্যার কিন্তু কুমির এয়েছে। বিলক্ষণ এয়েছে।

মাস্টারমশাই কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন।

আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতিচিনা মাস্টের।

তখন মাস্টারমশাই বললেন, আচ্ছা আপনের সামনেই আমি চাঁদু খোকাকে কোশ্চেন করতিচি, আপনি দেইকে নেন কুমিরের মাহাত্ম্য।

করো তোমার কোশ্চেন।

মাস্টারমশাই বললেন, অ চাঁদু-খোকা, তুমি গোরু সম্বন্ধে কী পড়েছ তোমার বাবাকে শোনাও দিকি, আমাকেও শোনাও।

চাঁদু খোকা দুচোখ বড় বড় করে বলল, ও গলু? গলু মাত্তামতাই?

হ্যাঁ বাবা গোরু।

গলু অতি উপকারি দন্তু। গলু আমাদের দুধ দেয়। গলুর তামলা দিয়ে ঢাক হয়, ঢোল হয়, খোল হয়, আমাদের দুতো হয়, গলুর থিং দিয়ে নানালকম জিনিস তৈরি হয়।

তারপর?

একদিন হয়েছে কি মাত্তামতাই, গলুটা না মাঠে তলতিল, তলতে তলতে নদীল এক্কেবারে পাথে তলে গেথে, নদীল কুবই কাথে আর অমনি একতা কুমিল দল

থেকে উঠে গলুটার পা কামলে দলে তাকে নদীতে, মানে নদীর গব্বিলে নিয়ে তলে গেল।

মাস্টারমশাই বললেন, দেখুন তো স্যার। গোরু সম্বন্ধে আরও কত পড়িয়েছিলাম কিন্তু গোরুকে যদি কুমিরেই ধরে জলের তলে নিয়ে যায় তাহলে নম্বর দেবেন কী করে স্কুলের মাস্টারমশাইরা।

চাঁদুবাবার বাবা বলেন, আরও প্রশ্ন করুন তো দেখি। ইত বড় পোবলেম দেকতিচি।

মাস্টার বললেন, পোবলেম বলে পোবলেম।

তারপর বললেন, চাঁদুবাবা তুমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কী জানো বলো তো দিকি।

ও লবীন্দনাথ? লবীন্দনাথ ঠাকুল খুব বড় কবি তিলেন। তিনি নোবেল পেরাইজ পেয়ে তিলেন। তিনি গীতাঞ্জলী লিকেতিলেন, আড়াই হাদার গান লিকেতিলেন, তাঁর বড় বড় দাড়ি থিল, তিনি দমিদার থিলেন।

বাঃ। তারপর?

তাপ্পর তিনি তো জমিদার থিলেন। শিলাদহে তাঁর দমিদারি থিল। পদ্মা নামের তাঁর একটা লৌকা থিল। সেই পদ্মাতে বথে তিনি অনেক কবিতা লিখতেন। পদ্মা নদীর উপলে ভাসতে ভাসতে...

বাঃ। তারপর?

তাপ্পর একদিন তিনি পদ্মা নৌকা থেকে নেমে পদ্মা নদীর চরে নেমে আলখাল্লা গায়ে দিয়ে পায়তালি করতিলেন...

তারপর?

করতিলেন, পায়তালি করতিলেন, এমন সময় মাত্তামতাই একতা মত্ত কুমির এতে তাঁর পা কামলে ধলে নিয়ে নদীর মধ্যে নিয়ে গেল...

মাস্টার কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, দেখলেন স্যার। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও কত কী পড়িয়েছিলাম, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, অবন ঠাকুর, গগন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবী, শান্তিনিকেতন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী আর একটা হতভাগা কুমির এসে...

চাঁদু খোঁকার বাবা খুবই চিন্তান্বিত হয়ে বললেন এ তো সত্যিই ভারী পোবলেম দেকতিচি।

তারপর একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা, কুমিরে ধরতে না পারে এমন কিছু পড়াননি ছেলেকে আপনি?

হ্যাঁ তাও পড়িয়েছি।

বলেই বললেন, আচ্ছা চাঁদু খোকা, তুমি এরোপ্লেন সম্বন্ধে কী জানো বলো তো?

বাবা বললেন, এইবারে কুমির জব্দ, এইবারে হারামজাদা কুমির কী করে দেখি।

বলব মাত্তামতাই?

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা বলো।

এলোপ্লেন আকাশে ওলে। তার দুতো ডানা থাকে। আকাথের অনেক উপল দিয়ে উলে যায় এলোপ্লেন। লাতেল বেলা তাল অনেক দানালা দিয়ে আলো দেকা দায়। অনেক লোক বথে থাকে দালানার পাথে।

তারপর?

তাপ্পরে প্লেনটা অনেক উঁচু দিয়ে উলতে উলতে দাত্তে অনেক দুলের দেশে, এমন সময় ইঞ্জিনে গন্দগোল হয়ে প্লেনটা একটা মত্ত নদীর মদ্দে এতে পড়ল আর...

আর কী?

আল কী? এত্তা কুমিল, দুতো কুমিল, তিনতে কুমিল, তারতে কুমিল অনেক কুমিল এসে সব লোকদের কেয়ে ফেলল...

ভটকাই-এর গল্প শেষ হবার অনেক আগে থেকেই আমরা খকখক করে হাসছিলাম। এরোপ্লেনেরও এই অবস্থা হল দেখে আর হাসি চাপতে না পেরে সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। আর আমরা যখন হাসছি তখন ভটকাই গম্ভীর।

হাসি থামলে তিতির বলল, তুমি একটি এক নম্বরের বাফুন হয়েছ।

ঋজুদা বলল, যাই বলিস তোরা, তাই বলিস, ভটকাই সঙ্গে না থাকলে ব্যাপারটা ঠিক জমে না আজকাল। ও রীতিমতো ইনডিসপেনসিবল হয়ে উঠেছে।

ভটকাই একবার আমার আর তিতিরের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে সিরিয়াস মুখ করে ডানদিকের জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

একটু পরই ভি. আই. পি. গেস্ট হাউসের আলো দেখা গেল জঙ্গলের ফাঁকে, ফাঁকে। ওখানে প্রদীপকাকুরাও নামবেন এখন। তারপর চা-টা খেয়ে, পরে গল্প-টল্প করে একেবারে ডিনার খেয়ে কাছেই অন্য বাংলোতে শুতে যাবেন। এই বাংলোটা সত্যিই দারুণ। এয়ারকন্ডিশানার আছে, রুম হিটার আছে, ডাইনিং ড্রয়িং রুম, বিরাট বিরাট বাথরুম, সঙ্গে ড্রেসিং রুম। এলাহি ব্যাপার। সামনে লন। লন আর বারান্দাতে বসে তাড়োবা হ্রদ দেখা যায়।

গাড়ি থেকে নেমেই ঋজুদা বলল, প্রদীপ দেখো তো বাঘিনী আর তার তিন বাচ্চার ভিডিও ফিল্মটা কার হেপাজতে আছে।

ফরেস্টার সাহেব নিজেও নামলেন ওঁদের সঙ্গে। বললেন, সকলে ড্রইংরুমে আসুন। টি. ভি.-টা আর ভি. সি. পি. তো ড্রয়িংরুমেই আছে। ওখানে বসেই দেখব সকলে।

তারপর বললেন, বেয়ারা, বারান্দাসে কুর্সি অন্দর করো। সোফা যে কটা আছে তাতে এতজন আঁটবে না।

চা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধরে আমরা ভিডিও ফিল্মটা দেখলাম, তিনটি বাচ্চা

নিয়ে বাঘিনী মোহার্লির পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। কোনও বাচ্চা পেছিয়ে পড়ছে বা এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে, তাকে গুঁক করে অস্ফুট আওয়াজ করে বকে দিচ্ছে মা।

বাঘিনীর চেহারা বেশ রোগা-সোগা। চারজনের খাবার জোটাতে হচ্ছে তো। তাদের খাবার তো ডাইনিং রুমে সার্ভড হয় না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক পরিশ্রম, অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়ার পরই শিকার জোটে তাদের কপালে। রীতিমতো মেহনত করতে হয় তাদের। সেদিক দিয়ে ভাবলে দুনিয়ার সকলেই 'মেহনতি মজদুর'। যেসব মেহনতি মজদুর ভাবেন যে তাঁদের মালিকেরা সবাই পায়ের উপরে পা তুলে খান তাঁরা ঠিক জানেন না। মেহনত মালিককেও কম করতে হয় না, ঝক্কি কম পোয়াতে হয় না, তবে তাঁদের মেহনতির রকমটা আলাদা। মজদুরের মেহনতিটা সাদা চোখে সহজে দৃশ্যমান কিন্তু মালিকের মেহনতিটা সহজে দৃশ্যমান নয়। তাঁর চিন্তা ভাবনা, হাইপারটেনশান, এত মানুষের দায়িত্ব নেবার দুশ্চিন্তা এবং অবশ্যই মুনাফা করার দুশ্চিন্তাও তাঁকে সবসময়েই ভাবিত করে রাখে।

বাচ্চাগুলোর বয়স তিন-চার মাস হবে। এখনও অনেকদিন তাদের শিক্ষানবিশি করতে হবে তাদের মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরে, তারপর একা একা শিকার ধরতে শিখতে হবে। সেইসব নতুন অনভিজ্ঞতার দিনে তাদের বোকাও বনতে হবে কম নয়, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার লজ্জাতে নিজেদেরও লজ্জিত হতে হবে। ময়ূর, বাঁদর এসব ধরতেও যে মুনশিয়ানা লাগে, ক্ষিপ্রতা লাগে, এবং ইংরাজিতে যাকে বলে স্ট্র্যাটেজি, লাগে তা তাদের প্রত্যেককে শিখতে হবে। তার উপরে আছে মানুষ নামক শত্রুর লীলাখেলা। মানুষের ভয় এই অভয়ারণ্যর মধ্যে কম কিন্তু ওইসব অভয়ারণ্যর বাইরে যেসব বাঘ থাকে বা আগে থাকত তাদের বিপদের লেখাজোখা নেই ও ছিল না। বাঘের মতো সৎসাহসী মাথা উঁচু ভদ্রলোক খুব কমই আছে। সৎসাহসী মাত্রই সরল। তাই তারা সহজে মরে, তা সে বাঘই হোক, কী মানুষ। যেসব বাঘ মানুষখেকো হয়ে যায় তাদের কথা আলাদা কিন্তু সে তো মানুষের মধ্যেও যারা মানুষখেকো তাদের কথাও আলাদা। সাধারণভাবে বিচার করলে একজন মানুষের তুলনায় একজন বাঘ অনেক বোকা, ভাল এবং সরল যে, যাঁরাই বাঘের সঙ্গে ওঠা-বসা করছেন তাঁরাই জানেন। কোনও বাঘকে মারতে যে কোনও ভাল মানুষেরই খুব কষ্ট হয়। আর এক ধরনের শিকারি আছেন বা ছিলেন যাঁরা বাঘ মেরে বাঘের গায়ের উপরে পা রেখে বন্দুক রাইফেল হাতে ছবি তোলাতেন। তাঁদের দেখে লজ্জা হয় আমার। বাঘ মেরে বাঘকে প্রণাম করা উচিত। অমন একটি প্রাণ নিধন করার অপরাধ ক্ষমা করার প্রার্থনা করা উচিত।

ওধরনের শিকারিরা এক গভীর হীনম্মন্যতাতে ভোগেন, এঁদেরই জ্ঞাতিগুষ্ঠিরা চিড়িয়াখানার গরাদে বন্দি বাঘকে ছাতার খোঁচা দেন, চিনাবাদাম ছুড়ে মারেন, শ্যালিকার কাছে নায়ক হবার জন্যে। তাঁদের মতো এমন নীচ ও কাপুরুষ জানোয়ার পৃথিবীর কোনও জঙ্গলের কোনও জানোয়ারই নয়।

ফিল্মটা বার বার রিওয়াইন্ড করে ঘুরিয়ে দেখার পর প্রদীপকাকুরা বললেন ঋজুদাকে, এবারে সেই কানা বাঘের গল্পটা হোক।

ফরেস্টার সাহেবও এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। যে সময়ের ঘটনা সে সময়ে অবশ্য তিনি রায়পুরের কাছের এক গ্রামের বাড়িতে হামাগুড়ি দেন। তার বহু বহু বছর পরেই বনবিভাগে ঢুকেছেন।

ঋজুদা বলল, সে গল্পের জন্যে তোমাদের একটি সন্ধে পুরো দিতে হবে অত অল্প সময়ে তা বলা যাবে না।

ওঁরা সকলেই বললেন, তাহলে শুভস্য শীঘ্রম। আমরা তো পরশু সকালে ব্রেকফাস্টের পর ফিরেই যাব নাগপুরে, তাহলে কাল সন্ধেবেলা জঙ্গল থেকে ঘুরে এসেই হোক।

ঋজুদা বলল, ঠিক আছে।

ভটকাই বলল, তাহলে কাল রাতের মেনুটা এইরকম করা যাক। ভুনি খিচুড়ি, ভাজা মুগ ডালের, মধ্যে কিসমিস, বাদাম এসব দিয়ে। খুব করে লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজি, ব্যাসন দিয়ে কড়া করে বেগুনি আর কাঁচা লঙ্কা ভাজা, আর সঙ্গে মুরগি ভাজা।

তাপসকাকু চশমার আড়াল থেকে চোখ তুলে বললেন, আর সুইট ডিশ।

সুইট ডিশ হবে মালপো।

মালপোয়া এখানে কে বানাবে।

আমি বানাব। সদর্পে বলল, ভটকাই। এমন করে বলল, যেন মানুষখেকো বাঘই মারবে বলে হলপ করেছে।

তারপর বলল, দুপুরে আমি বন্দোবস্ত করে রাখব। সঞ্জীবকাকুকে শুধু বলবেন চন্দ্রপুর থেকে কেজি ছয়েক চিনি এনে দেবেন আমাকে একস্ট্রা আর পাঁচশো গ্রাম সুজি।

অত কী হবে।

তিতির বলল।

আহা! বাবুর্চিখানার সৈন্যদল, ফরেস্টার সায়েব, গার্ডেরা কি বাদ পড়বেন মাস্টার ভটকাই-এর রান্না করা মালপো থেকে? কথাই বলে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

আমি বললাম।

আমরা কি সব ইতর জন?

ভটকাই বলল।

আমি জিভ কাটলাম।

## চার

যখন আমরা বেড-টি খেয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম তখন সবে পুবের আকাশে লালের ছোপ লেগেছে। আমরা আমাদের কালিস গাড়িতে উঠতে না উঠতে প্রদীপকাকুদের নিয়ে ও ফরেস্টার সাহেবকে নিয়ে জিপটাও এসে গেল। ফরেস্ট গার্ড মহেন্দ্র সিং বিষেন আমাদের পেছনে উঠে বসতেই গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করল মামাজি।

ঋজুদা বলল, এখন ধুলো নেই। তা ছাড়া ধুলো থাকলেও জঙ্গলের মধ্যে গাড়ির কাচ কেউ নামাবি না। এসিও চলবে না। জঙ্গলে এসে যদি জঙ্গলের শব্দ ও গন্ধই না পাওয়া গেল তাহলে না আসাই ভাল।

আট দশ মিনিট আমরা গেছি, পেছনে জিপে প্রদীপকাকু, তাপসকাকু সঞ্জীবকাকুরা আসছেন। ঋজুদা গাড়ির সামনের সিটে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা পাইপের গোল্ডব্লক তামাকের সুগন্ধে ভরে গেল। যেন আনন্দেও ভরে গেল। ঋজুদা কোনও বাড়িতে ঢুকলে বা ঘরে ঢুকলেও এমনই হয়। কিছু একটা আছে মানুষটার মধ্যে যা আনন্দ আর মজা বিকিরণ করে। সমস্ত পরিবেশকে জীবন্ত, আনন্দময় করে তোলে।

গাড়িটা বাঁদিকে একটা বাঁক নিতেই ভটকাই চেঁচিয়ে উঠল, রোক্কিয়ে মামাজি, রোক্কিয়ে।

কী হল তা বোঝার আগেই ভটকাই চেঁচিয়ে বলল, ওয়াইল্ড বাফেলো। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি, একদল ভারতীয় বাইসন বা গাউর ডানদিকের বাঁশঝাড়ে চরা-বরা করতে করতে কচি বাঁশ পাতা খাচ্ছে। প্রায় দশ বারোটা হবে। তার মধ্যে প্রকাণ্ড বড় মাপেরও আছে দু-তিনটে।

ঋজুদা বিরক্ত গলাতে ভটকাইকে বলল, জঙ্গলে অমন হঠাৎ চেঁচাবি না।

তিতির বলল, মিস্টার ভটকাই, এগুলো বুনো মোষ নয়, এগুলো গাউর বা ভারতীয় বাইসন। আমেরিকান বাইসনেরা এদের কাছে শিশু, অনেকই ছোট।

আমি বললাম, দেখছিস না এদের পায়ে সাদা লোমের মোজা পরানো আছে, কপালেও সাদা লোমের ইলিবিলি। আমেরিকান বাইসনদের রং বাদামি হয়। আমাদের বাইসনদের রংও অনেক সময়ে বাদামি হয় যখন তারা খুব বুড়ো হয়ে যায়। এমনিতে রং একেবারে জেল্লাদার কালো।

ঋজুদা বলল, বুড়ো হয়ে গেলে চিতল বা শম্বরও অমন বাদামি হয়ে যায়।

তারপর বলল, ভাল করে দ্যাখ ভটকাই। তারপর অবাক হয়ে স্বগতোক্তি করল, এখন পর্যন্ত ভটকাই গাউর দেখেনি এতদিন আমাদের সঙ্গে ঘুরেও। কীরকম চেলা তৈরি করলি রুদ্র তুই!

মামাজি গাড়ি দাঁড় করিয়েই রেখেছিলেন।

আমি বললাম, ও আমার চেলা? ভালই বলেছ। হিন্দিতে একটা কথা আছে না,

মুলিমালোয়াঁর বিষেনবাবু বলতেন, গুরু গুড়, চেলা চিনি। তাই।

তারপরে ঋজুদা বলল, আসলে বনের গাছপালা এবং বনের আবহাওয়া অনুযায়ী জানোয়ারদের গায়ের রং পালটে যায়, পরিবেশের সঙ্গে যাতে মিশে যেতে পারে সে জন্যেও রঙের তারতম্য ঘটে তা সেই প্রাণী তৃণভোজীই হোক কি মাংসাশী। সুন্দরবনের বাঘ বা হরিণের চেহারা ও গায়ের রঙের সঙ্গে বিহার বা মধ্যপ্রদেশ বা আসাম বা রাজস্থানের বন্য প্রাণীদের চেহারা ও গায়ের রঙের কোনওই মিল নেই। তা ছাড়া, শীত যেখানে বেশি, সেখানের জানোয়ারদের গায়ে বড় বড় লোম হয়, যেমন রাজস্থানের আলোয়ারের সারিসকাতে।

আমি বললাম, তুমি কিন্তু আমাদের সারিসকাতেও নিয়ে যাওনি কখনও ঋজুদা।

ঋজুদা বলল, নিয়ে যাব একবার। আলোয়ারের রাজার শুটিং প্রিসার্ভ ছিল আগে যে জঙ্গলে সেই জঙ্গলেই এখন সারিসকা টাইগার রিসার্ভ হয়ে গেছে। রাজার শুটিং লজটি এখন একটি হোটেল হয়ে গেছে। দারুণ তার স্থাপত্য। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়ানো, একতলা। সেই হোটেলের বারান্দাতে বসে সোজা দেখা যায় যোধপুরের লাল পাথরে তৈরি মস্ত উঁচু ফটক। সেই ফটক পেরিয়েই মহারাজা ও তাঁর ইয়ার-দোস্তরা শিকারে যেতেন। তবে কংক্রিটের টাওয়ার, যাতে বসে বাঘ মারা হত, সেটা শুটিং লজ-এর ডানদিকে, একটি নদীর ধারে, পিচ রাস্তারও ডানদিকে। যখন যাবি, দেখাব। সাধারণ ট্যুরিস্টরা তার খোঁজ জানে না।

এত কথাবার্তাতেও ভটকাই যে বাইসনকে মোষ বলে ফেলে বেইজ্জত হয়েছিল সেটা ভোলেনি। হারবার বা দমবার পাত্র সে একেবারেই নয়। আমাদের ভটকাইচন্দ্রর এটি একটা বিশেষ গুণ।

সে হঠাৎ বলল, তোরা কেউ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' পড়েছিস?

তিতির বলল, যে না পড়েছে সে বাঙালিই নয়, এবং শিক্ষিত তো নয়ই।

তবে তো পড়েইছ। সেখানে বন্য মহিষদের দেবতা যে 'টাঁড়বারো' তার কথাও নিশ্চয়ই পড়েছ?

পড়েছিই তো।

আমি বললাম,

তারপর বললাম, হঠাৎ এ কথা?

না। মনে পড়ে গেল হঠাৎ তাই-ই বললাম।

তিতির বলল, তুমি অ্যালগারনান ব্লাকউড-এর কোনও বই পড়েছ?

তিতির বলল।

আঃ। তোরা বড় বাক্য-বাগীশ হয়েছিস। দুদিকের জঙ্গল দ্যাখ, যা দেখতে এসেছিস। এই সময়ে আর সন্ধেবেলায়ই তো জানোয়ার দেখার মাহেন্দ্রক্ষণ।

আসলে, ঋজুদা ভটকাইকে বাঁচানোর জন্যেই এমন করল। বুঝলাম আমরা। আমরা ঋজু বোস না হতে পারি কিন্তু তার দৌলতে কম বন-জঙ্গল তো ঘুরলাম না এ পর্যন্ত! একেবারেই কিছু জানি না এমন তো নয়। ভটকাই তো দলে ভিড়ল মাত্র সেদিন, আমিই খাল কেটে কুমির আনলাম আর সেই এমন ভাব করে মাঝে মাঝে সে বলার নয়। 'দুদিনের বৈরাগী ভাতকে বলে অন্ন।'

পনেরো মিনিট পরেই বাঁদিকে একদল ঢোল দেখা গেল। একটা পেল্লায় বড় দাঁতাল শুয়োরকে তারা কবজা করার চেষ্টা করছিল। এগোচ্ছিল, পেছোচ্ছিল, কেউ কেউ লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে আর পেটে পিঠে কামড় বসাবার চেষ্টা করছিল। মুখ দিয়ে আমাদের পোষা কুকুরদেরই মতো এক ধরনের কুঁই-কুঁই আওয়াজ করছিল। কিন্তু সে বন্য বরাহ তো নয়, রীতিমতো বরাহ অবতার। যেমন তার ভীষণ চেহারা তেমনই তার গায়ের জোর। পিঠের উপরে শিরদাঁড়া বরাবর কালো লোমের গোছ খাড়া হয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই শুয়োর বুনো কুকুরদের স্তম্ভিত করে তাদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এবং আমাদেরও হতবাক করে দিয়ে ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে বনের গভীরে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ঢোলেরা কিছুক্ষণ ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভটকাই স্বগতোক্তি করল, পিঠ তো নয়, ইংল্যান্ডের বেকহ্যামের মাথা।

আমরা হেসে উঠলাম, ওই টেনশানের মধ্যেও।

বুনো কুকুরদেরও আত্মসম্মান আছে, যা অনেক মানুষের নেই। একবারের সম্মিলিত চেষ্টাতেও যখন ওরা ব্যর্থ হল তখন সেই শুয়োরের পেছনে ওরা আর দৌড়ল না। বনের আইনে সেই বিরাট বরাহর আয়ু দীর্ঘায়িত হল। কোনওদিন সে হয়তো কোনও বাঘ বা চিতা বা ভাল্লুকের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে ওই বনের কোনও গভীর অন্ধকার রাতে অথবা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দে ভরা কোনও আলোকোজ্জ্বল সকালে সম্মানজনক মৃত্যু বরণ করবে কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুবলে খুবলে খাবে বুনো কুকুরেরা এমন নারকীয় মৃত্যুর হাত থেকে সে আপাতত বাঁচল। তবে এ যাত্রা বেঁচে সে গেল বটে তার সর্বাঙ্গ কুকুরদের দাঁতে নখে ফালা ফালা হয়ে গেছিল নিশ্চয়ই।

আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। হঠাৎ দেখি পেছনের জিপ থেকে নেমে পড়ে সঞ্জীবকাকু টেলিফটো ফিল্ম দিয়ে ঢোলগুলোর ছবি তুলছেন নানাভাবে। সোজা, দাঁড়িয়ে, মাটিতে বসে, কেতরে, পথের উপরে শুয়ে।

তিতির বলল, ধরে ফেলল বলে ঢোলেরা। একেবারে ধরলে হাত পা ধড় মুণ্ডু নিমেষে আলাদা করে দেবে তা কি উনি জানেন না।

ঋজুদা বলল, খবরের কাগজের লোকদের বুনো কুকুরেরাও এড়িয়ে চলে। ওরা জানে যে সাংবাদিক ও 'পাপারাৎজি'-দের কোনওক্রমে খেতে পারলেও, খেলেও, হজম কিছুতেই করতে পারবে না। ঢোলদের পেছন দিয়ে ফিল্মের নিউজপ্রিন্ট বা নেগেটিভ বেরোতে আরম্ভ করবে হয়তো।

তবুও, নামা উচিত হয়নি।

আমি বললাম।

মুখে তো চেঁচিয়ে ওকে বারণও করতে পারছি না। বনের মধ্যে যে চেঁচামেচি করা বারণ।

ঋজুদা বলল, একবার পালামৌর বেতলার টুরিস্ট লজ-এর পেছনের ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসে সকালে চা খাচ্ছি। ডিসেম্বর মাস। আর বারান্দাটা পশ্চিমমুখো। রোদ আসে না। তিন চার কাপ চা খেয়েও গা গরম হচ্ছে না। এমন সময়ে হঠাৎই গা গরম হয়ে গেল। দেখি, একটা বিরাট শিঙাল চিতল হরিণকে তাড়া করে নিয়ে আসছে একদল ঢোল। হরিণটা বাংলোর দিকে দৌড়ে আসছিল এই ভেবে যে মানুষের কাছে এসে পৌঁছতে পারলে ঢোলেরা হয়তো ভয় পেয়ে তাকে নিষ্কৃতি দেবে। কিন্তু কথায় বলে না, 'লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়।' ঢোলেদের হচ্ছে তাই-ই। আমি যেখানে বসেছিলাম সেই বারান্দা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে হরিণটাকে ধরে ফেলল ওরা, মানে, শিঙাল হরিণটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মহুয়া গাছতলায়। তারপর মাত্র পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে তারা তাদের কাজ শেষ করে কুঁই কুঁই করে ডাকতে ডাকতে ফিরে গেল অন্য শিকারের খোঁজে। শিঙালের কঙ্কালটা আর বিরাট শিংটা পড়ে রইল শুধু। ওদের খিদে ব্ল্যাস্ট ফারনেসের মতো। একবার তা জ্বললে কখনই নেভে না মৃত্যুর আগে। শকুন বা কাক যে কিছু খাবে এমন অবশিষ্টও রইল না কিছু, মাংস ও চামড়ার।

ভটকাই বলল, তুমি চেঁচালে না? বন্দুক রাইফেল ন্যাশনাল পার্ক এর মধ্যে না-হয় নাই ছিল, পিস্তল তো ছিলই, গুলি করলে না একটাও?

কেন?

একে বলে Balance of Nature। খাদ্য ও খাদক দুই-ই ঈশ্বরের সৃষ্টি। হরিণ ঘাস খায়। পাতা খায়। মহুয়া এবং অন্যান্য নানা গাছের ফুল ফল খায়, সেই ঘাসপাতা ফুল ফলবাহী গাছেদেরও তো প্রাণ আছে। না কি? আর হরিণকে খায় বাঘ, চিতা এবং ঢোল। মানুষ যখন হরিণ মেরে খায় সেটা স্বাভাবিকতা নয়, কিন্তু বাঘ চিতা বা ঢোল যখন হরিণ মারে তখন সেটা পরম স্বাভাবিকতা। প্রকৃতির মধ্যে অগণ্য খাদ্য ও খাদকের যে সহাবস্থান এবং ভারসাম্য আছে তাকে নষ্ট বা ভ্রষ্ট করার অধিকার আমাদের কারওরই নেই। বাঘ বা চিতা যখন হরিণ শম্বর খায়, ঢোল যখন কোনও প্রাণীকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় তখন সেটা স্বাভাবিকতা কিন্তু বাঘ চিতা যখন মানুষ ধরে খায় তখন সেটা অস্বাভাবিকতা। অস্বাভাবিক কাজ করেছে বলেই মানুষখেকো বাঘ বা চিতাকে আমরা মারতে বাধ্য হই।

তা তো হও। কিন্তু সঞ্জীবকাকুকেই যদি ঢোলে খেয়ে ফেলে অস্বাভাবিকতার চরম করে আমাদের নানা পোজ-এর ছবি তুলবে কে?

তিতির বলল।

ঋজুদা হেসে বলল, খাবে না।

কী করে জানছ।

তিতির বলল।

তুমি এত শিওর কী করে হলে।

আমি জিগগেস করলাম।

ঋজুদা বলল, সংস্কার। সুন্দরবনে অস্বাভাবিকতার চরম করে তা প্রায় স্বাভাবিকতাতেই পর্যবসিত করে বাঘে আকছার মানুষ ধরছে, মধু পাড়তে যাওয়া, কাঠ কাটতে যাওয়া, মাছ ধরতে যাওয়া মানুষকে ধরছে সকলের সামনেই। নোঙর করা জলি বোট থেকে, বড় মহাজনী নৌকা এবং ডিঙি থেকেও মানুষকে ধরে আনছে তারা বহুযুগ হল কিন্তু আজ অবধি কোনও মোটর বোট থেকে মানুষ ধরেনি একটিও।

সত্যি? একটিও না?

না।

কারণ?

কারণ, এটা সুন্দরবনের বাঘেদের সংস্কার। হয়তো মোটর বোটেও আগেকার দিনে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত যে সে কথা তারা জানে বলেই ধরে না। কেন যে ধরে না তা কেউই জানে না। কিন্তু ধরে না। এ এক অসীম রহস্য তেমনই আজ অবধি কোনও ঢোল কোনও মানুষের কোনও ক্ষতি করেনি।

তিতির বলল, পড়েছি, রাশিয়াতে নেকড়েরা মানুষ খায়।

রাশিয়াতে নেকড়েরা দলবদ্ধ হয়ে মানুষ তো বটেই ঘোড়াগাড়ির ঘোড়াকে পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে বলে পড়েছি কিন্তু আমাদের নেকড়েরা কখনও-সখনও ছোট ছেলেমেয়ে জঙ্গলের লাগোয়া গ্রাম থেকে নিয়ে গেলেও প্রাপ্তবয়স্ক কোনও মানুষকে কোনওদিনও আক্রমণ করেনি। তবে আমাদের নেকড়েরা দলেও থাকে না।

তবে?

জোড়ায় থাকে।

তারপর বলল, ভারতের কোনও রাজ্যেই কিন্তু ঢোলেরা মানুষকে আক্রমণ করেনি, তাই সঞ্জীব গাঙ্গুলি পুরোপুরি নিরাপদ। তাদের কোনও চিন্তা নেই।

ফরেস্ট গার্ড মহেন্দ্র সিং বিষেন বলল, কাল যে বাঘিনী ও বাচ্চাগুলোর ছবি দেখলেন তারা গত বছর এই ব্লক-এই ছিল। এখন পশ্চিম দিকে সরে গেছে।

কোনও গুহায় কি?

তিতির শুধোল।

বিষেন বলল, কোনও গুহা তো আন্ধারী-তাড়োবার কোর এরিয়ার মধ্যে নেই। কোর এরিয়ার পুরোটাই সমান অঞ্চল। তবে বাইরে পাহাড় আছে রুখুসুখু অঞ্চল সেটা।

তিতির ঋজুদাকে জিগগেস করল, ব্লক কাকে বলে ঋজুদা?

বলছি। এই তাড়োবা ন্যাশনাল পার্ক-এর এলাকা হচ্ছে পাঁচশো আট বর্গ কিমি আর তাড়োবার টাইগার রিসার্ভ হচ্ছে একশো ষোলো কিমি, মানে তাড়োবা-আন্ধেরী অভয়ারণ্য। সবই তাড়োবা টাইগার রিসার্ভ-এর মধ্যে পড়ে। পুরো জঙ্গলটা একটা ডিভিশানের অন্তর্গত। সেই ডিভিশানে অনেকগুলো রেঞ্জ আছে। সব জঙ্গলেই থাকে। অল্প কিছুটা এলাকাকে বলে কম্পার্টমেন্ট। তিন চারটি কম্পার্টমেন্ট মিলিয়ে একটি বিট হয়।

বিট মানে?

মানে তো বললামই। বানান Beat। এসব ভাগাভাগি সেই সাহেবদের আমল থেকেই ভারতের সব বনেই হয়ে আসছে বনাঞ্চলের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও দেখভাল-এর জন্য। এই এক একটি Beat একজন ফরেস্ট গার্ড-এর অধীন। আবার তিন-চারটি বিট নিয়ে Round হয়। সেই রাউন্ড থাকে একজন ফরেস্টারের অধীনে। তিন-চারটে রাউন্ড নিয়ে একটা Range হয়। Range থাকে একজন Ranger-এর অধীনে। এবং তিন চারটি Range নিয়ে একটি ডিভিশান হয়, যার উপরওয়ালা হন একজন ডিভিশানাল ফরেস্ট অফিসার বা ডি. এফ. ও.। কয়েকটা ডিভিশানের উপরওয়ালা হন একজন কনজার্ভেটর। আবার তিন-চারজন কনজার্ভেটরের উপরে থাকেন একজন চিফ কনজার্ভেটর। কয়েকজন চিফ-কনজার্ভেটরের উপরে থাকেন প্রিন্সিপাল চিফ কনজার্ভেটর। তাঁরও উপরে ফরেস্ট সেক্রেটারি। অনেক রাজ্যের বনের এলাকা যেখানে খুব বড়, যেমন ছত্রিশগড়, সেখানে আবার একাধিক ফরেস্ট সেক্রেটারি থাকেন। সেখানে তাঁদের উপরে থাকেন প্রিন্সিপাল ফরেস্ট সেক্রেটারি। তাঁরও উপরে বনমন্ত্রী। যাকে বলে এম. আই. সি. অর্থাৎ মিনিস্টার ইন চার্জ। তাঁর নীচে মিনিস্টার অফ স্টেট থাকতেও পারেন নাও থাকতে পারেন। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নিয়ম। বুঝলে এবার।

রেঞ্জারদের এখন ডেপুটি কনজার্ভেটরও বলে। ভারত জুড়ে সব দপ্তরেই এখন পদমর্যাদাতে সকলেই এক ধাপ উপরে উঠতে চাইছেন যে এ তারই নজির।

বুঝলাম, কিন্তু তবে মাথা ধরে গেল।

সব গুলিয়েও গেল।

তিতির বলল।

মাথা ধরে গেলেও এই অঙ্কটা জেনে রাখবি। এত বনে ঘুরে বেড়াস তোরা তাদের আর বনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকাটা লজ্জার কথা।

এবারে দেখা গেল সঞ্জীবকাকু অবশেষে জিপে উঠেছেন এবং জিপ স্টার্ট নিল। তা দেখে মামাজিও স্টার্ট দিলেন।

এই দিকেই রামদেগি মন্দিরে যাবার পথ আছে। অনেকে ট্রেকিং করে যান।

ফরেস্ট গার্ড বিষেন বলল।

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। আমি যেবারে জেঠুমনির সঙ্গে এসেছিলাম, রামদেগি মন্দিরে গেছিলাম হেঁটে। তোরা যেতে চাস তো যা।

এসেইছি তো মোটে আড়াইদিনের জন্যে। এর মধ্যে কি অত হয়।

আমি বললাম।

তা অবশ্য ঠিক।

এ জঙ্গলে দেখছি শাল গাছই নেই। সেগুনই বেশি আর বাঁশ। একেবারে বংশীবদন নাম দিলেও ক্ষতি ছিল না।

তিতির বলল।

ভটকাই বলল, খুব জুতসই হত নামটা।

ঋজুদা বলল, সেগুন ছাড়া এইন গাছ আছে, মধ্যপ্রদেশের নিজস্ব গাছ। আমাদের উত্তরবঙ্গ বক্সার জঙ্গলের নিজস্ব আকাতরু, লালি, দুধে লালি, চিকরাশির মতন। সেগুন আর এইন ছাড়াও এখানে আছে বিজা, ঢাওডা, হলুদ, সালাই, টেণ্ডু, কেন্দু, অর্জুন, জাম এবং মহুয়া। এইসব গাছ অন্যান্য রাজ্যের জঙ্গলেও দেখা যায়।

এই আইন না এইন বললে, এর সঙ্গে সুন্দরবনের বাইন গাছের নামের মিল আছে, তাই না।

ভটকাই বলল।

বাবাঃ। বেশ বলেছিস তো। তা তুই তো সুন্দরবনে যাসনি, তুই বাইন গাছের নাম জানলি কী করে?

বই পড়ে। শিবশঙ্কর মিত্রর 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' পড়েছি। ও বই পড়লেই সুন্দরবনের ওপরে থিওরিতে অন্তর অথরিটি হয়ে যাওয়া যায়।

এ যা পড়াশুনা শুরু করেছে ন্যাশানাল লাইব্রেরিও তো ফেল পড়বে রে রুদ্র।

ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, তাই তো দেখছি।

ড্রাইভার মামাজি হঠাৎ বললেন, দেখিয়ে, দেখিয়ে সাব। প্রথমে তার কথাটা বোঝা যায়নি কারণ মুখ ভর্তি গুটকা ছিল। সম্ভবত ভটকাই-এরই সাপ্লাই।

আমরা শুনলাম খেকিয়ে খেকিয়ে।

গাড়ি ততক্ষণে থেমে গেছে। সামনের বাঁকে পথের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা চৌশিঙা হরিণ। যার ইংরেজি নাম Four-horn antelop, বড় শিঙাল। ঘাড় ঘুরিয়ে প্রভাতী আগন্তুকদের দেখছে। তার উন্নত মাথাতে সকালের রাঙা রোদ পড়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে আমাদের দিকে। আমরাও তাকে মুগ্ধ নয়নে দেখলাম। অনেকক্ষণ। যতক্ষণ সে দেখতে দিল আমাদের। তারপর একটি লাফ মেরে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল।

এখানে চৌশিঙা আছে কিন্তু বারাশিঙা নেই। বারাশিঙার জায়গা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের কানহা-কিসলি। বান্ধবগড়েও আছে। এই চৌশিঙা বারাশিঙা বা

শম্বরদের মতো বিরাট নয় তবে ওরা অন্যরকম। আমাদের এই ভারতবর্ষে কতরকম হরিণ আর এন্টেলপই যে আছে। যদিও বৈচিত্রে তারা আফ্রিকার মতো নয়। তবু, চিঙ্কারা, কৃষ্ণসার, হগ ডিয়ার, সোয়াম্প ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, মাউস ডিয়ার, মাস্ক ডিয়ার, পাহাড়ি ঘুরাল, আরও কতরকমের।

ঋজুদা বলল, এখন একটাও নাইজার দেখতে পাচ্ছিস না, লক্ষ করেছিস?

ওরা তো নিশাচর।

তিতির বলল।

গত সন্ধেতে কেমন লাল লাল ভূতুড়ে চোখ নিয়ে পথের মধ্যে বসে ছিল আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে থেকে একেবারে গাড়ির বনেট প্রায় ফুঁড়ে উড়ে যাচ্ছিল উপরে, মনে আছে?

মনে আবার নেই। তারাই তো জঙ্গলকে রহস্যময় করে তোলে। রাত যত গভীর হয় ততই তাদের হরকৎ বাড়ে তবে এখানে তো ভোর ছটা থেকে সন্ধে সাতটা অবধিই জঙ্গলে থাকা চলে।

আমি বললাম।

তুই চাইলে, রাতেও আসতে পারিস। তুই হচ্ছিস গিয়ে চিফ কনজার্ভেটর সাহেবের অতিথি।

আমি হেসে বললাম, আমি না ছাই। 'পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।' আসল তো তুমি।

ভটকাই খুবই বিরল তারিফ জানাল আমাকে, বলল, জিতা রহো।

তিতির বলল, ঋজুকাকা গতকাল বিকেলে যে বিরাট তৃণভূমিতে আমরা হাজার হাজার চিতল হরিণ দেখেছিলাম সেটা কি স্বাভাবিক না বনবিভাগ তৈরি করেছে।

ঋজুদা বলল, বলতে পারিস মাঝামাঝি। এই তাড়োবা-আন্ধারী টাইগার প্রিসার্ভ-এর মধ্যে দুটো মস্ত গ্রাম ছিল এক সময়, যখন আমি কানা মানুষখেকোটা মারি সেই সময়েই ছিল। বনবিভাগ ওই দুটি গ্রামকে উচ্ছেদ করে গ্রামবাসীদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে।

তিতির বলল, 'মাধুকরী' উপন্যাসের ঠুঠা বাইগার গ্রামেরই মতো, তাই না?

তাই। ঠুঠা বাইগার গ্রাম যেখানে ছিল সেখানে জঙ্গল এমন করে জমি জবরদখল করে নিয়েছিল যে সেই গ্রাম শত চেষ্টাতেও ঠুঠা আর খুঁজে পায়নি। জঙ্গলের মধ্যে অন্য জঙ্গল হয়ে তা জঙ্গলের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছিল। কিন্তু এখানে বনবিভাগ গ্রামবাসীদের উৎখাত করে সেই এলাকাতে অন্য প্ল্যানটেশান তো করেইনি চারপাশের জঙ্গলকেও জবরদখল করতে দেয়নি সেই গ্রামের এলাকাটুকু। ফলে তৃণভূমি হয়ে গেছে বিশাল। তাড়োবাতে যে দুটি বিরাট তৃণভূমি আছে সেই দুটিই এক সময়ের গ্রামের স্মৃতিকে বহন করেছে।

ভটকাই বলল, সেই লোকগুলো কি সুখী হয়েছে নতুন জায়গাতে গিয়ে? যাঁরা

বাংলা ছেড়ে পশ্চিমবাংলাতে চলে এসেছিলেন তাঁরা কি সুখী হয়েছিলেন? তাঁদের মধ্যে যাঁরা মরে গেছেন তো গেছেন এখন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের ফেলে-আসা ভিটেমাটির স্মৃতি তাঁদের দুঃখী করেই। নিজেদের জন্মস্থান, বাল্যের লীলাভূমি, যৌবনের বিচরণভূমি, মানুষদের পরিবারের নানা ও নানারকম স্মৃতি এসব কি ভুলে যাওয়ার? না কোনও মানুষ ভুলতে পারে। যেসব ইহুদি জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে গেছিল প্রাণ নিয়ে তারা কি জার্মানিকে ভুলতে পারে? তবে এই সব গ্রামের মানুষদের সান্ত্বনা এই যে তারা একটা মহৎ ব্যাপারের জন্যে উদ্বাস্তু হয়েছে। দেশ ভাগের মধ্যে তো কিছু ক্ষমতালোভী ও গদিলোভী মানুষের ঘৃণা ও চক্রান্ত ছিল কোনও মহৎ ব্যাপার তো ছিল না। তাই তাঁদের যন্ত্রণাটাও দ্বিগুণ ছিল।

আমি বললাম, প্রদীপকাকু বলছিলেন এখানে নাকি আফ্রিকার মতো উড়ন্ত কাঠবিড়ালি আছে? ফ্লাইং-স্কুইরেল?

আছেই তো। প্রদীপ ঠিকই বলেছে। প্রদীপরা সকলেই বন আর বন্যপ্রাণী খুব ভালবাসে। বেশ জানেশোনেও। ছুটি-ছাটা পেলেই সপরিবারে জঙ্গলে চলে আসে। ছেলেমেয়েদের জঙ্গল ও জঙ্গলের প্রাণীদের চেনায়। ওরা বুদ্ধিমান বলেই বুঝতে পেরেছে যে আধুনিক নাগরিক মানুষের বাঁচার শেষ পথ হচ্ছে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা, প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা।

তারপর বলল, বাঘ চিতা নানারকম বাজ ও পেঁচা ছাড়াও এখানে নিশাচর প্রাণী আরও আছে।

যেমন?

তিতির শুধোল।

যেমন ছোট ভারতীয় সিভেট ব্যাট, পাম সিভেট, র‍্যাটেল আর ফ্লাইং-স্কুইরেল তো আছেই।

ওই যে এসে গেলাম আমরা মোহার্লি। দেখা যাচ্ছে ঘর বাড়ি।

ভটকাই বলল।

ঘর বাড়ি আবার কী। বনবিভাগেরই যা বাড়ি। এখানে কি আর বসতি আছে। মোহার্লির পশ্চিম দিকে তরাই বাঁধ আছে। সেই বাঁধের জলাধারে জলও আছে। আর আছে তরাই ব্যাকওয়াটার। ভারী সুন্দর। মোহার্লির পুবেই কোলসা বলে একটি জায়গা আছে সেখানেও বনবাংলো আছে। সবাই-ই তো তাড়োবার ভি. আই. পি. বাংলোতে জায়গা পান না—তোরা চিফ কনজার্ভেটরের অতিথি বলে পেলি। জেঠুমনির সঙ্গে যখন এসেছিলাম তখন কোলসাতে উঠেছিলাম। বাঘের বিচরণভূমি কাছে হবে বলে। তা ছাড়া এই ভি.আই.পি. বাংলো তো তখন বানানোই হয়নি, তবে অন্য বাংলো ছিল।

আমি যদি কোনওদিন বিয়ে করি ঋজুকাকা তবে প্রদীপকাকুকে বলে ওই কোলসার নির্জন বাংলো বুক করে হানিমুন করব। এই ভি.আই.পি. বাংলোটা বড় হোটেল হোটেল।

আসিস। ঋজুদা বলল হেসে। জঙ্গলের মতো জায়গা আছে হানিমুনের আর?

আমিও যদি কোনওদিন বিয়ে করি, বুঝলি তিতির, আমিও কোনও জঙ্গলেই এসে হানিমুন করব।

ঋজুদার বিয়ে করার কথায় আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

হাসছিস কেন তোরা? আমার কি বিয়ে করার কোনও আশাই আর নেই?

তাতে আমরা আরও জোরে হেসে উঠলাম।

ভটকাই বলল, মণিপুরের আর স্যেশেলস-এর এই দুই কন্যাকেই তুমি দুঃখ দিয়ে এলে আর তুমি বিয়ে করেছ। তাদের অভিশাপ লেগেছে না?

কী ব্যাপার?

তিতির বলল।

ভটকাই বলল, তুমি রুদ্রর লেখা 'ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলস-এ' আর 'কাঙ্গপোকপি' এই বই দুটো পড়ে ফেলো।

তিতির বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি বুঝি কাঙ্গপোকপিতে যাইনি?

গেছিলে? ভাল। মনেও নেই। অ্যাডভেঞ্চার তো আমাদের কম হল না। মনেও থাকে না ছাই!

ভটকাই-এর কথাতে হেসে উঠলাম আমরা।

তবুও ভটকাই তিতিরকে প্রশ্ন করল, বলো তো 'কাঙ্গপোকপি' কোন ভাষার শব্দ। আর শব্দটার মানে কী?

তিতির বলল, নাগা ভাষার শব্দ আর মানে হচ্ছে 'মশার জন্মস্থান'।

রাইট। একশোতে একশো। তবুও তুমি গেছিলে বলে আমার মনে পড়ছে না মণিপুর-নাগাল্যান্ডে আমাদের সঙ্গে। না-গিয়েও তো জানতে পারো। ভাল করে মনে করতে হচ্ছে।

মোহার্লির ইনফরমেশান সেন্টার দেখে ফেরার সময়ে আমরা আন্ধারী নদীর রেখা আর গত বর্ষাতে তার ক্রিয়াকাণ্ডও দেখে এলাম।

পথের পাশে পাথরের স্তম্ভ আছে একটু দূরে দূরে গোঁন্দা রাজাদের বানানো। তাদের মাথাতে মাথাতে তার বা দড়ি বাঁধা থাকত—রাজধানী চান্দা থেকে সংকেতে খবর আদান-প্রদানের জন্যে। গ্রাহাম বেল যখন টেলিফোন আবিষ্কার করেননি তারও বহু আগে হয়তো এই টেলিফোন ব্যবহৃত হত। স্তম্ভগুলো আজও অটুট আছে। কত দিন আগের তা কে জানে। পড়াশোনা করে জানতে হবে।

## পাঁচ

তাড়োবাতে ফিরেই ভটকাই-এর তাড়নাতে সঞ্জীবকাকু আর তাপসকাকুদের মামাজিকে পাকড়াও করে গাড়ি নিয়ে চন্দ্রপুর যেতে হয়েছিল। ভটকাই নিজেও যেতে চেয়েছিল, ঋজুদার পারমিশান না পাওয়াতে যেতে পারেনি। চন্দ্রপুর এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ কিমি। কোলসা থেকেও পঁয়তাল্লিশ কিমি। তিতির হানিমুন করতে যদি প্লেনে করে আসে অথবা ট্রেনে করে নাগপুরে তাহলে নাগপুর থেকে আন্ধারী-তাড়োবা পড়বে একশো পঞ্চাশ কিমি। কোলসাও হয়তো ওইরকমই পড়বে নভেগাঁও হয়ে না ঢুকে যদি মোহার্লি দিয়ে ঢোকে।

তারপর ভাবলাম, যার হানিমুন সে বুঝবে। আমি ভেবে মরি কেন? তা ছাড়া বলেছে 'যদি কোনওদিন বিয়ে করি।' যদিকে ফেলি নদীতে।

তাপসকাকুরা ব্রেকফাস্টও করলেন না। বললেন, ভটকাই-এর যা ফরমাশ তাতে দেরি করলে হবে না। চন্দ্রপুর গিয়েই বরং গরম গরম জিলিপি-সিঙ্গাড়া দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারব বাজার করতে করতে।

ভটকাই আমাদের পোলাও মাংস না খাইয়েই ছাড়বে না, যদি তাও নিজের রোজগারে খাওয়াত। ও এবং আমিও অথবা তিতিরও রোজগার তো এখনও কেউই করি না। কিন্তু অন্য ভাল মানুষের ঘাড় ভেঙে এই প্রকার অত্যাচার আমাদের একেবারেই পছন্দ হয় না। তবে খাই আমরাও যে, সে কথা ঠিক। মদত দেওয়ার দোষে আমরাও দোষী। তবে ঋজুদা, একমাত্র যে ভটকাই-এর এইসব বাঁদরামো বন্ধ করতে পারত, করে না। ঋজুদা অবশ্য এমন কোনও মানুষেরই আতিথেয়তা নেয় না যার উপরে তার দুশো ভাগ দাবি নেই। অথচ এই দাবিটা রক্তের আত্মীয়তার নয়, ব্যবসার নয়, স্বার্থর নয়, এই দাবি শুধুই স্বার্থহীন ভালবাসার। প্রদীপদারা সকলেই ঋজুদাকে শুধু মুখেই দাদা বলে না, নিজের দাদার মতোই ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে।

ঋজুদা একদিন খুব দামি একটা কথা আমাদের খেলার ছলে বলে ফেলেছিল। বলেছিল, বুঝলি রে, এই সংসারে দেওয়াটা ভারী সোজা নেওয়াটাই ভারী কঠিন। যারা দেয়, বা যারা কারও জন্যে কিছু করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই মনে করে যে, দিয়েই ধন্য করল বুঝি। আসলে তারা বোঝার ক্ষমতাই রাখে না যে, যাকে দিল তার বাহাদুরিটা অনেকেই বেশি। নিতেও জানা চাই। যাঁরা, কেন? কেন? না, না। একী করছেন! এইসব বলেন নেওয়ার সময়ে, তাঁরা নিতে জানেন না।

তারপর বলেছিল, তোরা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পড়েছিস কেউ?

তিতির বলল, পড়েছি।

তবে তো পড়েইছিস, লাবণ্য অমিতকে সেই যে শেষ চিঠি লিখল, তাতে লিখছে 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়', ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকমই। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে।

তারপর বলল, প্রদীপ আর তাপস যদি আমাদের পোলাও মাংস খাইয়ে সুখী হয় তা হোকই না।

বাঃ রে। ওঁরা তো ভটকাই-এরই প্ররোচনাতে এই ঝক্কি নিতে বাধ্য হলেন।

তা হোকই না। ভাল কাজ কারওর প্ররোচনাতে করলেও তা ভাল কাজই।

তিতির বলল, তুমি আজকাল বড় গোলমেলে কথা বলো ঋজুকাকা, ঠিক বুঝতে পারি না।

পারবি রে পারবি। তোরা সব আজকালকার ছেলেমেয়ে। বাঙালির সাহেব-মেম ছেলেমেয়ে। তোরা বলিস boneless fish খাব, কাঁটা খেতে পারি না। আমার কথাগুলোও ওই মাছেরই মতো হয়ে যায়। কাঁটাওয়ালা। যে ছাড়িয়ে খেতে পারে, সে মানে বোঝে। যে পারে না, সে বোঝে না। সকলকেই যে সবই বুঝতে হবে তার মানেই বা কী আছে। আমার কথা না বুঝলেও তো তোর দিনযাপনের, আনন্দ-দুঃখের এতটুকু হেরফের হবে না। তবে এ নিয়ে মিছে চিন্তা কেন? এ প্রসঙ্গ থাক এখন। এখন বল দেখি মোহার্লির ইন্টারপ্রিটেশান সেন্টারটা কেমন দেখলি?

ভটকাই এইসব কথা শোনেনি। ভটকাই কিচেনে গেছিল। যুদ্ধ শুরু হবে ঘণ্টা দেড়েক বাদে—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুতি কেমন তাই দেখতে গেছিল। যাকে বলে সরেজমিনে তদন্ত করা আর কী? নির্দেশনামা দিতে গেছিল। ফিরে এল কী যেন কুটুর কুটুর করে কামড়াতে কামড়াতে।

তোর মুখে কী?

আমি বললাম।

গুটকা।

ছিঃ ছিঃ।

কেন? ছিঃ ছিঃ-র কী হল। দেশ সুদ্ধ লোকে, যাকে বলে আপামর জনসাধারণ খাচ্ছে তা খেলে ছিঃ ছিঃ করার কী আছে।

ওহে, তোমার যে ক্যানসার হবে।

তিতির বলল।

গলায় তো হবে?

ভটকাই বলল।

হ্যাঁ।

ঋজুদা পাইপ খায়, ঋজুদার জিভেও ক্যানসার হতে পারে। অনেকেরই হয়। যারা গুটকা খায় বা বেশি পান-জর্দা তাদের গলাতে ক্যানসার হতে পারে। আর তোমাদের মতো, যারা কিছুই খাও না কিন্তু কলকাতা শহরে বাস করো তাই তোমাদের শরীরের যেখানে-সেখানে ক্যানসার হতে পারে। লাংগস-এ তো হতে পারেই, ব্রেইন-এ হতে পারে, যদি ব্রেইন থেকে থাকে, লিভারে হতে পারে, পাকস্থলীতে হতে পারে, নাকে কানে, হাতে পায়ে সর্বত্র হতে পারে। নিজেরা খাও

না খেও না, তবে জ্ঞান দিও না বেশি।

আমি বললাম, কোনও ভদ্রলোক গুটকা খায় না।

এই তথাকথিত ভদ্রলোকেরাই তো দেশটাকে ডোবাল। তোর গায়ে কি লেবেল মারা আছে যে তুই ভদ্রলোক? এই বাবুর্চিখানার মেহনতি ভাইয়েরা, এই কালিস গাড়ির ড্রাইভার মামাজি গুটকা খায় বা আমি খাচ্ছি বলেই কি তোর চেয়ে নিকৃষ্ট তারা অথবা আমি?

ঋজুদা হাসতে হাসতে বলল, তুই পড়াশোনা ছেড়ে রাজনীতিতে যা, তোর হবে ভটকাই।

পড়াশুনো ছেড়ে যাব কেন?

না, পড়াশুনো বেশি করলে আবার রাজনীতি করা যায় না তো।

ওসব পুরনো কথা। গ্রাজুয়েশনটা অন্তত করতে তো হবে। নইলে আজেবাজে নেতাও হ্যাটা দেবে। মানুষের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি, তাদের সুখ দুঃখ বুঝি, তাদের সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে চলতে চাই, তাদের সামনে নিজের বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে রাখতে পারি শুধু সেই জন্যেই যদি তোমরা আমাকে দোষী করো তাহলে আমার কিছুই বলার নেই।

আমরা সকলেই এবারে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। তিতির তো ওর 'বক্তব্য রাখা' শুনে হাততালিই দিয়ে উঠল।

তিতির বলল, তোমার হবে।

হবে আবার কী? হয়ে গেছে। প্যাঁজ রসুন আদা গরমমশলা বাটা আরম্ভ হয়ে গেছে, কিসমিস এলেই কিসমিস বাছা আরম্ভ হয়ে যাবে, বেগুন বাসন্তীটা এই মধ্যপ্রদেশের এই জঙ্গলের বাবুর্চি বেচারারা কখনও রাঁধেনি, নামও শোনেনি। দেখলাম ফ্রিজে ভাল পরিমাণ দইও আছে। গতকাল সঞ্জীবদা নির্গুনদের বেগুন খাওয়াবেন বলে উমরেরের বাজারে যা বেগুন পেয়েছেন তার সবই প্রায় তুলে এনেছেন—অতএব বেগুনেরও কমতি নেই। সুতরাং এদের একটি টিপিক্যাল বাঙালি পদ রাঁধতে শিখিয়ে এলাম। তোমরা খেয়ে বলো। দুঃখের বিষয় এই যে এখানে নারকেল নেই, পাওয়াও যায় না। থাকলে তো নারকেল কুরে উপরে উপরে একটু ছড়িয়ে দিতাম। তবে বেগুন আমি লম্বা করে কেটে দিয়ে এসেছি, ওরা বেগুন হাতে পেলে তো চারকোণা টুকরো করে কেটে ফেলত। তাই রিসক নিলাম না। নিজেই কেটে রেখে এলাম। তবে এও জানি যে, পাঁচ দশ বছর পরে যদি এখানে ফিরে আসি তবে এরা বেগুন বাসন্তীই পরিবেশন করে নাম বলবে 'বেগুন ভটকাই'। ওদের আমার নামটা ভারি পছন্দ হয়ে গেছে। তা ছাড়া জনপ্রতি, দুটি করে গুটকার প্যাকেট দান করেছি যে। বুঝলিরে রুদ্র, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়লেই লেজ গজায় না। মানুষের সঙ্গে, সব স্তরের মানুষের সঙ্গে যদি সমানভাবে এবং তাদের মতো করে মিশতেই না পারিস তবে লেখাপড়া শেখা না শেখা সমান।

এবারে চুপ করবি ভটকাই।

অশেষ ধৈর্যসম্পন্ন ঋজুদারও যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

ভটকাই চুপ না করে বলল, নাগপুরে আমরা যেখানে উঠেছিলাম, সেই সেমিনারি হিলস-এর মহারাষ্ট্র স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর দারুণ গেস্ট হাউসের মালির নাম কি জানিস তোরা?

অবাক হয়ে আমি আর তিতির বললাম, কী?

হেমরাজ চিঙ্কিকেডে। ঋজুদা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে তাও কি জানিস? পাইপের সুগন্ধি টোব্যাকো তাকে খইনি করে খেতে দিয়ে পুটুর পুটুর করে কত গল্প করেছে তার সঙ্গে তা জানিস?

ঋজুদা এবারে অবাক হয়ে বলল, তুই জানলি কী করে?

জানতে হয়।

তারপর বলল, তুমি তো আমাকে তোমার চেলা বলেই মানতে চাও না, আমি বড়লোক নই। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ি, কিন্তু আমার মতো চেলা তোমার আর কেউই নেই। আমিও চিঙ্কিকেডের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। ওর দাদু মানে ঠাকুরদা আন্ধারী-তাড়োবাতে ছিল। বহুদিন আগে। বনবিভাগে কাজ করত। ওর বড়পিসিকে একটি কানা বাঘে এই জঙ্গলে খেয়েছিল। মানুষখেকো বাঘ। আমি নাগপুরে ফিরে যখন হেমরাজ চিঙ্কিকেডেকে ডেকে বলব যে তুমিই সেই শিকারি যে ওই মানুষখেকো বাঘটিকে মেরেছিল তখন তোমার খাতির দেখবে তুমি!

ঋজুদা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বলল, কখন তুই এত গল্প করলি তার সঙ্গে। তোরা তিনজনে তো সব সময়েই একসঙ্গে ছিলি যদিও তিতির আলাদা ঘরে ছিল।

সেটা কোনও কথা নয়। তুমিও তো সব সময়ে কত মানুষ পরিবৃত ছিলে, তুমিই বা তার মতো ইতরজনের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কখন এত গল্প করলে!

ঋজুদা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, এ তো ভারি গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। যাকগে এসব প্রসঙ্গ। মোহার্লির ইনফরমেশান আর ইন্টারপ্রিটেশান সেন্টার কেমন দেখলি তাই বল। সকলকেই জিগগেস করছি।

দুর্দান্ত। তিতির বলল।

পশ্চিমবঙ্গের রাজভাতখাওয়া এবং আফ্রিকার গোরোংগোরোতেও ইন্টারপ্রিটেশান সেন্টার দেখেছি কিন্তু এটি একেবারে অন্যরকম। রেঞ্জার নীতিন কাক্কোডকর-এর ইমাজিনেশান আছে। একটি গোঁন্দ মেয়ের ফোটোর ও বয়ানের মাধ্যমে যেমন করে বন বন্যপ্রাণী, প্রাকৃতিক সম্পদের কদর এবং তা রক্ষা করার বিষয়গুলি বুঝিয়েছেন আগন্তুকদের তার কোনও তুলনা নেই। আদিবাসী চারুকলা, নানা মোটিফ, ভিতরের এবং বাইরের কোরা রঙের দেওয়ালে কালো ও লাল রঙে আঁকিয়ে পুরো সেন্টারটাকেই এক অন্য উচ্চতাতে পৌঁছে দিয়েছেন। এমন গুণী,

দরদি, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ওয়ালা রেঞ্জার দেশের সমস্ত জঙ্গলেই দরকার।

আমি বললাম।

তারপর বললাম, তোমার কিন্তু সি. সি. এফ. সাহেবকে এই নীতিন কাক্কোডকর রেঞ্জার সম্বন্ধে জানানো উচিত। ওঁর খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হওয়া উচিত।

সত্যিই উচিত। তবে এখানের ডেপুটি রেঞ্জারেরও কৃতিত্ব থাকতে পারে কিছু। সেটা জিগগেস করে জানতে হবে।

প্রদীপদাদের সঙ্গে যিনি ঘুরছেন তাঁর নাম কী?

তাঁর নাম জি. কে. বশিষ্ঠ। লেখেন Washistha। আর অন্যজনের নাম এস. আর. গায়কোয়াড়। তাঁকে দেখিনি। নাগপুরে গেছেন।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বলল।

তারপর ভটকাইকে বলল, এই যে কিচেন ম্যানেজার, এক কাপ কফি কি পেতে পারি? একটু দ্যাখ না?

বাই ওল মিনস।

ভটকাই বলল।

ভটকাই চলে গেলে ঋজুদা বলল, দ্যাখ, তোদের সঙ্গে মিশে ছেলেটা আদবকায়দা এবং ইংরেজিটাও কী দ্রুত শিখে নিচ্ছে। ও যদি তোদের মতো ভাল ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত তবে আরও কত ভাল হতে পারত।

মস্ত বাঁদরও হতে পারত ঋজুকাকা।

তিতির বলল।

তারপর বলল, তুমি কি ভাব ভাল স্কুলে আজকাল সব ছাত্রই ভাল পরিবার থেকে, সৎ পরিবার থেকে আসে? অসৎ ব্যবসাদার, ঘুষখোর, ঘুষের দালাল, রাজনীতির মাস্তান, স্মাগলার এদের ছেলেমেয়েতেই এখন ভাল স্কুলের অধিকাংশ ভরে গেছে। লাখ লাখ টাকা ডোনেশান দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভরতি করেছে তারা। যোগ্য ছেলেমেয়েরা ঢুকতে পারছে না। একটা সময় আসবে ঋজুকাকা যখন সমাজের মধ্যমণি হবে এই শ্রেণীর মানুষদের ছেলেমেয়েরাই। এই দেশের ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ। তা ছাড়া, ছেলে বা মেয়ে ভাল বা মন্দ হয় নিজের পারিবারিক পটভূমির গুণে এবং নিজের নিজের ভাল হওয়ার জেদে। স্কুল যেমন তাকে অনেক সাহায্য করতে পারে আবার যার নিজের তাগিদ নেই তার কিছুমাত্রই উন্নতি করতে পারে না। ভটকাই ভাল হতে চায়, শিখতে চায়, তাই শিখেছে, শিখছে।

তা ঠিক। ঠিকই বলেছিস তিতির।

ভটকাই ফিরে এসে বলল, কফি আসছে। আজ লাঞ্চও খেতে খেতে দেরি হবে তাই সঙ্গে একটু ডালের বড়াও করে দিতে বললাম তোমাকে।

কী ডালের বড়া?

মটরের। সঙ্গে পেঁয়াজ কুঁচি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে।

হাসি মুখে ঋজুদা বলল, আমি একা খাব? তোরা খাবি না।

আমরাও খাব। তোমার প্রসাদ বলে কথা।

ভটকাইচন্দ্র বলল।

ঋজুদা বলল, আজকে বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি করে বেরোতে হবে Ghost Tree ভাল করে দেখাতে হবে তোদের। এই গাছেদের জানিস তো? বিভিন্ন ঋতুতে গায়ের রং বিভিন্ন হয়। পত্রশূন্য যখন হয় তখনই এমন অদ্ভুত সাদা হয়ে যায়। এদের গায়ের আঠা দিয়ে নানারকম ওষুধ-বিষুধ তৈরি হয়, যে আঠার নাম Karu-Gum.

গাছগুলোর বটানিকাল নাম কি জানো ঋজুকাকা?

জানি।

কী?

Sterculia Urens.

তারপর বলল, ওই যে মোহার্লি যেতে যোগাযোগের প্রাচীন স্তম্ভগুলি দেখলি, সেগুলি গোঁন্দ রাজারা চন্দ্রপুর থেকে মোহার্লি-খাটোডা-জামনি-চিমুর এবং উমরের হয়ে নাগপুর পর্যন্ত পথের পাশে গেঁথেছিলেন। ওইভাবে কম্যুনিকেশান চালু রাখতেন গোঁন্দ রাজারা। এখন বড় রাস্তার স্তম্ভগুলো হয়তো লোপাট হয়ে গেছে কিন্তু বনের মধ্যে এই মোহার্লির পথে এখনও সেগুলো অটুট আছে। আশ্চর্য! কতদিন আগেকার!

এই ইন্টারনেটের দিনে দড়ি টেনে কম্যুনিকেশানের কথা ভাবা যায়! বলো ঋজুকাকা! কম্যুনিকেশানের কী উন্নতিই না হয়েছে এখন।

আমি বললাম, সত্যি!

ভটকাই বলল, সত্যই সেলুকাস কী বিচিত্র এই দ্যাশ!

তারপর বলল, এই ওভার কম্যুনিকেশানই একদিন মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনবে। কোনও কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। দেখে নিস তোরা।

তিতির বলল, কথাটা সত্যিই ভাববার।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা, বলাই বাহুল্য, খুবই জোর হল। ভটকাই-এর জয়জয়কার। প্রদীপদারা তো বেগুন বাসন্তী খেয়ে মুগ্ধ। পাঁঠাটাও খুবই ভাল এনেছিলেন সঞ্জীবকাকুরা। ইনটেলিজেন্টদের মাংস খাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি কখনও তবে পাঁঠাদের মধ্যে এমন পাঁঠা বেশি খাইনি।

তাপসকাকু বললেন ঋজুদাকে, ভটকাইকে আমরা আপনার সঙ্গে যেতে দেব না, নাগপুরে আটকে রাখব দু-তিনদিন। আমাদের স্ত্রীদের ও বেগুন বাসন্তী এবং অন্যান্য রান্না শিখিয়ে দেবে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চলে এসেছে এই প্রবাসে ঘর করার জন্যে। মা-ঠাকুরমার কাছে থেকে ভাল বাঙালি রান্না শেখার সুযোগ ও সময়ও পায়নি ওরা।

ভটকাই বলল, আপনারা খেতে জানেন না, তাই বউদিরা রাঁধেন না। নিশ্চয়ই

সব রান্নাই জানেন। গাইয়ের মতো রাঁধুনিকেও প্রশংসা করে করে গাওয়াতে হয় এবং রাঁধাতে হয় তবে না ভিতরের আসল জিনিসটা বেরুবে।

তিতির বলল, সাবাস। এবারে কিন্তু ঋজুদা ভটকাই একেবারে অপ্রতিরোধ্য, সব ব্যাপারেই।

আমি বললাম, একশোতে দুশো।

প্রদীপদা বললেন, না। রাঁধতে অনেকেই জানতে পারেন কিন্তু অল্প বয়সে এরকম বড় একটা দেখা যায় না।

ও সব ব্যাপারেই এঁচড়ে পাকা।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, বেশি ট্যাক ট্যাক করিস না। রাতে লুচি, আলুর চোকা, লিভারের চাঁট আর পেঁপের প্লাসটিক চাটনি করতে বলেছি। বেশি পেছনে লাগলে সব কেঁচিয়ে দেব।

সঞ্জীবকাকা বললেন, তোমার বাবুর্চি-বাহিনীর সঙ্গে তোমার একটা ছবি তুলে দিতে হবে খাওয়া শেষ হলেই। ওদেরও ছবির কপি পাঠিয়ে দেব ডেপুটি রেঞ্জারের কাছে। তাঁর ছবিও তো থাকবে।

তাঁর কীসের ছবি?

বুনো কুকুরদের স্নিফার ডগ-এর ট্রেনিং দিচ্ছেন সকালবেলা, তার ছবি।

তাই?

বলে, হেসে ফেলল ঋজুদা।

বিকেলে এক কাপ করে চা খেয়েই আমরা সাড়ে চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার আগে আমরা তো বটেই সঞ্জীবকাকুরাও ঋজুদাকে বললেন, আজকে জঙ্গল থেকে ঘুরে এসেই সেই কানা বাঘের গল্পটা কিন্তু শুনব ঋজুদা।

প্রদীপ কাকু বললেন এই সেশানে কি হবে?

হবে না কেন? যতক্ষণে বাঘ শিকার না হচ্ছে আমরা ছাড়ব না। তাপসকাকু বললেন।

আমি সকলকে পোটাটো ফিঙ্গার-চিপস উইথ টোমাট্যো গার্লিক সস সাপ্লাই করে যাব। সঙ্গে চা এবং কফি, যার যা পছন্দ। টার্টার সস থাকলে জমে যেত। কিন্তু মালমশলা যে নেই, বানাব কী করে।

ভটকাই বলল।

তুমি গল্প শুনবে না?

তিতির শুধোল ভটকাইকে।

শুনব নিশ্চয়ই।

তবে এতসব রান্না-বান্না করবে কে?

আমার সৈন্যদল। সব ফিট করে দেব। জেনারাল কি নিজে হাতে রাইফেল চালায় নাকি কখনও? ডাইরেকশান দিয়ে দেব আর তার একজিকুশানটা দেখবি

তোরা।

ঠিক আছে এবারে কথা বন্ধ করে গাড়িতে ওঠো।

ঋজুদা ফরমান জারি করল।

আজ বিকেলে একেবারে অন্য দিকে গেলাম আমরা। এদিকটাতে আগে কখনও আসিনি। বিষেনদাদা তাড়োবা হ্রদের মধ্যে কুমির নাক উঁচিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে তা দেখাল।

'এই কুমির তোর জলে নেমেছি' খেলাটা খেলব? ছেলেবেলাতে যেমন খেলতাম বন্ধুদের সঙ্গে?

তিতির বলল।

আজ্ঞে না। এ কুমির সেই কুমির নয়। একবার পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে গেলে কারওর-ই করার কিছুই থাকবে না। ভটকাই-এর গল্প শুনলি না। মাত্তামতাই একটা কুমির।

ইঁহাকি মগ্‌গর সব খতরনাক হ্যায়। হরসাল জংলি জানোয়ার তো পাকড়াতাহি হ্যায় আদমিভি এক-দো পাকড় লেতা। ইয়ে পানিকি নজদিক যানা বিলকুল নেহি চাহিয়ে।

শম্বর, নীলগাই আর বাইসনও অনেক হয়েছে এখানে। চোরা শিকার সম্ভবত একদমই হয় না। খুবই টাইট-অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, কোর এরিয়াতে অবশ্যই। Buffer-এলাকা আর পার্ক-এর পেরিফেরিতে কেমন অবস্থা জানা নেই।

ঋজুদা বলল।

সংখ্যাতে বেড়েছে চিতল। হাজারে হাজারে আছে, কানহা এবং পালামৌতে যেমন আছে। তবে পালামৌতে এখন কেমন আছে কে জানে। জঙ্গিগোষ্ঠীর ছেলেরা শুনতে পাই মাংসের জন্যে হরিণ শম্বরও মারছে। জঙ্গলের মালিক এখন তারাই।

আজও একটা ভাল্লুক দেখা গেল এবং বেশ কয়েকটা শুয়োর। গতকাল সকালের সে বরাহ বাবাজিকে দেখা গেল না। কোন নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছে সে খবরটা তো আমাদের জানা নেই। দিন দশ পনেরো লাগবে তার আবার স্বাভাবিক হতে, যতই টগবগিয়ে সে পালাক না কেন, জখম তো কম হয়নি।

মনে হল এখানে পাখি কম। সে কথা বলতেই বিষেনদাদা প্রতিবাদ করে বলল, এখানে একশো পঁচানব্বই রকম পাখি আছে। গাড়ির শব্দে কি পাখির ডাক শোনা যায়। পাখির ডাক শুনতে হলে জঙ্গলের মধ্যে সকালে বা সন্ধেবেলা চুপ করে বসে থাকতে হবে। তবে তিতিরের টিউ টিউ এবং বটের বাহিনীর পথ পেরুনোও কেন শোনা বা দেখা গেল না তাই ভাবছিলাম।

তিতির বলল, এখানে আর কী কী আছে?

আছে একচল্লিশ রকমের জানোয়ার, মানে mammals, তিরিশ রকমের সাপ, বিছে ইত্যাদি, ছাব্বিশ রকমের মাকড়শা, চুয়াত্তর রকমের প্রজাপতি, তেইশ

রকমের মাছ, তাড়োবা হ্রদ এবং বর্ষার আন্ধারীতে, আর পাঁচরকমের উভচর আছে।

উভচর মানে? স্যালামান্ডার?

তিতির বলল।

ফ্লাইং-স্কুইরেলও উভচর। প্রথমজন জল ও স্থলে বিচরণ করে আর দ্বিতীয়জন স্থল ও শূন্যে।

ভটকাই বলল, বিষেনদাদা বনবিভাগের প্যামপ্লেট মুখস্থ করে আমাদের উপরে ঝেড়ে দিল। এত সব থোড়াই দেখা যায়।

এক সঙ্গে হয়তো দেখা যায় না তবে দেখা না গেলে বনবিভাগের কর্মীরা কি আর ব্রোশিওরে লিখতেন। দেখা কি সব অত সহজে যায় আড়াইদিনে! এই আমাদের শহুরেদের রোগ। সারা বছর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত হেমন্ততে এঁরা এখানেই থাকেন দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টা। এঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের এই হারিকেন ট্যুরের অভিজ্ঞতা কি এক হতে পারে। জঙ্গলে এসে জঙ্গলকে সময় দিতে হয়, এ তো আর কুতুবমিনার দেখা নয়। সময় দিলে তবেই জঙ্গল নিজেকে খোলে মেলে। প্যাকেজ ট্যুর-এর ট্যুরিস্টদের মতোই আমাদের হাবভাব। জঙ্গলের প্রেমিককে অন্য প্রেমিকের চেয়েও অনেক বেশি ধৈর্য ও ভালবাসা দিতে হয়। হুট করে চলে যাব, আবার সব জানব দেখবও তা তো হয় না।

ঋজুদা বলল।

আমরা সকলেই মানলাম কথাটা। বাংলা না বুঝলেও, মনে হল। বিষেণদাদাও ঋজুদার কথাগুলোর সারমর্ম বুঝে খুশি হল।

ঠিক সেই সময়ে একটা চমৎকার কাঠঠোকরা তার দুই ডানাকে চক্রাকার করে বাঁদিকের কোনও গাছের ডাল থেকে ডানদিকের জঙ্গলে উড়ে গেল। শেষ সূর্যের আলো তার বহুবর্ণ ডানার রঙের গুণকে গুণান্বিত করল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম আমরা।

ঋজুদা বলল, এই তো তাড়োবাতে আসা সার্থক হয়ে গেল। আর কিছু দেখা যাক আর নাই যাক। আসল বনের মধ্যে এলেই যে ভাললাগা, বাঁশপাতার মধ্যে হাওয়ার মর্মর, পাতা খসার শব্দ, সকাল সন্ধের বনজ গন্ধ এই সবই তো যথেষ্ট। তারপর এবারে খুব কমই বা দেখলি কি তোরা? লেপার্ড থেকে শুরু করে চিতল। চৌশিঙা, বাইসন, নীলগাই, শুয়োর, ভাল্লুক মায় বুনো কুকুর পর্যন্ত। এই তো যথেষ্ট।

আর বাঘ!

ভটকাই বলল।

আরে এমন মানুষ অনেক আছে ভারতের নানা গভীর বনের অভ্যন্তরের গ্রামের বাসিন্দা, যারা জন্মেছে জঙ্গলের মধ্যে মরেওছে জঙ্গলেই কিন্তু সারাজীবন একটাও বাঘের দেখা পায়নি। মানে, নিজে চোখে দেখেনি। কথায়ই বলে না,

টাইগার লাক। বাঘ দেখতে ভাগ্য থাকা চাই। বাঘের জঙ্গলে এলেই বাঘ দেখা যায় না। যে সব জঙ্গলে বাঁধা মোষ খাইয়ে খাইয়ে বাঘকে গৃহপালিত পশুর মতো করে ফেলার হয়েছে, গলায় রেডিও কলার লাগিয়ে দিয়ে ব্লিপ-ব্লিপ শব্দ শুনে হাতির পিঠে ট্যুরিস্ট নিয়ে গিয়ে নির্ঘাৎ বাঘ দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানের বাঘ আর বাঘ নেই। জঙ্গলের মধ্যে স্বাভাবিক বাঘ দেখার উন্মাদনা, ভয়, উত্তেজনাই আলাদা। ওইরকম করে বাঘ দেখার চেয়ে সারাজীবন বাঘ না দেখার আক্ষেপ নিয়ে মরাও ভাল। রাজদর্শন কি সহজে হয়? তা ছাড়া বাঘ হল জাত শিকারি। তোকে সে দেখে যাবে, এপাশ থেকে দেখবে, ওপাশ থেকে দেখবে, সামনে থেকে দেখবে পেছন থেকে দেখবে অথচ তুই টেরটি পর্যন্ত পাবি না। এমনই হচ্ছে বাঘের হরকৎ। এমনি এমনিই কি সে বিশ্বসেরা জানোয়ার!

পথটা ডানদিকে একটা বাঁক নিয়েছে। তাড়োবার জঙ্গলে এমনিতে সমানভূমিতে যদিও অভয়ারণ্যর বাইরের এলাকা রুক্ষ, বন্ধুর ও পাহাড়ময়। তা ছাড়া এখানে অধিকাংশ পথও প্রায় সোজাই। পথের পাশে পাশে বানাওটি নুনি আর কুদরতি নুনি। অর্থাৎ Man made and Natural। বনবিভাগও ছোট ছোট পুকুর খুঁড়েছে সেই সব জায়গাতেও যাতে বনে বেড়াতে আসা ট্যুরিস্টদের জানোয়ার দেখানো যায়। আসলে অধিকাংশ ট্যুরিস্টরাই তো ভটকাইয়ের মতো। জঙ্গল দেখা মানে ভাবে জানোয়ার দেখা। দু-তিনদিনের মধ্যে জানোয়ার দেখতে না পেলে বলে ধুসস। বোগাস। এ জঙ্গলে কিসসুই নেই। জঙ্গল দেখতে জানে কজন মানুষ!

ডানদিকে পথটা পুরো ঘুরতেই শম্বর। শম্বরদের একটা দল। তবে সবই মেয়ে শম্বর। এই দলটাতে শিঙাল নেই। হয়তো আশেপাশে আছে, আমাদের দৃষ্টিগোচর হল না। কিছুক্ষণ আমাদের দেখে তারা দৌড়ে পালাল জঙ্গলের ভিতরে। তারা সরে যেতেই তাদের পেছনে মস্ত একটা Ghost Tree দেখা গেল। সত্যি? কী আশ্চর্য সাদা। যেন মনে হচ্ছে স্পেশাল সাদা স্নোসেম দিয়ে রং-মিস্ত্রিরা এসে পুরু করে রং লাগিয়ে গেছে।

মাঝে মাঝেই বড় বড় উইয়ের ঢিবি। ঢিবি মানে, গোলাকৃতি নয়, সোজা উঁচু হয়ে উঠেছে, ভাঙা ভাঙা। ভাল্লুকবাবাজিরা তাতে নাক ঢুকিয়ে সোঁ সোঁ করে শুষে নিয়ে উই খায়।

বনবিভাগ জঙ্গলের মধ্যে যেখানে দোলা মতো আছে সেখানে আরও খুঁড়ে শুয়োর, শম্বর, বাইসনদের গা ডুবিয়ে থাকা বা wallowing-এর জন্যে তা আরও গভীর ও বিস্তৃত করে দিয়েছেন। আন্ধারী নদীর রেখাতেও যেখানে যেখানে গাড়হা আছে সেখানে সেখানেও ওরকম করে রেখেছেন তাঁরা। বনের মধ্যে নানা ওয়াচটাওয়ার আর হাইডসও আছে। বনপ্রেমী যাত্রীরা যাতে উপরে উঠে তাতে বসে অথবা হাইড-এর আড়ালে লুকিয়ে থেকে জানোয়ার দেখতে পারেন সে জন্যে।

কত বাঁশ, না?

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, এই জঙ্গল তো বাঁশ আর সেগুনেরই। জানিস তো। বাঁশ গাছে তাদের জীবনে একবার মাত্র ফুল আসে। ফুল আসা কিন্তু ওদের কাছে সুখবাহী ঘটনা নয়। ফুল এলে বাঁশ গাছ মরে যায়। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে ফুলের থেকে বীজ ঝরে পড়ে নীচে এবং তা থেকে বৃষ্টির পর আবার নতুন বাঁশ গাছ জন্মায়। এই তাড়োবা-আন্ধারীতে শুনেছি উনিশশো বিরাশি-তিরাশিতে সব বাঁশ বনে ফুল এসেছিল এবং সব গাছই মরে গেছিল। এখন আমরা যে বাঁশ বন দেখতে পাচ্ছি তা ওই আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ঝরে-পড়া বীজ থেকে নতুন গজানো বাঁশঝাড়।

তারপর ঋজুদা বলল, এখনও তো গরম পড়েনি। গরম পড়ার আগেই জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে 'ফায়ার লাইন' করবে বনবিভাগের কর্মীরা বন কেটে। গরমের সময় দাবানল লাগলে যাতে হাওয়াতে আগুন এক জঙ্গল থেকে ছড়িয়ে অন্য জঙ্গলে যেতে না পারে তাই ছ'মিটার থেকে বারো মিটার জায়গা থেকে সব গাছগাছালি ঘাস পাতা নির্মূল করে দেয় বনবিভাগের লোক যাতে আগুন সেই ফাঁকা জায়গাতে এসে বুড়ির মতো বিড় বিড় করে মরে যায়, অন্য জঙ্গলে আর পৌঁছতে না পারে। ভারতে সব জঙ্গলেই এমন করা হয় চোত-বোশেখ-এর আগে আগেই। এই fire line করা বনবিভাগের কর্মীদের এক বিশেষ কাজ। অনেক সময়ে গাছও কাটতে হয়। দুভাবে কাটেন।

এক ক্লিয়ার ফেলিং আর অন্য কপিসিং ফেলিং। ক্লিয়ার ফেলিং মানে, যেখানে জঙ্গল একেবারে সাফ করে নতুন প্ল্যানটেশান করা হয়, আর কপিসিং ফেলিং মানে বেছে বেছে মার্কা মেরে দিয়ে গাছ কাটা। তাড়োবা দেখে মনে হচ্ছে এই বনে বেশ কিছুদিন হল সব felling-ই বন্ধ আছে ভবিষ্যতে কখনও হয়তো হবে। সচরাচর টাইগার প্রিসার্ভ বা অভয়ারণ্যের গাছ কাটা এমনিতেও হয় না, জানোয়ারদের এবং বিশেষ করে বাঘেদের অসুবিধা ও বিরক্তি না ঘটাতে।

মেলঘাট টাইগার প্রিসার্ভটা নাগপুরের কোন দিকে ঋজুদা?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঠিক কোন দিকে তা ম্যাপ দেখে বলতে হবে। সে এলাকা পাহাড়ি কিন্তু নাগুরের কাছেই। আমাদের তো ওখানেই যাবার কথা ছিল কিন্তু সি. সি. এফ. সাহেব শেষ মুহূর্তে প্রদীপকে আন্ধারী তাড়োবাতেই যেতে বলেন। আমার অনুমান, এখানে ভি. আই. পি. বাংলোটি খুব ভাল বলেই। ভাবলেন, ঋজু বোসের মেলঘাটে যদি অসুবিধে হয়। তবে ভালই হয়েছে, আমি তাড়োবাতে এলেও তো এসেছি সেই কোন কালে আর তোরা তো দেখিসইনি।

আমরা তো মেলঘাটও দেখিনি।

সে তো আমিও দেখিনি। যাওয়া যাবে কখনও পরে। বলব প্রদীপকে।

একবার এ তল্লাট ছেড়ে গেলে আর কি আসা হবে। কোথায় ছুট করে চলে যেতে হবে তোমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বা শিকার করতে। তোমার সময় আবার কবে হবে তা ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেন না।

তিনিই তো সর্বজ্ঞ। তিনি জানলেই হল।

আরে যদি যাইও তোদের মধ্যে কেউ কেউ তো যাবিই আমার সঙ্গে না কি? একা তো কতদিন হয়ে গেল আমি কোথাওই যাইনি। তোরা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিস, পরনির্ভর হয়ে যাচ্ছি আমি, এটা আমার চরিত্রের পক্ষে ভাল নয়। না কি বুড়ো মেরে যাচ্ছি? কে জানে।

যাই বলো আর তাই বলো, আমাদের ফেলে কোথাওই যাওয়া চলবে না।

আমরা সমস্বরে বললাম।

সামনেই পথের উপরে শেষ বিকেলের একটি ছোট্ট সাদা মন্দির। তার মধ্যে লালরঙা দেবতার সিঁদুর চর্চিত মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

তিতির বিষেণদাদাকে শুধোল, কোন দেবতার মন্দির?

বিষেণদাদা বলল, মারুতি।

ভটকাই বলল, মারুতি-সুজুকি? এখানেও এই জঙ্গলেও তারা গাড়ি বিক্রি করে নাকি?

ঋজুদা হো হো করে হেসে উঠল। আমি চালাক চালাক মুখ করে চুপ করে রইলাম।

তিতির বলল, মারুতি মানেও জানো না? মারুতি গাড়ি তো খুব চড়ো দেখি।

সে মেজ জ্যাঠার গাড়ি। আমাদের কি গাড়ি আছে নাকি?

ভটকাই বলল।

মারুতি হল পবন নন্দনের নাম। পবন দেবতা। হনুমানজি, বুঝেছ সবজান্তা মিস্টার ভটকাই।

অনেকক্ষণ পরে ভটকাই একটু ভেটকে গেল।

শুনে বলল, তাই?

ইয়েস।

তিতির বলল।

## ছয়

বাংলোতে ফিরে আমরা বারান্দাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম। ওয়াশিষ্ট সাহেবও এসে বসলেন আমাদের সঙ্গে। প্রদীপকাকু, তাপসকাকু এবং সঞ্জীবকাকু। দিনে কি রাতে ছবি তোলার বিরাম নেই।

প্রদীপকাকু তাই বললেন, দাদা যখন গল্পটা বলবেন তখন বিরক্ত কোরো না

সঞ্জীব। ছবি তোলার সুযোগ পরেও পাবে। গোটা দশেক রিল তো শেষ করেছ। আর না তুলেও চলবে।

ঠিক আছে। যদিও নিসপিস করবে হাত। তবু, তুমি যখন বলছ তখন চুপ করেই বসে থাকব।

ভটকাই বলল, আমি কিচেনে ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে আসছি দশ সেকেন্ডে। আমি ফেরার আগে আরম্ভ কোরো না কিন্তু।

ঠিক আছে। আয়।

তারপরে ঋজুদা বলল, ট্রিগার টানলাম, হয় গুলি লাগল নয় লাগল না, এই তো শতকরা নব্বইভাগ শিকারের গল্প। কিন্তু গুলি লাগল কিন্তু বেজায়গাতে লাগল যখন, তখনই শিকার বিপজ্জনক। এবং বিপজ্জনক বলেই সেখানে গল্প জমে।

ভটকাই ফিরে আসতেই ঋজুদা শুরু করল।

গরমের দিন। এপ্রিলের প্রথম অথচ তখনও যা গরম তা বলার নয়। লু চলতে শুরু করেছে। আমরা উঠেছিলাম কোলসার বাংলোতে। তবে ঘটনা যা ঘটার তা ওই তাড়োবাতেই ঘটেছিল। কাল বিকেলে যেখানে মস্ত মাঠটাতে, মানে তৃণভূমিতে আমরা হাজার হাজার চিতল হরিণ দেখলাম সেইখানেই ছিল মস্ত একটি গ্রাম। গোঁন্দদের গ্রাম। আমরা আসার একমাস আগে প্রথম মানুষ মারে বাঘটা অন্য গ্রামে। পরে আরও দুটি। তারপরে আমরা পৌঁছবার দিন পনেরো আগে আরও একটি মানুষ মারে।

জেঠুমনি আমাকে নিয়ে গ্রামে এসে গাঁওবুড়োদের সঙ্গে কথা বলল। বুড়ো বলল, সব সাহায্য দেবে। বাঘটা মেরে দিলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবে ওরা। প্রথমে ওই গাঁওবুড়োর নাতিকেই ধরেছিল বাঘটা। বাঘের প্রথম কিল। ধরে, বাঁশবনের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রায় সবটুকুই খেয়ে ফেলে কোমর আর ডান পায়ের কিছুটা ফেলে চলে রেখে গেছিল। Kill বা মড়িতে আর ফিরে আসেনি। ছেলেটা গোরু চরাবার জন্যে গেছিল গ্রামের লাগোয়া বনে। সকালবেলাই বাঘটা তাকে ধরাতে কেউ জানতেও পারেনি। দুপুরে তার জন্যে ছোট ভাই খাবার নিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে আসার পরে গ্রামে খোঁজ পড়ে এবং তারপর খোঁজাখুঁজির পরে বিকেলে তার দেহাবশেষ নিয়ে এসে দাহ করা ওরা। তারপর থেকে বাঘের আর খোঁজ নেই।

তবে পায়ের দাগ দেখেছিল গাঁয়ের লোকেরা। গরমের দিন, মাটির ওপরে ধুলোর আস্তরণ ছিল তাই পায়ের ছাপ দেখতে অসুবিধে হয়নি ওদের। ওরা বলল, খুব বড় বাঘ, হয়তো বুড়োও হবে, মদ্দা বাঘ, ওরা এও বলল যে এই জঙ্গলের বাঘেদের পায়ের ছাপ ওরা চেনে। এ বাঘের পায়ের ছাপ আগে ওরা নাকি কখনও দেখেনি।

জেঠুমনি সে কথা শুনে আমাকে বললেন হতেই পারে না। এক বাঘের এলাকার মধ্যে অন্য বাঘ চলে এল বিনা লড়াইয়ে তা তো হয় না।

ওদের কোথাও ভুল হচ্ছে।

প্রদীপকাকু বললেন, ফেরোমন স্প্রে করে বাঘেরা তাদের সীমানা চিহ্নিত করে রাখে। অন্যের সীমানার মধ্যে বড় বাঘ ঢুকে পড়ল আর বিনাযুদ্ধে সেখানে রয়ে গেল এমন তো সত্যিই হবার কথা নয়।

ঠিক।

বলল, ঋজুদা।

তারপর বলল, গোরু না চরাতে গিয়ে যদি মোষ চরাতে যেত তাহলে বাঘ অত সহজে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারত না। মোষেরা বাধা দিতই আর জঙ্গুলে এলাকার গৃহপালিত মোষেরাও বুনো মোষেরই মতো শক্তিধর। তারা বাঘকে অত সহজে কাজ হাসিল করতে দিত না।

একটা অর্জুন গাছের নীচে আমরা একটা গোরু বেঁধে বসব ঠিক হল। গ্রামের লোকেরা বলল, জঙ্গলের এই অঞ্চলেই সেই বাঘের পায়ের ছাপ বেশি দেখা গেছে গত কদিনে। গত এক মাসে চারটি গোরুও মেরেছে বাঘে। ছোট গোরু মারে বা বাছুর। সামান্য দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটুখানি খায় কিন্তু মাচা বেঁধে বসলে মড়িতে ফিরে আসে না। অথচ যতখানি খায় ততখানি একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের খাদ্যের তুলনায় খুবই কম। হয়তো বাঘটার দাঁতে কোনও গোলমাল আছে অথবা মুখে। বাঘটার গায়ে শক্তি কম অথবা তার খিদে কম। তা নয়তো বাঘটার লিভার ফাংশান ভাল না। জেঠুমনি সাব্যস্ত করলেন। অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক বাঘটা স্বাভাবিক নয়। আর স্বাভাবিক হলে সে মানুষই বা মারবে কেন? মানুষ তো বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়।

নাগপুর থেকে জিপে কোলসাতে আসার সময়েই জেঠুমনির লু লেগে গেছিল। তখন কোনও গাড়িই এয়ারকন্ডিশানড ছিল না। খাওয়ার জলও ঠান্ডা পাওয়া যেত না। একমাত্র সম্ভব ছিল আইসবক্সে করে আনলে। সেও মহা ঝক্কির ছিল। ভিস্তিওয়ালারা যে চামড়ার ছাগলে করে জল দেয়, এখনও দেখতে পাবি কলকাতার যেসব অঞ্চলে জলাভাব আছে ভিস্তিওয়ালারা ভিস্তিতে করে জল দিচ্ছে, সেই ছাগলে জল ভরে জিপের বনেটের সামনে শক্ত করে দড়ি বেঁধে নিয়ে তখন গরমের মধ্যে পথ চলতে হত। তাহলে চলন্ত গাড়ির কারণে জলে ভেজা ভিস্তিতে হাওয়া লাগায় ভিস্তির জল ঠান্ডা থাকত। ওই জল খেতে খেতে এগোতে হত পথে। আমরাও তেমন করেই এসেছিলাম। কিন্তু লু বইছিল পুরো পথে। আমরা ভোরে রওয়ানা হয়েও দুপুরে একটার আগে পৌঁছতে পারলাম না কোলসাতে। পথেই জেঠুমনির লু লেগে গেছিল। তখন রাস্তাঘাটও এত ভাল ছিল না। অনেকখানি পথই কাঁচাও ছিল জঙ্গলের বাইরেও।

কোলসা পৌঁছে বিকেলেই আমরা তাড়োবার ওই গ্রামে এসে সব বন্দোবস্ত করলাম। মাচাও বাঁধানো হল অর্জুন গাছটাতে। গাছটা আমার পছন্দ হল না কিন্তু ওই গাছটাতে বসেই পথের দুদিক এবং জঙ্গলের গভীরেও অনেকখানি দেখা

যাবে। পাহাড়ি জায়গা হলে জুতসই উঁচু পাথরে বসা যেত কিন্তু তোমরা তো দেখলেই তাড়োবার টাইগার রিজার্ভ এর এলাকা প্রায় সমতলই। এখানে গাছে বসা ছাড়া উপায় নেই।

জেঠুমনি বলে গেলেন আমরা কাল এসে বসব। আমার লু লেগে গেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু বাঘ রাতে যদি কোনও গোরু বা মানুষ ধরে তবে সকালেই খবর পাঠাবে কোলসাতে। আমরাও আসব। যদি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে এই বাবু আসবে।

আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। সবে গোঁফ গজিয়েছে। আমার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বুড়ো বলল, এ খোকাবাবু কি পারবে?

জেঠুমনি বিরাট এক ধমক দিয়ে আমার প্রতি তার সব অভক্তি গায়ের জোরেই মেরে দিলেন। বলল, সে চিন্তা তোমার নয়, আমি বুঝব।

রাতে জেঠুমনির জ্বর বাড়ল। ভুল বকতে লাগলেন। ফরেস্টার সাহেবকে বললাম, সকালেই ডাক্তারের বন্দোবস্ত করতে হবে। তিনি বললেন ডাক্তার তো আনতে হবে চন্দ্রপুর থেকে। এখান থেকে প্রায় তিরিশ মাইল। তখন তো মাইল ছিল।

জেঠুমনি জ্বরের মধ্যেই বলতে লাগলেন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাব আমি। আমার জন্যে চিন্তা নেই। তারপর বললেন, সকালে উঠেই ভরপেট খেয়ে জলের বোতলে জল, পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আর রাইফেল নিয়ে তুই জিপ নিয়ে চলে যা। কানিটকার সাহেব যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন না করতে পারলে মুখ থাকবে না। জিপটা তোর কাছেই রাখবি। ড্রাইভারকে গোঁন্দদের কারও ঘরে রাতে শোওয়ার বন্দোবস্ত করবি যদি রাতে ফিরতে না পারিস। তোর উপরে আমার ভরসা আছে। আমি অযথা চিন্তা করব না।

বললাম, কোন রাইফেল নিয়ে যাব জেঠুমনি?

আমার ফোর ফিফটি ফোর-হান্ড্রেডটা নিয়ে যা। মানুষখেকো বাঘ বলে কথা। হালকা রাইফেল নিয়ে কাজ নেই। আর আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে যাবি কাল যখন বেরবি।

কী জেঠুমনি? কীসের প্রতিজ্ঞা?

প্রতিজ্ঞা করে যাবি যে বাহাদুরি করবি না, রাতে বাঘকে মাচা থেকে গুলি করে মাচা থেকে নামবি না। বাঘ যদি আহত হয়, না মরে তবে তাকে ব্লিড করার সময় দিবি। প্রয়োজনে সারা রাত, যাতে সে দুর্বল হয়ে যায় তোর সঙ্গে মোকাবিলা করার সময়ে। এই হল বাঘ শিকারের নিয়ম।

তারপর বললেন, ওড়িশাতে বাঘকে কী বলে ডাকে শুনিসনি? মহাবল। সে হচ্ছে মহাবলী জানোয়ার। এখানে আমিই তোর বাবা-মা। তোকে নিজে হাতে যমের মুখে পাঠালে অনুতাপে আমি আর বাঁচব না। তবে তুই আমার চেলা, ভয় করবি না কিছুকেই। আমি জানি, তুই একাই পারবি। আমার চেলাগিরি তো

কমদিন করলি না।

তিতির বলল, সত্যি। এমন বাঙালি গার্জেনের কথা ভাবা যায় না।

ভটকাই বলল, "সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।"

প্রদীপকাকু বললেন, একসেপশন প্রুভস দ্য রুল।

সঞ্জীবকাকু বললেন, তোমরা মধ্যে কথা বলে ঋজুদার কনসেনট্রেশান নষ্ট করে দিও না।

তা ঠিক।

তাপসকাকু বললেন, বাঘ মারতে যেমন কনসেনট্রেশান লাগে, বাঘ মারার গল্প বলতেও লাগে।

সঞ্জীবকাকু বললেন, বিশেষ করে মানুষখেকো বাঘ মারার গল্প।

তারপর?

প্রদীপকাকু বললেন।

ঋজুদা বলল, সেই রাত যে কী করে কাটল! বাঘ মারতে যাব কী, মাঝে মাঝেই মনে হতে লাগল, জেঠুমনি বোধহয় এই রাতেই দেহ রাখবেন। কী যে করি! বারবার চিনি নুনের শরবত আর গ্লুকোজের জল খাইয়ে খাইয়ে শেষ রাতের দিকে ঘুমোলেন জেঠুমনি। আমিও ঘুমোলাম ওঁরই সঙ্গে।

তারপর?

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি জেঠুমনি বাংলোর বারান্দার যেদিকটাতে রোদ পড়েনি সেদিকে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। আমি উঠতেই বললেন, তোর জন্যে নাস্তা বানাতে বলেছি। একবারে পেট ভরে খেয়ে যা। পরে গ্রামে কিছু পেলি তো খেলি, যদি ওরা খেতে দেয়। টুপি তো নিয়ে যাবিই, একটা গামছাও নিয়ে যা। মাঝে মাঝেই ভিজিয়ে মাথায় দিয়ে তার উপরে টুপিটা চাপাবি। ছটা গুলি নিয়ে যা। দুটো দু ব্যারেলে রাখবি আর চারটে বুশ-কোটের ডান পকেটে রাখবি। পকেটের বোতাম খুলে রাখবি যাতে প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি গুলি বের করতে পারিস। জঙ্গলে যতক্ষণ থাকবি ব্যারেলে গুলি রাখবি। সেফ করে নিয়ে মাঝে মাঝেই সেফটি ক্যাচে আঙুল ছুঁইয়ে দেখবি ক্যাচটা ঠিক আছে কি না।

## সাত

গরমের সময়ে তরিতরকারি তো কিছু পাওয়া যায় না, রুটি আর আলুর চোকা খেলাম, কাঁচা পেঁয়াজ আর লঙ্কার সঙ্গে। জেঠুমনি চারটে আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ রাখতে দিলেন বুশ কোটের বাঁ পকেটে। বললেন, খিদে পেলে পেঁয়াজ খাবি। না খেলেও পকেটে থাকলে লু থেকে বাঁচবি। নাগপুর থেকে আসার সময় ভুলে

গেছিলাম আমি। রাখলে আর পেঁয়াজ খেলে লু লাগত না।

তারপর বললেন, বয়স যে হচ্ছে এবার বুঝতে পারছি রে ঋজু। 'তোমার হল শুরু আমার হল সারা।'

আমি তৈরি হয়ে জেঠুমনিকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। জেঠুমনি রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় হাত নাড়লেন।

বললাম, সারাদিন পান্তাভাত খেয়ে ঘুমোও।

ঠিক আছে। বললেন জেঠুমনি।

জিপটা কোলসার বাংলোর হাতার বাইরে বেরোতেই আমি বললাম ড্রাইভারকে, সঙ্গে ফরেস্টার বাবুও ছিলেন, যে আমাকে ও গ্রামে নামিয়ে সোজা মোহার্লি হয়ে চন্দ্রপুর চলে যেতে। সবচেয়ে ভাল ডাক্তারকে সঙ্গে করে কোলসাতে এনে জেঠুমনিকে দেখিয়ে ডাক্তারবাবুকে আবার চন্দ্রপুরে পৌঁছে দিয়ে তারপর আমার কাছে আসতে। তারপরই ঠিক করব রাতে মাচাতে বসব না কোলসাতে ফিরে আসব।

ভাবছিলাম, কানিটকার সাহেব কে আমি জানি না। আমার কাছে জেঠুমনিই সব। বাঘ মারা যাক আর নাই যাক জেঠুমনির শরীরের খোঁজটা আগে রাখতে হবে।

ফরেস্টার বাবু বললেন, টাকা? বড় ডাক্তার এত দূরে এলে তো অনেক টাকা চাইবেন।

টাকা ইজ নো প্রবলেম। বাইরে বেরিয়ে আমিই হলাম জেঠুমনির ক্যাশিয়ার। নিজের হাতে টাকার মতো নোংরা জিনিস ছোঁওয়া জেঠুমনি পছন্দ করতেন না। আমি পার্স খুলে একটি হাজার টাকার নোট বের করে দিলাম।

ফরেস্টার বাবুকে বললাম, ডাক্তারবাবুকে রোগের বর্ণনা দিয়ে সম্ভাব্য সব ওষুধপত্রও সঙ্গে নিয়ে আসতে বলবেন। বলবেন লু লেগে গেছে। পথ্যও যা বলবেন চন্দ্রপুর থেকে কিনে নেবেন, কিছুরই যেন ঘাটতি না পড়ে।

ফরেস্টারবাবু এবং ড্রাইভারদের মুখ দেখেই বোঝা গেল যে আগে কখনও হাজার টাকার ইয়া বড় নোট দেখেননি ও দেখেনি। তখনকার দিনে টাকার মূল্য ছিল অনেক। দশ টাকার বাজার করলে থলে ভরে যেত। আর একশো টাকায় তো কত কিছুই করা যেত। তখন পাঁচশো টাকার নোট ছিল না তাই হাজারের নোট দিলাম। কত বড় ডাক্তারবাবু জানি না। তাঁর সারা দিনের পসার নষ্ট তার উপর ওই খারাপ জায়গায় লু-বওয়া দিনে অতখানি পথ আসা-যাওয়া।

জিপ আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলে একটি নিমগাছের নীচে চৌপাইতে বসে কালকে আমার চলে যাবার পরের খবরাখবর নিলাম। কোনও খবর নেই। তবে মাচাটা আমার যেখানে বেঁধেছিলাম এবং গোরুও যার সামনে বাঁধা ছিল, বাঘ তার খুব কাছ দিয়ে এবং বড় রাস্তার উপর দিয়েই দু'দুবার হেঁটে গেছে। গোরুটাকে ছোঁয়নি। আমার মনে হল গোরু না বেঁধে একটা বাছুর বাঁধলে হত। গাঁওবুড়ো আমাকে একটি যুবককে সঙ্গে দিলেন। তার নাম ঢাকিল। তার হাতে একটি মস্ত

টাঙ্গি। এই গ্রামে কারওর কাছেই কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। এমনকী গাদা বন্দুকও নেই। বনবিভাগের ভয়ে বে-আইনি কাজ করে না কেউই কিন্তু এখন যে প্রাণ বিপন্ন। এখন বনবিভাগ তাদের বাঁচাবার জন্যে কী করছে? না একটা সদ্য গোঁফ-ওঠা ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে বড় এবং বুড়ো বাঘের সঙ্গে ইয়ার্কি মারার জন্যে। এই রকম কিছু বলাবলি করছিল ওরা নিজেদের মধ্যে। নইলে অত দুঃখের মধ্যেও এ ওর গায়ে হেসে গলে পড়ছিল কেন ওরা। বিশেষ করে মেয়েরা।

রাগে অপমানে আমার দু কান লাল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, মাচার দিকে যাব। সঙ্গে ঢাকিল আর একজন মারাঠি ফরেস্ট গার্ড। তার নাম তেন্ডুলকার। সে মিনিটে মিনিটে পকেট থেকে বের করে লম্বা চুট্টা ধরায় আর শেষ হয়ে এলে সাবধানে মাটিতে ফেলে পায়ের জুতো দিয়ে নিভিয়ে দেয় যাতে আগুন না লেগে যায় বনে।

তুমি কি তখন পাইপ খেতে?

আমি বললাম।

পাগল! পাইপ খেতে শুরু করি গ্র্যাজুয়েশনের পরে। তখন তো ক্লাস নাইনে পড়ি।

বলেই বলল, যাক ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিস। গলাটা শুকিয়ে এসেছে। একটু পাইপ খেয়ে নিই। এক ফিল।

বলেই, ভটকাইকে বলল, কীরে! ফিঙ্গার চিপস আর কফি-টফির গল্প তো খুব শোনালি। কিন্তু এল কই?

টাইম ইজ নট রাইপ ইয়েট।

বলল ভটকাই। এক্কোবারে সাহেবি কেতায়।

আমি আর তিতির মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

তারপর ঋজুদাকে বলল, ঋজুদা যেন ওর ইয়ার, তোমার গল্প তো এখনও শিশু। সে যুবক হোক তখন আসবে। সব ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে। ঘাবড়িও না।

সমবেত জনমণ্ডলী ভটকাইকে যতই দেখছেন ততই তার বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। আমি আর তিতির কোনও ফ্যাকটরই নই। ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

তিতির মনটা অন্যদিকে করার জন্যে বলল, বলো ঋজুকাকা, পাইপটা একটু খেয়ে।

হ্যাঁ বলি।

আমরা তিনজনে আধ কিলোমিটার, তখন মাইল ছিল, আধ মাইল হেঁটে সেই অর্জুন গাছটার কাছে পৌঁছে দেখি গোরুটা তাকে রাতে যে ঘাস পাতা-টাতা খেতে দেওয়া হয়েছিল তা খেয়ে শেষ করে শুয়ে আছে। তার পিপাসাও নিশ্চয়ই পেয়েছে খুবই। ঢাকিল ভাল হিন্দি বলতেও পারে না, বুঝতেও পারে না।

তেন্ডুলকারকে বললাম যে গোরুটাকে খুলে ঢাকিল যেন গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসে। তাকে দানা ও পানি খাইয়ে বিশ্রাম দিতে বললাম। বিকেলে এ জায়গাতেই তাকে আবার বাঁধা হতে পারে। ঢাকিল গোরুটাকে, গোরু তো নয় বলদ, নিয়ে গেল, ফিকে লাল রঙা বলদটা, এদের শিং বাংলার গোরুর মতো নয়।

ঢাকিলকে বলতে বললাম যে বলদটাকে পৌঁছে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আমাদের কাছে ফিরে আসে।

ওই গাছটার কাছে পথের ধুলোর উপরে বাঘটার পায়ের দাগ দেখলাম। সত্যিই বিরাট বাঘ। মদ্দা। তার পায়ের ছাপ দেখে তার পায়ে, কোনও পায়েই যে কোনও খুঁত আছে তা আমার মনে হল না। অবশ্য তখন আমার অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু। জেঠুমনির কাছে শিক্ষানবিশি করে যতটুকু শেখা। তবে শিকার শুরু করার আগে থেকেই সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ও লেকে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল নিয়ে শ্যাডো প্র্যাকটিস করে পরে রাইফেল ছোড়া শিখেছিলাম। ক্লাস সিক্স-এ পড়ার সময় থেকেই জেঠুমনির সঙ্গে পাখি শিকারে যেতাম। সে সব অনেক কুকীর্তি। এখন ভাবলে বড় পাপবোধ করি। জেঠুমনির মুখের বুলিই ছিল 'মার! মার!' সে পাখিই হোক, কী বড় প্রাণী! শিকার করতেই শিখেছিলাম, যে বয়সে পশুপাখি চেনা দরকার, একা একা বনে-বাদায় ঘুরে সত্যিকারের ভাল শিকারি হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল, তা না হয়ে জেঠুমনির শিকারের যাত্রাদলের সভ্য হয়েছিলাম। জেঠুমনির শিকারে খাওয়া-দাওয়া হল্লাগুল্লা যে পরিমাণ হত সে পরিমাণ শিকার হত না। শিকারও এক সাধনার ব্যাপার। সেই সাধনাও একক নির্জনের সাধনা। দলে বলে যাত্রাপার্টিতে তা হয় না। তবুও শিখেছিলাম কিছু। ভাল ভাল শিকারি বন্ধু-বান্ধব ছিলেন অনেক জেঠুমনির। তাঁরাও যেতেন আমাদের সঙ্গে। তাঁদের কাছেও অনেক শিখেছিলাম।

যাই হোক, আমরা বাঘের পায়ের দাগ অনুসরণ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে তার পায়ের দাগ ডানদিকের গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

আধ মাইল যদিও জঙ্গলের মানুষের কাছে কোনও দূরত্বই নয়, তবু ঢাকিল ওই মানুষখেকোর জঙ্গলে একা একা ফিরে আসবে বলেই জঙ্গলের গভীরে না ঢুকে একটা বড় মহুয়া গাছের নীচে আমি আর তেন্ডুলকার ওর ফেরার অপেক্ষাতে বসে রইলাম।

বাঘ শিকারে বিশেষ করে মানুষখেকো বাঘ শিকারে ধৈর্য ও ঈশ্বরের দয়া ছাড়া কিছুই ঘটে না। কালকে মারেনি বলে বলদটাকে আজও ধরতে আসবে না এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। মিনিট পনেরো কুড়ি অপেক্ষা করার পর সোজা রাস্তাতে অনেক দূরে ঢাকিলকে আসতে দেখে আমরা বাঘ যেখানে ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকেছে সেখানে এসে দাঁড়ালাম। বাঘ বোধ হয় ঘন বাঁশের জঙ্গলের ছায়াতে বিশ্রাম করবে বলেই ওখানে ঢুকেছিল। রাতে সেও ঘুমোয়নি। আমিও ঘুমোইনি রাত চারটে অবধি।

ঢাকিল প্রায় পৌঁছে গেছে আমাদের কাছে এমন সময়ে জঙ্গলের বাঁদিকের থেকে হঠাৎই একসঙ্গে নানা পাখির উত্তেজিত ডাক, ইংরাজিতে যাকে বলে 'ক্যাকোফনি' তাই শোনা গেল। আমি ওদের দুজনকে মহুয়া গাছটাতে চড়ে পড়তে বলে সেই আওয়াজ যেখান থেকে হল সেদিকে রাইফেলটাকে রেডি পজিশনে ধরে সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। জঙ্গলে ঢোকামাত্র চোখে পড়ল যে এখানে কটি আমগাছ আছে একসঙ্গে। অথচ আব্দারী-তাড়োবাতে আম নেই বললেই চলে। আমের গাছে আম এসেছে। কাঁচা আম। জংলি আম সকালে ভাল্লুক আর শম্বরেরা হয়তো খেতে আসবে কিন্তু কাঁচা আমে তাদের বিশেষ রুচি নেই। পনেরো কুড়ি পা যেতেই আমার কেমন গা-ছমছম করতে লাগল। একটা ভয়ের আর বিপদের অনামা অনুভূতি। বাঘের তো ডানদিকের জঙ্গলে যাবার কথা। এদিকে ভয়ের কী?

শ' খানেক গজ এগোতেই একটা হুপী পাখি হুপী হুপী হুপী করতে করতে তীব্র বেগে প্রায় আমার নাকমুখ থিমচে দিয়ে বনের ভিতর থেকে উড়ে বাইরে চলে গেল। ময়ুর ডাকতে লাগল কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া করে। আরও দু পা গিয়েই আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার গা গুলিয়ে উঠল, মাথা ঘুরে গেল। আমার বয়সি একটি গোঁন্দ মেয়ে সম্পূর্ণ নিরাবরণা, আমার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে আর তার মাথার কাছে তার শতচ্ছিন্ন রক্তমাখা শাড়িটা ফালাফালা হয়ে পড়ে আছে।

দেখলাম মেয়েটির অনেক অংশই বাঘে খেয়ে নিয়েছে, সেখানে দগদগে বিরাট বিরাট ক্ষত। ডান কাঁধের কাছ থেকেও খেয়েছে কিছুটা। রাইফেলের সেফটি-ক্যাচটা ঠেলে আনসেফ করে আমি রাইফেল শুটিং পজিশানে ধরে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘাড় না ঘুরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে দুদিকে দেখলাম। শিকারি মাত্রকেই ছেলেবেলা থেকে একশো আশি ডিগ্রি vision-এ অভ্যস্ত হতে হয়। চোখ সোজা রেখেও একশো আশি ডিগ্রি দেখতে না শিখলে পায়ে হেঁটে শিকার করতে যাওয়া মূর্খামি।

বাঘ, মানুষ এবং সব জানোয়ারকেই পেছন থেকে এবং বাঁদিক থেকে আক্রমণ করে নেহাত বেগতিক না দেখলে। যে-কোনও মুহূর্তে বাঘ আমার ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে। বাঁ পাশ থেকে বা ডান পাশ থেকেও। এক একটি মুহূর্ত কাটছে না যেন ঘণ্টা কাটছে। একবার মনে হল জেঠুমনির কাছে ফিরে গিয়ে, যদি ফিরে যেতে পারি আদৌ, তো গিয়ে বলি, জেঠুমনি, আমার ভয় করছে ভীষণ, আমার দ্বারা মানুষখেকো বাঘ মারা হবে না। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের বুকে অসীম সাহস ফিরে এল।

সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বাঘের কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। বুঝলাম যে বাঘও জানে এই কথাটা যে Discretion is the better part of valour. কারণ বাঘ তার চেহারা একবার দেখালে ফোর-হানড্রেড ফোর ফিফটি রাইফেলের গুলি তাকে নড়তে দিত না, তার উপরে বাঁদিকের ব্যারেলও ফায়ার

করতাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আজকে বাঘের সঙ্গে আমার dating হল না। দিনের বেলা বলেই হয়তো হল না। বাঘ হয়তো রাতেই dating করতে ভালবাসে।

বাঘ যে তার মুখের স্বাদু খাবার ছেড়ে সরে পড়েছে কোনও দুর্বোধ্য কারণে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ওদের নেমে আসতে বললাম গাছ থেকে।

খাবে বলে মানুষ মেরে তাকে ফেলে রেখে বাঘ চলে যে যায় না তা নয়, অনেক মানুষের সম্মিলিত চিৎকারে, আওয়াজে বন্দুকের গুলির শব্দে সে অসীম বিরক্তিতে মুখের খাবার ফেলে রেখে সরে যায় কিন্তু এমনই নিঃশব্দে সে একজন নিঃশব্দ এবং আনাড়ি শিকারির আগমনে যে চলে গেল এটা বড় অবাক করল। এমন ঘটনা বড় বড় শিকারিদের অভিজ্ঞতাতেও বেশি ঘটেছে বলে জানি না।

ওরা এলে আমি জেঠুমনির দেওয়া গামছাটা, যেটা টুপির নীচে জলে ভিজিয়ে পরেছিলাম, খুলে দিলাম। মেয়েটির শাড়িটার আর কিছু ছিল না। সেই গামছা দিয়ে কোনওক্রমে মেয়েটিকে জড়িয়ে নিল ঢাকিল। তার ঘাড় ভেঙে গেছিল এবং ঘাড়ের কাছে বাঘের ক্যানাইন দাঁতের দুটো গভীর দাগ ফুটে ছিল। রক্ত ঝরছিল তা থেকে অবিরাম। ঢাকিল তার পরনের হাফ হাতা নীলরঙা জামাটাও খুলে পরিয়ে দিল মেয়েটিকে।

ঘটনাটা সম্ভবত ঘটেছিল এরকম। পরে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই রকম ধারণাতেই আসি। মেয়েটি আম পাড়তে এসেছিল। এই গরমে আম-বাটা চাটনি বা আমপোড়া শরবত খেত হয়তো। মানুষখেকো বাঘের জন্যেই এসব অঞ্চলে আজকাল ফরেস্ট গার্ডরাও আসে না। এই সুযোগে সে আম পাড়তে এসেছিল। মেয়েটির কাছে ফরেস্ট গার্ড যতখানি ভয়াবহ মানুষখেকো বাঘ তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ ছিল না। তাই সে সাহস করে ওই সুযোগটি নিয়ে এসেছিল। ও যখন আমগাছের দিকে যাবে এমন সময় দূর থেকে উর্দিপরা তেন্ডুলকারকে সে সম্ভবত দেখে ফেলে। দেখে ফেলে, খুব তাড়াতাড়ি জঙ্গলের গভীরে আমগাছ তলাতেই লুকাবে বলে জঙ্গলের ভিতরে এগিয়ে যায়। এদিকে ডানদিকের জঙ্গলের থেকে বেরিয়ে বাঘ রাস্তা ধরে আমাদের পেছনে পেছনে সামান্য এসেই রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে আমাদের বাঁদিক দিয়ে পেছন পেছন আসতে থাকে। সে যে রাস্তা পার হয়েছে আমরা এগিয়ে আসার পরে আমাদের পিছন দিয়ে, তা আমরা বুঝতেও পারিনি। তার পায়ের দাগ পরে দেখতে পাই।

এমন সময় আমগাছের নীচে সে মেয়েটিকে দেখে অথবা হয়তো মেয়েটিকে আমাদের আগে আগে যেতে দেখেই তার পিছনে পিছনে তাকেই অনুসরণ করে সে যায়, আমাদের নয়। মেয়েটি চিৎকার করতে পারেনি। ফরেস্ট গার্ড তার চিৎকার শুনলেও তার বিপদ হত। বাঘ শুনলেও তাই।

এত সব তত্ত্ব আমরা পরে গাঁওবুড়ো এবং আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ মানুষকে সঙ্গে করে অকুস্থলে ফিরে এসে, মেয়েটির পায়ের দাগ, বাঘের পায়ের দাগ এসব

দেখে সকলে অনুমান করি। ওদের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেকেই বেশি। মৃত্যুই হাতছানি দিয়ে ওকে আমগাছগুলোর কাছে নিয়ে যায়।

এবারে কফি এসে গেছে ঋজুদা।

ভটকাই অ্যানাউন্স করল।

ফাইন।

বলল, ঋজুদা।

চা খাবেন কি কেউ?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

তিতির হাত তুলল। প্রদীপকাকুও। আমিও বললাম চা-ই খাব।

ফিঙ্গার চিপসগুলো দারুণ হয়েছে। ক্রিসপ। কিন্তু গল্পটা তার চেয়েও দারুণ। তাপসকাকু বললেন।

প্রদীপকাকু বললেন, তারপরে বলুন দাদা। কেউ কথা বোলো না। উনি ডিসট্র্যাকটেড হয়ে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ। ঋজুদা বলল, সচরাচর হিউম্যান কিল যদি ম্যানইটার করে, তবে সেই কিল-এর ওপরেই শিকারির বসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পক্ষে ওই সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে দেখার পরে আমারই সামনে বাঘ তাকে টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে এই ভাবনাই বরদাস্ত হচ্ছিল না। তা ছাড়া, মেয়েটির স্বামী ও মা-বাবা তার সৎকারের জন্যেও অধীর ছিল। অপঘাতে মৃত্যু হলে তো পোড়ায় না, ওকে কবর দেওয়া হল গ্রামের কবরভূমিতে। আমার মনে একটু সুখ হল মেয়েটির শেষতম পরিণতিটা বাঘের দাঁতে হল না বলে। আমি ভাবছিলাম, অত বড় বাঘটা যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কেমন করে অদৃশ্য হয়ে গেল? তার আওয়াজ পর্যন্ত আমি পেলাম না। ভোজবাজির মতো।

এই হল বাঘ। বাঘকে যারা ভাল করে জেনেছেন শুধু তাঁরাই জানেন বাঘ কী!

গ্রামের লোকেরা ইতিমধ্যেই আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করতে শুরু করেছিল। তারা বলেছে, দিনের বেলায় হাতে রাইফেলধারী শিকারির নাকের ডগা থেকেই যখন বাঘ মেয়েটিকে ধরে ফেলে মেরে ফেলল, আর একটু হলে পুরোপুরি খেয়েও ফেলত, সেই শিকারি রাতের বেলা এ বাঘ মারতে পারবে তার স্থিরতা কী? এদিকে এ নিয়ে অতজন মানুষ মরল বাঘের হাতে। এই সদ্য গোঁফ গজানো শিকারিকে চলে যেতে বলে কোনও পাকা শিকারিকে আনা হোক। এখনই।

তাদের ভাবনা ও দাবি যে অনায্য এমনও বলতে পারি না। আদৌ পারি না। বাঘের সঙ্গে যোগাযোগ কেন যে হল না তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তবে এটুকু বুঝেছিলাম যে অকুস্থলে আমি গিয়ে পৌঁছানোর আগেই বাঘ সরে পড়েছিল।

আমি পড়লাম ভারী বিপদে। পরামর্শ করার মতোও কেউ নেই।

ওরা দুপুরে আমাকে ভাত-তরকারি খেতে দিয়েছিল। আমি খেলাম না। খুব

করে জল আর একটা পেঁয়াজ খেয়ে একটি বড় সেগুন গাছের নীচে ঘুমাবার চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে বুদ্ধিটা খোলে এবং গত রাতের ক্লান্তিটাও যায় সেই জন্যে। কিন্তু এই গরমে ঘুম কিছুতেই এল না। বাইরের গরমের মতো মাথাও গরম ছিল খুবই।

বিকেলে লোটাতে ফোটানো দুধসর্বস্ব চা খেলাম। চা তৈরি হয়েছিল তেন্ডুলকারের নির্দেশে। তারপর বলদটার দড়ি ধরে আমরা এগোলাম সেই অর্জুন গাছটার দিকে। বাঘ সারাদিন এবং গত রাতেও কিছু খায়নি। কপাল ভাল থাকলে সে হয়তো বলদটাকে আজ মেরে খাবার জন্যে আসতে পারে। সে প্রায় অভুক্তই আছে। বাঁধা খাবারের লোভ না ছাড়তেও পারে।

বাঘ খুব একটা দূরেও নেই। সকালে সে যখন এতটাই কাছে ছিল, এই লু-বওয়া দুপুরে সে নিশ্চয়ই খুব দূরে যায়নি। কোনও জলা বা ভেজা জায়গাতে কোনও বড় গাছের নীচে বা বাঁশঝাড়ের মধ্যে নিশ্চয় সে দুপুরে শুয়ে ছিল। অর্জুন গাছটা থেকে দুশো গজের মধ্যে বনবিভাগের খোঁড়া একটা পুকুর মতো আছে। সেখানে বাঘের পানীয় জলের সংস্থান হতে পারে। কাঁচা রক্ত-মাংস খাবার পর ওদের পিপাসা পায় খুব। অনেক ভেবেচিন্তে আমার আর কোনও চয়েস না থাকাতেই ওই অর্জুন গাছেই বসব পাঁচটার আগে গিয়ে এমনই ঠিক করেছিলাম। ঢাকিল আমার সঙ্গে মাচাতে বসতে চাইছিল কিন্তু ভাষা একটা বড় সমস্যা। যদিও মানুষখেকো বাঘের অপেক্ষায় বসে-থাকা শিকারির কথা বলা তো দূরস্থান নড়াচড়াও করা বারণ। ইঙ্গিতেই সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে হয়। অনেক বিশ্বস্ত সঙ্গীও গুবলেট করে ফেলে মোক্ষম সময়ে আর এ তো সম্পূর্ণই অপরিচিত আমার। তেন্ডুলকারকে বসতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু হুঁশিয়ার সে বলল, অভয়ারণ্যের মধ্যে বাঘ শিকার, এতে আমি অংশ নিলে পরে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি, সে বাঘ মানুষখেকোই হোক আর যাই হোক। কানিকটার সাহেবের মতো সাহসী তো সবাই নয়। তা ছাড়া কানিটকার সাহেবের সঙ্গে আপনাদেরও বিপদ হতে পারে পরে। এই ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি খতম হলে এক কথা। যতই দেরি হচ্ছে ততই এতে ঝুঁকি বাড়ছে সকলেরই। কারণ বনবিভাগের ওপরতলাতে কানিটকার সাহেবের ওপরেও আরও অনেক সাহেব আছেন।

ব্যাপারটা যে আমি বুঝলাম না, তা নয়। ভাল করেই বুঝলাম, কিন্তু করণীয় কী?

ডাক্তার রাঠোরকে নিয়ে জিপ চন্দ্রপুর চলে গেছিল। শুনলাম জেঠুমনি খুবই রাগ করেছেন আমার ওপরে। ড্রাইভার বলল। জিপটি ফিরল তিনটে নাগাদ। আমি জিপটাকে আটকে রাখলাম। আমার মাথাতে অন্য বুদ্ধি খেলল। ঠিক করলাম রাত এগারোটা অবধি মাচাতে বাঘের জন্যে অপেক্ষা করে তারপর বাকি রাত খুব আস্তে আস্তে জিপ নিয়ে চক্কর দেব পুরো জঙ্গলে। সব কিছুই তো বে-আইনিই হচ্ছে, পুরোটাই বে-আইনি হোক, যদি বাঘটাকে মারা যায়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। বাঘের চোখ চিনে নিতে ভুল হবে না আমার পাঁচ ব্যাটারির বল্ডের টর্চের আলোতে। তা ছাড়া জিপের হেডলাইট তো থাকবেই। আমেরিকান আর্মির ডিসপোজালের জিপ। তার স্টিয়ারিং তিন পাক ফলস।

জিপের ড্রাইভারকে বললাম যে, রাত এগারোটা অবধি যদি মাচার দিক থেকে গুলির শব্দ না শোনো তবে এগারোটাতে তুমি ওই গাছটার কাছে আসবে জিপ চালিয়ে।

মুঝে খা লেগা বাঘ। মাফ কিজিয়েগা হুজৌর।

সে ভয়ার্ত গলাতে বলল। মেয়েটির পরিণতির কথা সে ফেরামাত্র শুনেছিল।

বলল, হামকি চার গো লেড়কি হ্যায় বাবু। এককোভি কি সাদি নেহি হুয়ি। হামকো মারাইয়ে মাৎ।

আমি বললাম, তুম পাগল হো! কুছ নেহি হোগা। তোমার তো জিপ থেকে নামতে হবে না। হেডলাইট জ্বালিয়ে ও এঞ্জিন পুরো স্টার্টে রেখে তুমি জিপের মধ্যেই বসে থাকবে। আমি মাচা থেকে নেমে তোমার জিপে এসে উঠব। আর যদি মাচার দিক থেকে গুলির শব্দ পাও গ্রামে বসে তবে তার আধ ঘণ্টা পরে ওই ভাবেই জিপ নিয়ে আসবে। তোমার কোনওই ভয় নেই। পৃথিবীর কোনও বাঘ স্টার্টে-থাকা আলো জ্বলা জিপ থেকে মানুষ নেয়নি। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

বলদটাকে নিয়ে মাচা অবধি এলাম। পেছন পেছন জিপও এল। আমি আর তেন্ডুলকার হেঁটে গেলাম। আমি রাইফেল হাতে আর তেন্ডুলকার বলদের দড়ি হাতে। বলদটাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। উৎফুল্ল, কারণ সারাদিন সে বিশ্রাম পেয়েছে, খাদ্য-পানীয়ও পেয়েছে। জন্মাবধি এত খাতির সে কখনওই পায়নি। তবে গত রাতে বড় বাঘটা দুবার এসেছিল তখন সে দড়ির শেষ প্রান্তে টান মেরে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু পারেনি। তারপর দু-দুবারই বাঘ তাকে দেখে চলে গেছিল। এসব মাচার নীচে নানা চিহ্ন দেখেই বুঝেছিলাম আমরা।

জলের বোতল, টর্চ এবং রাইফেল এক এক করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে তেন্ডুলকার এবং ঢাকিল জিপে উঠল। আমি মাচায় ওঠার আগেই ওদের বললাম, আমি মাচাতে বসলে তোমরা তিনজনে খুব হল্লাগুল্লা করতে করতে জিপ খুব আস্তে আস্তে চালিয়ে ফিরে যাবে যাতে বাঘ ভাবে যারা এসেছিল তারা সকলেই ফিরে গেল। এরা একজনও ভিতু নয়। বরং আমার চেয়েও অনেকই সাহসী। আমার হাতে তো জেফরির ফোর-ফিফটি ফোর হান্ড্রেড ডবল ব্যারেল রাইফেল আছে। ওরা যে নিরস্ত্র। সাহসের ওদের সত্যিই অভাব নেই। তেন্ডুলকার বলল, ম্যায় জাগতে রহে গা। ড্রাইভারকি সাথ ম্যায় ভি আওয়েগা।

কী আর বলি! বললাম সুক্রিয়া।

কে জানে! বাঘ আমাদের কথোপকথন শুনল কি না? শুনলেও বুঝত না নিশ্চয়ই। জেঠুমনির কাছে শুনেছিলাম যে উত্তরবঙ্গের এক চা বাগানে বাঘ মারার

জন্যে ক্ষেপে-ওঠা এক কলকাত্তাইয়া শিকারি জেঠুমনিকে বলেছিলেন, May I Speak in English? মাচায় বসে কথা বলতে বারণ করাতেই উনি ওই প্রশ্ন করেছিলেন। অর্থাৎ দিশি বাঘ, বিলিতি বুলি কি বুঝবে?

জিপটা এবং সঙ্গে ওরাও চলে গেলে হঠাৎই জঙ্গলটা খুব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমার খুব ভয় করতে লাগল। এক জোড়া কপারস্মিথ ডাকছে। একটা আছে জঙ্গলের ডানদিকে অন্যটা বাঁদিকে। দোসর। সাড়া দিচ্ছে একে অন্যকে। এই জঙ্গলে র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো আছে। তারাও ডাকছে তাদের ধাতব শব্দে। ওই পাখিগুলোই সকালকে পথ দেখিয়ে আনে। আলো ফোটার অনেক আগে থাকতে এদের ঝগড়া ঝগড়া খেলার ধাতব শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এরা জাগার অনেকেই পরে জাগে বনমোরগ এবং ময়ূর, বুলবুলি, নানা ফ্লাই-ক্যাচার, থ্রাশার, হানিসাকার ইত্যাদিরা। এদের ডাক শুনলেই বোঝা যায় ভোর হতে খুব দেরি নেই, আধঘণ্টাটাক পরেই আলো ফুটবে।

চারদিকে চেয়ে দেখলাম অনেকগুলো ভূত গাছ আছে ওখানে। আশ্চর্য! আগে কেন যে লক্ষ করিনি কে জানে! বোতল খুলে ভাল করে জল খেয়ে নিলাম। এখনও বেশ গরম। হাওয়াটা এখন মরে গেছে একেবারে। গরম হোক আর যাই হোক, হাওয়া থাকলে তাও একরকম। হাওয়াহীন দাবদাহ অসহ্য।

বসে বসে নানা কথা ভাবছি। ভাবছি, জেঠুমনি এখন কেমন আছেন? ডাক্তার নাকি বলেছেন যে কালকের মধ্যে ফিট হয়ে যাবেন। হলেই ভাল। ভাবছি, বাঘটা দুপুরে কোথায় কোন দিকে বিশ্রাম নিচ্ছিল। বাঘ জীবনে খুব কমই ডাকে। শিকারের সময়ে সে কখনওই ডেকে তার অবস্থান জানায় না। যখন বাঘিনীর সঙ্গে থাকে বা সঙ্গী খোঁজার আগে বাঘ ডাকে। তখনকার ডাক যারা শুনেছেন শুধু তাঁরাই জানেন। আর বাঘ যখন কখনও কখনও গুলি খেয়ে হুংকার দেয় রাগে, তখনকার ডাকও যাঁরা শুনেছেন তাঁরাও জানেন তাঁর প্রকৃতি। বাঘ কিন্তু অনেক সময় গুলি খেয়েও ডাকে না। এরকম সংযম আর কোনও প্রাণীর আছে কি না জানি না, মানুষের তো নেই-ই। গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলে তো গেলই কিন্তু মারাত্মক আহত হয়েও টুঁ শব্দটি করে না বাঘ পাছে তার অবস্থান জানান দেওয়া হয়। বাঘ এক আশ্চর্য জানোয়ার। অসীম সাহসী, ব্যক্তিত্বময়, ধৈর্যবান এবং সাধক। বড় সাধু-সন্ন্যাসীদেরই মতো তার সাধনা নির্জন এককের। চেলা-চামুন্ডাতে তার বিশ্বাস নেই। সে স্বয়ম্ভর, একাই একশো।

তারপর? থামলে কেন? বলো ঋজুকাকু।

তিতির বলল।

কখন যে দিন চলে গিয়ে রাত এল বোঝা পর্যন্ত গেল না। বুনো হাঁসেরা যেমন করে বালিয়াড়ি ছেড়ে জলে নামে জলে প্রায় কাঁপন না তুলেই তেমনি করে দিন রাতের মধ্যে মিশে যায়। যেন মন্ত্রবলে তারা ফুটে উঠল একে একে। সন্ধ্যাতারা,

কালপুরুষ, শতভিষা, ক্রতু, পুলস্ত, স্বাতী কত নাম জানা ও অজানা তারা। অন্ধকার যতই জাঁকিয়ে বসতে লাগল ততই ভূত গাছগুলো তাদের আধিভৌতিক সাদা চেহারা এবং ডালপালা অনেক সাদা হাতের মতো অন্ধকারে বিস্তার করে একেক জন একেক পোজে দাঁড়িয়ে রইল। তারা কি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? না কি তারা চলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—ট্রেডমিল টেস্ট করার মতো। গাছেরা যুগ যুগ ধরে এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে কত না পথ, পৌঁছে যাচ্ছে কত না দেশে। ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়।

পথের পিছন দিক থেকে একটি ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউয়িঙ্গ টিটিরটা টিটিরটি করে ডাকতে ডাকতে উড়ে আসতে লাগল আমার মাচার দিকে।

বাঘ কি চলতে শুরু করেছে? বাঘ নাও হতে পারে। ওরা বনে-জঙ্গলে কোনও নড়াচড়া দেখলেই ওমনি করে ডাকে এবং চলমান জানোয়ার বা মানুষের মাথার ওপরে উড়তে উড়তে ওদের লম্বা লম্বা পা দোলাতে দোলাতে চলতে থাকে হাওয়াতে ভেসে। ওদের চোখ এড়ানো সবচেয়ে বড় শিকারি বাঘের পক্ষেও সময়ে সময়ে অসম্ভব হয়।

একটা হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল বিকট শব্দ করে উলটোদিকের বন থেকে। অন্ধকারে তার সাদা ডানা মেলে দিয়ে একটি লক্ষ্মী প্যাঁচা উড়ে এসে একটি ভূত গাছে বসতেই ভূত গাছের সাদাতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারাদের নীলাভ আলো ভূত গাছেদের গায়ে হালকা নীলের আভাস ছোঁয়াল। শম্বর ডাকল মোহার্লির দিক থেকে ঘাক্-ঘাক্-ঘাক্ করে। একটা কোটরা হরিণ হঠাৎই ভয় পেয়ে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো ঘাউ ঘাউ ঘাউ করে ডেকে বনের মধ্যে এক আলোড়ন তুলে দিল। তার ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল উলটোদিকের বন থেকে।

রাত আটটা নাগাদ কোনও একটা জানোয়ার, মাংসাশী জানোয়ার এল, মাচার পেছন দিক থেকে। এসে বলদটাকে দেখতে লাগল। সে যে মাংসাশী তা বোঝা গেল বলদটার হাবেভাবেই। সে ভয় পেয়েছে। যেদিকে জন্তুটা আছে তার একেবারে বিপরীতে দড়ির শেষ প্রান্তে খোঁটার সঙ্গে টান দিয়ে চার পা গুটিয়ে বলদটা ধড়ফড় করছে। জানোয়ারটা কোনও চিতা-ফিতাও হতে পারে। আমি উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠিত হয়ে দু উরুর উপরে শোয়ানো রাইফেলের ট্রিগার-গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে বলদটার দিকে চেয়ে বসে আছি। ফিকে লালরঙা বলদটাকে নিকষ কালো অন্ধকারে সাদাই দেখাচ্ছে।

বাঘ এলে, আমায় অন্ধকারেই গুলি করতে হবে। রাইফেলে অন্ধকারে মারা যায় না কারণ রাইফেলে দুটি সাইট থাকে। ব্যাক সাইট ও ফ্রন্ট সাইট। শটগান থাকলে রাতে মারতে সুবিধা হত। শটগানের শুধু মাছি থাকে একটা দু নলের প্রান্তে, মাঝখানে। নিশানা না নিয়েও শটগানে মারা যায়। তবে আমি তখনও তত পোক্ত হইনি। তা ছাড়া শটগান তো আছে জেঠুমনির কাছে। বাঘ যদি বলদটাকে

ধরতে আসে তবে গুলি খেয়ে বাঘ মারাত্মক জখম হবে, তারপর সেই আহত বাঘকে মারতে হবে। অত শত ভাববার সময় নেই এখন আর। আজ রাতের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

বলদটা আবার স্বাভাবিক হল। বুঝলাম যে আগন্তুক এসেছিল ফিরে গেল, সে কে এবং কোথায় গেল সেই হচ্ছে কথা।

রাত কত তা কে জানে। আমার ঘড়ির ডায়ালে রেডিয়াম নেই। টর্চও জ্বালা যাবে না। অতএব কত রাত তা জানা গেল না। ভারী ঘুম পাচ্ছে। কাল রাত চারটে অবধি জেগে আজও দুপুরে ঘুম হয়নি। ঘুমে চোখের পাতা বুজে এসেছিল। হঠাৎই একটা অস্বস্তি হওয়াতে চোখ খুলে দেখি সকালের কালো গোঁন্দ মেয়েটি মাচার সামনে, বলদটার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে খুব হাসছে। কিন্তু তার রং ছিল ঘোর কালো, চুলে একটা লাল রিবন ছিল। এখন তার সর্বাঙ্গ সাদা, তার মাথার চুলও সাদা। সে দুটি হাত দুদিকে ছড়িয়ে যেমন করে মাটিতে শুয়েছিল যেমন করে শূন্যে ভাসতে ভাসতে একটা ভূত গাছে গিয়ে বাঁদিকের ডালে বসল যেন। কিন্তু তারপরেই তাকে আর দেখা গেল না। ভূত গাছের উজ্জ্বল সাদা রং তাকে গ্রাস করে ফেলল। আর তার আলাদা কোনও অস্তিত্ব রইল না।

আমার ঘুম-টুম সব উবে গেল। সে মিলিয়ে যেতে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

আবারও কি ঘুম বা ঘোর এসেছিল? বলতে পারব না, ঘোর ভাঙল জিপের ইঞ্জিনের শব্দে। তার মানে এগারোটা বেজেছে। হেডলাইটের আলোর বন্যা বইয়ে জিপটাকে এনে পথের উপরে যখন দাঁড় করাল ড্রাইভার ঠিক তখনও গ্রামের দিক থেকে পাখিটা খুব জোরে জোরে ডাকতে লাগল, ডিড উ্য ড্যু ইট ডিড উ্য ড্যু ইট—টিটিরটি টিটিরটি টিটি টিটি। আমি ওয়াটারবটল গলায় ঝুলিয়ে এক হাতে টর্চ আর অন্য রাতে রাইফেল নিয়ে মাচা থেকে নেমে জিপের সামনের সিটে বসতেই তেন্ডুলকার বলল, দিল কহতা হ্যায় কি বাঘ গাঁওকি তরফ গ্যয়া।

কী করে বুঝলে?

গ্রামের কুকুরগুলো খুব চিৎকার করছিল।

চিতা-টিতাও দেখে থাকতে পারে।

নেহি। ইক কুটরা ভি বহত তড়পতাথা গাঁও কি নজদিকহি মে। আদমি পাকড়নেকি লিয়ে বাঘ সায়েদ গ্রামহিমে ঘুষা। উওতো জানতাই হ্যায় যো উসকি ডরনেকা কোঈ বাত নেহি গাঁওমে।

আমার বুক ধ্বক করে উঠল। সকালে মেয়েটিকে মারল আবার রাতে যদি আর কারওকে মারে তবে আর লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না সবে গোঁফ-ওঠা শিকারির।

আমি বললাম, ড্রাইভারকে, তাড়াতাড়ি জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রামের দিকে চলো।

ড্রাইভার তাড়াতাড়ি জিপ ঘুরিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

গ্রামের কাছাকাছি যেতেই, সকালে যে মহুয়া গাছটার নীচে গাঁওবুড়োর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তারই একটু পরে গ্রামের দিকে একটি বিরাট লাল উজ্জ্বল চোখ দেখা গেল। বাঘের চোখ। কিন্তু একটা কেন? একটাই কোনও সন্দেহ নেই। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। জিপটা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ওই জায়গাতে।

পথের পাশে নালা কাটা ছিল বনবিভাগের। এও এক ধরনের ফরেস্ট লাইন। আগুন লাগলে আগুন গর্তে পড়ে যাতে মরে যায় সে জন্যে। বাঘটা নিশ্চয়ই সেই নালার মধ্যে নেমেছে লুকোবার জন্যে। তেন্ডুলকার আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরা সত্ত্বেও, ড্রাইভার জোরে জোরে মাৎ উতারিয়ে, মাৎ উতারিয়ে বলা সত্ত্বেও আমি রাইফেল হাতে লাফিয়ে নামলাম জিপ থেকে। আমার খুন চেপে গেছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। ড্রাইভার জিপটাকে বাঁদিকে সাইড করে দাঁড় করাল। ওর বুদ্ধি থাকলে ও জিপটাকে একটু ব্যাক করে দাঁড়াতে পারত যাতে জায়গাটা হেডলাইটের আলোতে দেখা যায়। জিপটা বাঁদিকে সরে যেতেই আমি অন্ধকারে পড়ে গেলাম কিন্তু জিপ থেকে নেমেই আমি নালার পাশে চলে এসেছিলাম। এসেই দেখি বাঘ নালা ধরে দৌড়ে পালাচ্ছে। বেশ দূরেই চলে গেছিল, প্রায় ষাট গজ হবে। রাইফেল তুলে অন্ধকারেই আমি গুলি করলাম বাঘের পিঠ লক্ষ করে। একেবারে যে অন্ধকার তা নয়, জিপের হেডলাইট পেছনে থাকলেও আলোর আভাস ছিল একটু।

গুলি করতেই, বাঘটা একটা বিরাট লাফ মারল। সোজা উপরে। অনেক দূর উঠে গেল। নালাতেই যখন পড়ল তখন তার মুখটা হল আমার দিকে। নালাতে পড়েই সে সারা শরীর মাটিতে শুইয়ে দিয়ে কান দুটো পেছনে লেপটে দিয়ে লেজ সোজা করে উল্কার মতো আমার দিকে যেন উড়ে আসতে লাগল। বুঝতে পারলাম যে গুলি পিঠে লেগেছে। কিন্তু মেরুদণ্ডে লাগেনি।

তারপর? তারপর? তুমি কী করলে?

দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে ভটকাই বলল।

আমি আর তিতির তো বটেই অন্য সকলেই উৎকর্ণ হয়ে বসেছিলেন। গল্প শুনেই আমার যাকে বলে সিটিং উইথ আওয়ার হার্টস ইন আওয়ার মাউথ।

ঋজুদা বলল, তখন কিন্তু আমি একটুও হড়বড় করলাম না। কোথা থেকে জানি না, মনের মধ্যে খুব জোর এল, মাথা ঠান্ডা হল, সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে বাঘকে দেখতে লাগলাম আমি।

আজকে পেছনে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন ষোলো বছরের একটি ছেলের দুঃসাহসের কথা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাই। ট্রিগারে আঙুল, পেছনের ট্রিগারে, নতুন গুলি ভরার সময় তো নেই। বাঘ আরও কাছে এলে তার মাথা আর ঘাড়ের সংযোগস্থলে বাঁদিকের ব্যারেলের গুলিটি দেগে দেব সেই প্রতীক্ষাতে অধীর হয়ে রুদ্ধশ্বাসে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। তিরিশ-চল্লিশ গজ আসতে বাঘের তিরিশ সেকেন্ডও লাগেনি। বাঘ নালার বুক বেয়ে এসে আমাকে যখন প্রায় ধরে

ফেলবে, জেঠুমনির বন্ধু দুর্গা রায়ের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তখন 'পাইড়্যা ফেলাইবে' ঠিক তখনই আমি ট্রিগারটা টেনে এক লাফে ডানদিকে রাস্তার মাঝখানে পড়েই রাইফেলের ব্রিচ খুলে পকেটে রাখা গুলি তুলি নিয়ে এক ঝটকায় দুটো গুলি ভরে নিয়ে আবারও এক লাফে বাঁদিকে সরে নালার দিকে এগিয়ে গেলাম রাইফেল বাগিয়ে ধরে।

ততক্ষণে নিরস্ত্র তেন্ডুলকার অসীম ও অবিশ্বাস্য সাহসে টর্চটা হাতে ধরে জিপের পেছন থেকে নেমে টর্চ জ্বালিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঘটা নালাতেই পড়ে আছে—নালাটা বাঘের শরীরে ভরে গেছে। তার দুচোখের উপরে বন্ড-এর টর্চ-এর আলো পড়তেই অঙ্গারের মতো জ্বলে উঠল এক চোখ। এবারে তার দুচোখের মাঝে ডানদিকের ব্যারেলের গুলি দেগে দিলাম আমি। সেই গুলিটি লাগতেই খোলা চোখটি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল।

তেন্ডুলকার আনন্দের চোটে আমার হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে বাঁদিকের ব্যারেলটা ফায়ার করেই রাইফেলের ধাক্কাতে নিজেই মাটিতে পড়ে গেল। হো হো করে হাসতে হাসতে আমি রাইফেলটাকে কোনওক্রমে ধরে সেটাকে জখমের হাত থেকে বাঁচালাম। হেভি রাইফেল দিয়ে গুলি করার সময়ে 'হোল্ডিং' যদি ভাল না হয় তবে কলার বোনও ভেঙে যেতে পারে। ড্রাইভার আনন্দে জিপের হর্নের ওপর শুয়ে পড়ল। যদিও তা করাটা খুবই অন্যায়। অভয়ারণ্যে হর্ন বাজানোই মানা। সেখানে হর্ন এর উপরে শুয়ে পড়লে জন্তুদের খুবই বিরক্তি উৎপাদন করা হয় কিন্তু কখনও গ্রামবাসীদের আনন্দও উৎপাদন করা হয়।

ওরা ক্রমশ এই বাঘের বিভীষিকাকে মেনে নিয়ে এক কার্ফু কবলিত জীবনে অভ্যস্ত হওয়া শুরু করেছিল, ঠিক সেই সময়েই তাদের মুক্তি এল সবে গোঁফ-গজানো আমার হাত দিয়ে।

তারপর? তারপর? মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। একজন মহাবলের এই রকম মৃত্যুর কথা ভেবে।

বলেই, ঋজুদা বলল, আর কোনও প্রশ্ন নয়। ভটকাই, ডিনার সার্ভ করতে বলো। অদ্যই শেষ রজনী। কাল খুব ভোরে উঠে জঙ্গলে যাব তারপরে ফিরে চান করে ব্রেকফাস্ট করে আন্ধারী-তাড়োবাকে এবারের মতো টা টা করে দিয়ে নাগপুরের দিকে রওয়ানা হব আমরা মোহার্লি গেট হয়ে চন্দ্রপুর হয়ে।

ভটকাই বলল, জি হুজৌর।

ঋজুদা বলল, আমি আর কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না কিন্তু তোমাদের সকলকে কটি প্রশ্ন করব। তোমরা ভাবো, আলোচনা করো, তারপরে নাগপুরে ফিরে সন্ধেবেলা প্রশ্নগুলির উত্তরগুলো দিয়ো।

কী প্রশ্ন?

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম ও উঠলেন।

প্রথম প্রশ্ন: বাঘটা মানুষখেকো হল কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: বাঘটা বেশি খেতে পারত না কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন: বাঘটা কানা হয়েছিল কোন কোন সম্ভাব্য কারণে?

তার চামড়া ছাড়ানোর সময়ে আমরা দেখেছিলাম যে সে খুবই রোগা হয়ে গেছিল। এবং তার একটা চোখ কানা ছিল। বাঘটার শরীরে কোনও ক্ষত ছিল না, মানে কোনও শিকারির গুলিতে আহত হয়ে তার এই বৈকল্য ঘটেনি।

বাঘটার কি পোস্টমর্টেম হয়েছিল?

তিতির বলল।

হয়েছিল। বনবিভাগেরই একজন ভেট করেছিলেন।

তাঁর রিপোর্ট কী ছিল?

প্রদীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

তা বলব না। মানে, নাগপুরেই বলব যা বলার। তোমরা এ দুদিন গেসওয়ার্ক করো।

এ তো মহা ক্যুইজ দিলে তুমি।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, রাতের খাওয়াটাই বরবাদ হয়ে যাবে, রাতে ঘুমও হবে না। কোনও মানে হয়। বলেই দাও না বাবা উত্তরগুলো।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বলল, বলব। নাগপুরে ।

# ফাগুয়ারা ভিলা

নেপালি দারোয়ান মস্ত বড় লালরঙা গেটটা ভিতর থেকে খুলে দিতেই 'ফাগুয়ারা ভিলা'-র হাতার বাইরের লাল মাটির পথে পড়েই ভটকাই আমাকে বলেছিল, দেখলি, যা বলেছিলাম কলকাতাতে, ঠিক তাই-ই হল।

তিতির বলেছিল, আমাদের উপরে যেন অভিশাপ লেগেছে।

সত্যি!

আমি বলেছিলাম।

গাড়ি না এলে-গেলে বড় গেটটা সচরাচর খোলে না দারোয়ান। বড় গেটের পাশেই ছোট একটা গেট আছে মানুষের এবং বিশেষ করে সাধারণ মানুষদের যাওয়া-আসার জন্যে। তবু আমরা যে ভি. আই. পি. তা দারোয়ান আমাদের প্রতি তার মালিকদের ব্যবহারেই বুঝে নিয়েছে। দারোয়ান একজন নয়, দুজন, সম্ভবত বারো ঘণ্টা করে ডিউটি করে।

গেটের ভিতরের দিকে প্রায় ফিট দশেক কাউ-ক্যাচার। গেট দৈবাৎ খোলা থাকলে যাতে গবাদি পশু ভিতরে ঢুকে না আসতে পারে, সেজন্যে।

এখন ঋজুদা আমাদের সঙ্গে আসেনি। বলেছে, তোরা হেঁটে আয়। চোখ-কান খোলা রেখে হাঁটবি। তেমন কিছু দেখলে আমাকে ফিরে এসে বলবি।

'তেমন কিছু' মানে?

ভটকাই বোকার মতো প্রশ্ন করেছিল।

ঋজুদা এমনিতে বিরক্তই ছিল, কারণ নিরবিচ্ছিন্ন ছুটিটা দরকার ছিল ঋজুদারই সবচেয়ে বেশি। তা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়াতে মেজাজ খিঁচড়েই ছিল ঋজুদার। তার উপরে ভটকাই-এর এরকম বোকা বোকা প্রশ্ন।

ঋজুদা বলল, 'অ্যালবিনো'র রহস্য উদ্ঘাটনের সময়ে তুই না-হয় ছিলি না সঙ্গে কিন্তু 'কাঙ্গপোকপি' ও 'স্যেশেলস'-এ তো ছিলি! গোয়েন্দাগিরি কিছু তো করেছিস!

ভটকাই লজ্জিত হয়ে বলল, সরি, সরি।

এখনও সন্ধে হতে প্রায় দেড় ঘণ্টা বাকি। তবু জঙ্গলের অভ্যাসবশে আমরা যে যার টর্চ নিয়েই বেরিয়েছি।

আমার পয়েন্ট টু টু পিস্তলটাও আছে কোমরে বাঁধা উইন্ড-চিটারের তলায়। আর কারও কাছে কিছু নেই। আমাদের তো শুধু বেড়াতেই আসার কথা ছিল এখানে। ঋজুদার কোল্ট পিস্তলটা অবশ্য আছে ঋজুদার কাছে। সেটা আর আমারটা ছাড়া এবারে আর কোনও আগ্নেয়াস্ত্রই আনা হয়নি।

পথটা একটু এগিয়েই হঠাৎ বাঁদিকে ইউ-টার্ন নিয়েছে, একটা বহু প্রাচীন শিমূল গাছকে সাক্ষী রেখে। শিমূলটার গুঁড়িতে পাঁচটি ভাগ। একেক ভাগের আড়ালে জনা-দশেক মানুষ স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারে। সেই শিমূলের মগডালে এক জোড়া লাল-গলা দুষ্প্রাপ্য শকুনের বাসা। শেষ বিকেলে তারা গলা লম্বা করে গলাতে রোদ পোয়াচ্ছে। পথের দুপাশে বড় শাল এবং শাল-চারার বনের ভিতরে ভিতরে হরজাই জঙ্গল। শিশু, গামহারা, বিজা, হরীতকী, আমলকী, খয়ের এবং আরও নানা গাছ। বিদায়ী সূর্যের আলো পড়াতে শীতের পাটকিলে ধুলোমলিন গাঢ় সবুজ জঙ্গল গায়ে এক মেরুনরঙা কাশ্মীরি মলিদা জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। দুপাশ থেকে ছাতারেরা ডাকাডাকি করছে এমনভাবে যেন তাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। তিতিরও ডাকছে টিউ টিউ করে। বনমোরগ ডেকে উঠল একবার।

ভাল শীত আছে। রাতে ঠান্ডা আরও বাড়বে বলে মনে হয়।

ইটখোরি নদীটা এঁকে-বেঁকে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে ফাগুয়ারা ভিলাকে পাক দিয়ে। ভারি শান্ত সমাহিত চাল এ নদীর। কোনও তাড়াহুড়ো নেই, ক্ল্যাসিক উপন্যাসের চাল-এর মতো।

কিছু দূরেই পিতিজ-এর জঙ্গল। একসময়ে কাতরাস-এর কয়লা খাদানের শৌখিন মালিক বদি রায়ের একটি বাড়ি ছিল পিতিজ-এ। ঋজুদার সঙ্গে আলাপ ছিল বদিবাবুর। কলিয়ারি জাতীয়তাকরণের পরে কাতরাস ছেড়ে এসে হাজারিবাগে বাড়ি করেছিলেন উনি। তিনি তো মারা গেছেনই বছর ছ-সাতেক হল। তাঁর দুই ছেলেও মারা গেছে কিছুদিন আগে।

আমরা দুদিকের জঙ্গল দেখতে দেখতে চলেছি, এমন সময়ে দেখা গেল কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে একজন মৌলবি, বড় তালিবানি দাড়ি গালে, মাথাতে কালো-রঙা ফেজ টুপি, লাল সবুজ চেক চেক লুঙ্গি পরে সাইকেল চালিয়ে আসছেন এদিকেই। তাঁর সাইকেলের হ্যান্ডেলের সঙ্গে লতা দিয়ে বাঁধা মাথা নিচু পা উপুড় করা দুটি বড়কা মোরগ ঝুলানো। জ্যান্ত নয়। উনি শিকার করেছেন বলে মনে হল!

ভটকাই গলা নামিয়ে বলল, লোকাল লোক। এর কাছ থেকে আমরা অনেক খবরাখবর পেতে পারি।

ঠিক।

আমি বললাম।

বলেই, বললাম, সালাম ওয়ালেকুম।

মৌলবি সাহেব ডান হাতটা হ্যান্ডেল থেকে তুলে সেলাম জানিয়ে বললেন, ওয়ালেকুম আস্‌সালাম।

তারপরেই কাছে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে বললেন, আপ হি লোগ ফাগুয়ারা ভিলামে ঠারে হুঁয়ে হেঁ?

জি হাঁ।

আমি বললাম।

ঋজু বোস কওন হ্যায়?

ভটকাই বলল, উনোনে ত ফাগুয়ারা ভিলামেই হ্যায়। মগর আপ কি কৈসে মালুম?

ভিলাকি কেয়ারটেকারনে বাতায়া মুঝে। ইয়ে মোরগা তো উনহিকি দিয়া হুয়া বন্দুক ঔর টোটাসে মারা হ্যায় আপ হি লোগোঁকি লিয়ে।

বহত বহত্ সুক্রিয়া আপকি।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, লাগতা হ্যায়, বহতই আচ্ছা বন্দুক হ্যায়। ক্যা বন্দুক হ্যায় ঈ?

দেখিয়ে না। বন্দুক হ্যায় ব্যস্‌স বন্দুকই হ্যায়। ম্যায় জানতে হ্যায় থোরি ক্যা বন্দুক? বলেই, কাঁধ থেকে বন্দুকটা খুলে দিলেন মৌলবি সাহেব। ব্যারেলে গুলি নেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বন্দুকটা ভটকাই ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে ফেরত দিল মৌলবি সাহেবকে।

কী দেখলে?

তিতির বলল।

বুঝলাম না।

আমি দেখি। বলে, তিতির বন্দুকটা ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, বাবাঃ।

বললাম, কী ব্যাপার?

তিতির চোখ নাচিয়ে বলল, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসসন।

তাই?

ভটকাই বলল, খুব দামি বুঝি?

ইয়েস।

স্মিথ এন্ড ওয়েসসন।

ভটকাই বলল।

বন্দুকটা ফেরত নিয়ে কাঁধে লটকাতে লটকাতে উনি বললেন, কী দুঃখের কথা বলুন তো। নিজের বাড়ির বারান্দাতে বসে কেউ আততায়ীর গুলিতে মারা যান! মেজকুমার মানুষও ভারী ভাল ছিলেন। নিঃসন্তান। তবে হ্যাঁ, পোষ্য নিয়েছেন তাঁর একমাত্র শালির ছেলেকে। সে পুণেতে কী যেন পড়ে। গত বছরে বড়দিনের সময় এসেছিল। ছেলেটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে।

কোথায় পড়ছে পুণেতে? কী পড়ছে?

তা জানি না।

তারপর বললেন, মেজকুমার বহত পড়ে লিখে আদমি থে। রায়পুরেই থাকতেন অধিকাংশ সময়। ওখানের কলেজেই পড়াতেন। বহতই সিম্পল আদমি থে। না জামাকাপড়ের চালিয়াতি ছিল না অন্য কোনও শখ। তিনি অজাতশত্রু মানুষ ছিলেন। তাঁকে যে কেউ গুলি মারতে পারে এ তো এই অঞ্চলের কারও মাথাতেই আসছে না।

নাম কী তার?

কার?

মেজকুমারের পোষ্যপুত্রের?

বিজিতনারায়ণ। কেন? তার সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি আপনাদের?

না। বললাম আমি। (ভাবলাম, সদ্য পরিচিত মানুষের সঙ্গে খুনের তদন্ত করতে এসে বেশি কথা বলা ভাল নয়।)

আমরা তো মাত্র গতরাতেই এসে পৌঁছেছি। আপনিই তো বললেন তিনি ভেঙে পড়েছেন।

আপনাদের ছোটকুমার ছাড়া মালিকদের কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি এখনও। ভটকাই বলল।

আমি বললাম, বড়কুমার কন্দর্পনারায়ণ এখানে আসেন না?

আসেন আসেন। পুজোর সময়ে আসেন প্রতি বছর আর দেওয়ালির পরে ফিরে যান। এই জায়গাটা তাঁর খুবই প্রিয়। তবে তিনি লাগাতার থাকতে পারেন না। আসেন যান। তাঁর সময় কোথায়? কত বড় ব্যবসা তাঁর সারা দেশজোড়া। চা-বাগান, ফাউন্ড্রি, আমদানি-রপ্তানি, কফির বাগিচা দক্ষিণের কুন্নুরে।

ভটকাই বলল, তাই?

তাই তো।

বলেই, মৌলবি সাহেব বললেন, আমি এগোই। বন্দুক গুলি মোরগা সব তো আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। রান্না হলে তবে না আপনারা খাবেন।

খাওয়ার এখন কী! সবে তো বিকেল।

গুলি কেন? গুলি তো খরচই হয়ে গেছে।

তিতির বলল।

মৌলবি সাহেব হেসে বললেন, আমার নাম এ অঞ্চলে 'মোরগার যম'। একটিই দুনম্বর ছররা দিয়ে দুটি মোরগ মেরেছি। আরেকটি গুলি বেঁচে গেছে।

সাব্বাস মৌলবি সাহেব।

আমি বললাম।

ডান হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে, অভিনন্দন গ্রহণ করে মৌলবি সাহেব সাইকেলে উঠলেন।

আসলে আমরা সকলেই জানি যে, ঋজুদা কন্দর্পবাবুর অনুরোধেই এখানে বেড়াতে আসতে রাজি হয়েছিল কদিনের জন্যে। কন্দর্পবাবু আগে কিছু জানাননি, কিন্তু আমরা ট্রেনে ওঠার সময়ে নিজে স্টেশনে এসে একটা চিঠি দিয়েছিলেন ঋজুদার হাতে। ঋজুদাকে বলেছিলেন, এই চিঠিটা পড়বেন ঋজুবাবু। আমাকে ফিরাবেন না। আপনি ছাড়া আর কেউই আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। ফিস-এর জন্যে আপনি ভাববেন না। আপনার ক্ষতি আমি পুষিয়ে দেব। ব্ল্যাঙ্ক চেক দেব আপনাকে।

ট্রেন ছাড়ার পরেই ঋজুদা চিঠিটা পড়ে কন্দর্পবাবুর উপরে মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল, ব্যবসাদার লোকদের এই দোষ। যেন তেন প্রকারেণ নিজের নিজের স্বার্থ পূরণ করতে পারলেই হল। প্রয়োজনে তারা পায়ে পড়ে যাবে তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ হয়ে গেলে চিনতেই পারবে না। তবে কন্দর্প শুক্ল মানুষটা খারাপ নয়। কিন্তু এ কী জবরদস্তি! জোর করে কেস গছানো।

চিঠিতে কী আছে?

তিতির বলেছিল।

ভটকাই বলেছিল, আমাদের খাওয়া-দাওয়া ঘুম আর রিল্যাক্স করা হবে না তাহলে। স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকিতে পাড় দিতে হবে।

ঋজুদা বলল, হয়তো নয়। তবে রথ দেখা কলা বেচা করতে হবে আর কী!

আমরা একটা ফোর বার্থ এ. সি. কম্পার্টমেন্টে ছিলাম, তাই প্রাইভেসির অভাব ছিল না। আমাদের ঔৎসক্য নিবৃত্তির জন্যে চিঠিটা তিতিরের দিকে এগিয়ে দিয়ে ঋজুদা বলল, জোরে জোরে পড়। তুই সবচেয়ে ভাল পড়িস। অন্যরাও শুনবে।

তারপরই আমার দিকে ফিরে বলল, মোবাইলে এই নাম্বারটা লাগা তো রুদ্র, বলেই, নিজের মোবাইলে-এর স্যুইচ টিপে নাম্বারটা বের করে মোবাইলটাই দিয়ে দিল আমার হাতে। বোতাম টিপতেই ফোন বাজতে লাগল। ভাগ্যিস অফ্‌ফ করা নেই।

ওদিক থেকে 'হ্যালো' শুনেই ঋজুদাকে দিয়ে দিলাম।

ঋজুদা বলল, আপনি কোথায়?

ঘরকি নজদিকমে। কম্যান্ড হসপিটালকি সামনেমে—আলিপুর।

দেখুন কন্দর্পবাবু, এভাবে মার্ডার কেস সালটানো যায় না। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট, ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট এসব দরকার। পুলিশ কি কারও বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করেছে? কোন থানায় পড়বে আপনাদের 'ফাগুয়ারা ভিলা'? তা ছাড়া, আপনাদের, পরিবারসুদ্ধ সকলের একই সঙ্গে আসতে হবে একবার এখানে। আমার পক্ষে তো সব জায়গাতে গিয়ে ইনটারোগেট করা সম্ভব হবে না। কবে সকলে এখানে আসতে পারবেন জানাবেন। না আসতে পারলে, আমি ফিরে যাব।

আরও কীসব কথা বলে ঋজুদা মোবাইলটা অফ্‌ফ করে দিল।

ভটকাই বলল, তোমার নাম্বারটা দিয়ে দিলে না?

তিতির বলল, বোকাটা। ঋজুদার নাম্বারটা তো কন্দর্পবাবুর মোবাইলে উঠেই গেছে।

তা ছাড়া, আমার সব নাম্বার ওঁর কাছে আছে।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই কিছু বলল না।

ঋজুদা বলেছিল। পুলিশ চার্জ দেয়নি। কারওকে সন্দেহই করতে পারছে না। তারপরে বলল, ছোট জায়গার থানা—যে খুন করেছে সে কি আর খুন করার আগে থানাদারকে হাত করে রাখেনি! মোটা টাকার খাম ধরিয়ে রেখেছে। হয়তো তার উপরওয়ালাকেও খাইয়ে রেখেছে। সত্যি! দেশটা যে কী হয়ে গেল চোখের সামনে অথচ...

আমাদের কি কিছুই করার নেই?

তিতির বলল।

নিশ্চয়ই আছে। প্রতিবাদ করতে হবে সব জায়গাতে। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, পথে-ঘাটে অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করতে হবে। আমার পায়ে কেউ মাড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকলে চলবে না। কারণ চুপ করে থাকলে আগামীকাল আমার পা-ও ওরা মাড়িয়ে যাবে। প্রতিবাদী না হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তিতির বলেছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গিয়েছিলেন না? 'আইন! সে তো তামাশা মাত্র। বড়লোকরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।' এদেশে যার পয়সার জোর নেই তার কিছুই নেই।

ভটকাই বলেছিল, আর যার আছে তার সব আছে।

কন্দর্পবাবুরা বুঝি খুবই বড়লোক?

হ্যাঁ। কিন্তু যাদের অনেক থাকে তাদেরই আরও অনেক দরকার।

তাই তাদের পরিবারেরই কেউ হয়তো খুনটা করেছে। কে জানে! ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস?

বুঝছি।

ঋজুদা বলেছিল, মার্ডার কেস-এর তদন্ত করতে হলে আগেই মোটিভটা কী তা জানার চেষ্টা করা দরকার। এই খুন করে কার লাভ বেশি সেটাই জানার চেষ্টা করতে হবে। তবে অনেক সময় অর্থ ছাড়াও অন্য মোটিভ থাকে। ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

আধ মাইলটাক এসেছি আমরা ফাগুয়ারা ভিলা থেকে। তিতির বলল ভটকাইকে, চলো, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা পথ দিয়ে না ফিরে নদীর বুকের বালি মাড়িয়ে ফিরি। অ্যাডভেঞ্চারও হবে আর নদীর দিক থেকে ফাগুয়ারা ভিলাটা কেমন দেখায় তাও দেখা যাবে। এই জঙ্গলে কী কী জানোয়ার আছে তারও একটা ধারণা হবে বালির উপরে তাদের পায়ের দাগ দেখে।

বাঃ! গুড আইডিয়া।

বলল, ভটকাই।

তারপর বলল, আচ্ছা, শিকার তো সারা দেশেই বে-আইনি এখন। তাও ওই মৌলবি মারল কী করে মোরগ দুটো।

আমি বললাম, এ তো শুরুদেরই প্রাইভেট শুটিং প্রিসার্ভ। এই এলাকার মধ্যে তাদের আইনই মান্য। দেশের আইনের কোনও এক্তিয়ার নেই।

তিতির বলল, ভালুক আবার খামচা খামচি করবে না তো? নদীর বুক ধরে হাঁটলে। আমরা তো নিরস্ত্র।

বললাম, আমার কাঁখে খোকা আছে।

ওই খোকা দিয়ে ভালুক পিঠ চুলকোবে।

ভারতীয় ভালুক হচ্ছে ইংলিশ ওয়েদারের চেয়েও বেশি আনপ্রেডিকটেবল। সে কী করে, কখন করে, তা আদৌ বলা যায় না। চলো, আরও পনেরো মিনিট হেঁটে আমরা নদীতে নামব।

ভটকাই বলল।

তিতির বলল, ওক্কে।



ফাগুয়ারা ভিলার কিচেনে একজন গ্র্যাজুয়েট কিচেন ম্যানেজার আছেন। মি. শর্মা। সাসারাম-এ বাড়ি। সকালের ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়েই আমাদের মিস্টার ভটকাই তাঁর সঙ্গে দোস্তি করে নিয়েছে। মি. শর্মা গ্র্যাজুয়েট কারণ ফাগুয়ারা ভিলাতে নাকি কলকাতা থেকে সাহেবসুবো অতিথিরাও আসেন। তাঁদের সঙ্গে ইংরেজিও বলতে হয়। মি. শর্মা ইংরেজিটা ভালই বলতে পারেন। বলতে বলতেই উন্নতি হয়েছে বোধহয়। আমাদের সঙ্গেও বলেছিলেন, ঋজুদার ধমক খেয়ে হিন্দিতেই বলছেন।

সাহেবি রান্নার প্রয়োজন হলে গোয়ানিজ কুক ম্যাথুজ রান্না করেন। দিশি ও নিরামিষ-এর জন্যে আছেন পাঁড়েজি। মুসলমানি রান্না ম্যাথুজই শিখে নিয়েছে সব। রেঁধে দেয়। চাইনিজও রাঁধে।

* * *

আমরা তিনজন আমার ঘরে কম্বলের তলাতে আরামে বসে গল্প করছিলাম। ফায়ার প্লেস-এ আগুন জ্বেলে দিয়েছে। প্রথমে একটু ধুঁয়ো হয়েছিল। এখন নেই। ঠান্ডাটা জব্বর পড়েছে। ঋজুদা বলেছে, একটু পরেই আসছে আমার ঘরে— আলোচনা আছে।

ভটকাই বলল, আজ রাতে সর্ষুকা সাগ, মাক্কিকা রোটি, আঁওলার আচার আর ঝুমরি তিলাইয়া থেকে আনা কালাকাঁদ।

আর মৌলবি সাহেবের মুরগি?

তিতির বলল।

আমিই মানা করে দিলাম। কাল লাঞ্চে চিকেন বিরিয়ানি, রাইতা আর সালাদ করতে বলেছি। আর রাবড়ি।

রাবড়ি?

তিতির বলল।

ইয়েস রাবড়ি। আমি আনাবার বন্দোবস্ত করেছি। তোর নাম করে বলেছি যে মেমসাহেবের ভীষণ কনস্টিপেশন। রাবড়ি রোজ চাই-ই। সঙ্গে আমরাও খাব।

এত অসভ্য না।

তিতির বলল।

এমন সময়ে ঋজুদা হাতে একটা scroll মতো নিয়ে ঢুকল। গোল করে পাকানো কাগজটা। কোনও দলিলের মতো দেখতে।

ঋজুদা আমাদের সকলের উৎসুক চোখে চেয়ে বলল, এটা কেয়ারটেকার মিশিরজির কাছ থেকে জোগাড় করেছি। জিনিসটা অরিজিনাল। কাল ব্রেকফাস্টের পর ভটকাই এটা ঝুমরি তিলাইয়া অথবা কোডারমাতে নিয়ে গিয়ে চার কপি জেরক্স করে আনবি। আমাদের প্রত্যেকের কাছেই একটি করে কপি থাকা দরকার—ফর রেডি রেফারেন্স।

এটা, মানে, এই জিনিসটা কী?

আমি বললাম।

জনমপত্রী। তবে ঠিক জনমপত্রী নয়—এটিকে বলা উচিত বংশলতিকা। আমি মাত্র দুপুরুষের এনেছি। বলেই, কার্পেটের মধ্যিখানে পাতা মস্ত সেন্টার টেবিলটার উপরে সেটাকে মেলে ধরে বলল, তোরা সবাই এগিয়ে আয়।

এইরকম পরিবারে রোজি নামটা কেমন বেমানান, না?

আমি বললাম।

ঋজুদা কিছু না বলে আমার চোখে তাকাল একটুক্ষণ। মনে হল, আই মেড আ পয়েন্ট।

ভটকাই বলল, কেন অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, হেমা, নাম হলে মেয়েদের, স্ত্রীর নাম রোজি হতে দোষ কী?

মনে হয় পঞ্চান্ন মতো।

ওঁর সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের বয়স?

দ্যাখ না, নামের পাশেই লেখা আছে।

ওঃ। পঁয়ত্রিশ।

| রাজরাজেন্দর শুক্ল + প্রেমা দেবী | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কন্দর্পনারায়ণ | ভীষ্মনারায়ণ | অনুপনারায়ণ | সুগন্ধি | শার্দুল |
| + | + | + | + | + |
| রোজি | অনসূয়া | দেবিকারাণী | যোধসিং | দিয়া |
| \| | \| | \| | \| | \| |
| নিঃসন্তান | অনসূয়া বিয়ের এক বছরের মধ্যে মারা যান। পোষ্যপুত্র : বিজিতনারায়ণ | অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, হেমা | পুতলি | রাজীব |

তার মানে তো বড়র সঙ্গে ছোটর কুড়ি বছরের তফাত।

আর সেজর?

মেজ ভীষ্মনারায়ণ—ডিসিজড। মেট আ ভায়োলেন্ট ডেথ। পঞ্চাশ বছর আগে।

হুঁ।

ঋজুদা বলল।

তারপরে বলল, কন্দর্পনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথা হল অনেকক্ষণ ধরে। ওঁদের পরিবারের সকলকে একসঙ্গে এখানে পাওয়া যাবে না। কেউ আলাদা আসবেন সামনের উইকএন্ডে—কারও কাছে আমায় যেতে হবে।

মানে, পর্বতের যেতে হবে মহম্মদের কাছে।

তিতির বলল।

সেইরকমই। কিন্তু কন্দর্পনারায়ণবাবুদের পারিবারিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে তো আমি এখানে মৌরসিপাট্টা গেড়ে থাকতে পারব না। আমাকে এবং তোদেরও সবাইকে ফিরে যেতে হবে কলকাতাতে যার যার কাজে।

তারপর বলল, তোরা এখানে খা-দা, বেড়িয়ে বেড়া, রিল্যাক্স কর। আমি একটু কলকাতা যাব কালই।

সে কী! কেন?

কী? কেন? এসব জিজ্ঞেস করবি না। কলকাতাতে পৌঁছে কাল রাতেই রায়পুর রওয়ানা হয়ে যাব। ভীষ্মনারায়ণবাবু সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর করতে হবে।

তারপর? ফিরবে কবে?

কাজ শেষ করে রায়পুর থেকে গাড়িতে চলে যাব নাগপুর। নাগপুর থেকে খুব ভোরে কলকাতার ফ্লাইট আছে। যাতেই ফিরি, ট্রেনে কিংবা প্লেনে, কলকাতা ফিরে সেদিনই ভেস্টিবুল ধরে কোডারমাতে নামব এসে—হোপফুলি যদি নাগপুর

থেকে ফ্লাইটটা সময়মতো ছাড়ে—কুয়াশার জন্যে প্রায় রোজই ডিলেড হয় ফ্লাইট বছরের এই সময়ে।

তারপরে বলল, কলকাতাতে সময়ে পৌঁছলে তোর মোবাইলে ফোন করে দেব রুদ্র। তোরা গাড়ি নিয়ে আসিস কোডারমা স্টেশনে। তবে ড্রাইভার রেখে যাবি। নিজেরাই চালিয়ে আসিস। কে কার চর কে জানে। এখানের সকলকে বলবি কাজে আমাকে কলকাতা যেতে হয়েছে।

তারপর বলল, তোরা এখানে এনজয় কর। তাই করতেই তো আসা। বিপদের তো কিছু দেখছি না আমি। তবুও সবসময়ে চোখ-কান খোলা রাখবি। আমার অ্যাসেসমেন্ট ভুলও হতে পারে। আমি তো আর ভগবান নই।

## ৩

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে দুটি শাখা আছে। দায়ভাগা আর মিতাক্ষরা। উত্তর ভারতের অধিকাংশই মিতাক্ষরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মিতাক্ষরা আইনে পুত্রসন্তান জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গেই পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অধিকার জন্মে যায়। আর দায়ভাগাতে তেমনটি হয় না। যেমন বাঙালিদের। বাঙালি বাবারা ছেলেদের যেমন ত্যাজ্যপুত্র করতে পারেন এবং অনেক সময়ে করেনও, তা মিতাক্ষরাতে হয় না। তবে ওই অধিকার জন্মায় শুধুমাত্র বাবা যে পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন তারই উপরে।—বাবার স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে ছেলের কোনও অধিকার জন্মায় না। বাবা দিয়ে গেলে অন্য কথা, না দিয়ে গেলে, কিছুই করণীয় নেই। বাবা রামকৃষ্ণ মিশনে বা অন্য কোনও ভাল সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁর নিজস্ব রোজগার দানও করে দিয়ে যেতে পারেন।

ঋজুদা এই অবধি বলে থামল।

তিতির বলল, তাহলে ভীষ্মনারায়ণের পৈতৃক সম্পত্তিতে বিজিতনারায়ণের এমনিতেই হক ছিল। তাহলে, ছেলে সে যতই চালিয়াত ও খরচে হোক, বাবার বিরুদ্ধে তার অনুযোগ থাকার তো কথা নয়।

ঋজুদা কাল বিকেলেই ফিরেছে কলকাতা থেকে। আমরা বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে ওইসব আলোচনা হচ্ছিল।

ঋজুদা বলল, অনুযোগ থাকতে পারে। বাবার অবর্তমানে সে এ সম্পত্তি পাবেই কিন্তু বাবা কতদিন বাঁচবেন তা তো জানা নেই। বাবা তো নব্বুই বছরও বাঁচতে পারেন। ততদিনে পালিত পুত্র বিজিতনারায়ণের বয়স হয়তো হয়ে যাবে সত্তরের কাছাকাছি। অতদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য তার হয়তো ছিল না। তোদের প্রজন্মের কারওরই অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। রমাপদ চৌধুরীর একটা উপন্যাস ছিল না? 'এখনই'—যাকে বলে 'right now'—তোরা সকলেই right now-তে বিশ্বাসী। তা

ছাড়া ভীষ্মনারায়ণ অধ্যয়নশীল মানুষ ছিলেন। বই আর কলম ছাড়া তাঁর অন্য কোনও খরচ ছিল না নেশাও ছিল না। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন, নিরামিষ খেতেন, রায়পুরের বিদগ্ধ মহলে তাঁর বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। চিন ও জাপান সম্বন্ধে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। অনেকবার গেছেনও ওই দুদেশে। জাপানি ও চিনা পণ্ডিতেরা তাঁর পাণ্ডিত্যকে সম্মান করতেন। তাঁর কয়েকটি বই ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত হয়। পলিটিকাল সায়ান্স-এর সেইসব বই থেকেও তাঁর প্রচুর আয় ছিল—হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে মাইনেও কম পেতেন না। তিনি যে বিজিতনারায়ণকে যথেষ্ট টাকা দিতেন না এমনও নয়—যদিও তাঁর জীবনযাত্রা এবং বিজিতনারায়ণের জীবনযাত্রাতে বিস্তরই তফাত ছিল। তাঁর কাছে যা 'যথেষ্ট' তা হয়তো বিজিতের কাছে 'যথেষ্ট' ছিল না।

কী পড়ে বিজিতনারায়ণ পুণেতে?

ম্যাসকম।

ভটকাই বলল, মানে?

আমি বললাম, মাস কম্যুনিকেশান।

ও পড়ে কী হয়?

অ্যাডভার্টিজমেন্ট লাইনে যাওয়া যায়—টিভিতে, রেডিওতে, ভাল চাকরি পাওয়া যায়। নিজেও কোম্পানি করতে পারে। আজকাল স্পেশালাইজেশনের যুগ।

অ।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, বিজিতনারায়ণ ব্রান্ডেড জামাকাপড় ছাড়া পরে না। স্কচ হুইস্কি ছাড়া খায় না।

ব্রান্ডেড মানে?

ভটকাই আবার বলল।

ওকে বুঝিয়ে দে রুদ্র।

ব্রান্ডেড মানে নামকরা ব্রান্ডের জামাকাপড়। যেমন নাইকে, ওয়েস্টসাইড, উইকএন্ডার আরও কত কী। একটা ঢোলা হাফ-প্যান্টের দাম হাজার টাকা—যেমন ঢোলা হাফ-প্যান্ট আগেকার দিনের কনস্টেবলরা পরত—খাকি কাপড়ের।

আমি বললাম, লজ্জা তো কত সস্তাতেই নিবারণ করা যায় কিন্তু এখন লজ্জাস্থান গোপন করার চেয়ে তো বিভিন্নভাবে প্রকাশ করাটাই সপ্রতিভতার উৎকর্ষ বলে মনে হয়। প্রয়োজন নয়, এখন কায়দাটাই আসল।

যা বলেছ।

তিতির বলল।

তারপর বলল, আর সেই কায়দার জন্যে গুণাগার কী পরিমাণ গুনতে হয়! পশ্চিমি বড়লোকদের দেশে ওরা করে বা পরে, ঠিক আছে। ওদের রোজগার

আমাদের চেয়ে কত বেশি! যে দেশে সব মানুষে দুবেলা খেতে পায় না, একজোড়া ধুতি-জামা পরতে পায় না সারাবছর, সেই দেশে এইসব চালিয়াতির কী মানে হয় আমার মাথাতে আসে না।

আমি বললাম, বলেছ ঠিকই। এইসব চালিয়াতিতে যারা শামিল হয় এদেশে তারা জনগণের কত জন? শতকরা এক ভাগও কি হবে?

তাও হবে না। মানে, এক ভাগও হবে না তারা। অথচ মিডিয়াগুলো এদের জন্যেই সবকিছু করে সাধারণ মানুষের জন্যে কিছুমাত্রও নয়। লজ্জাকর!

ঋজুদা বলল। ওসব গ্লোবালাইজেশনের কুফল। গ্লোবালাইজেশনের সুফল যে একেবারেই নেই তা বলব না। তবে যা দেখছি, তাতে মনে হয়, কুফলই বেশি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। আমরা বিজিতনারায়ণের প্রসঙ্গ থেকে অনেকেই সরে এলাম।

হ্যাঁ। আমি বললাম।

তারপর বললাম, আমাদের বিবেচনার বিষয় ছিল, চটজলদি বড়লোক হবার জন্যে বিজিতনারায়ণ কি তার পালক বাবাকে খুন করতে পারে?

সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

ভটকাই বলল, ভীষ্মনারায়ণকে খুন করে আর কার লাভ হতে পারত?

সেটাও প্রশ্ন। ভেরি পার্টিনেন্ট প্রশ্ন।

তিতির বলল, যে খুনি সে কি নিজে হাতে খুন করেছে না কারওকে দিয়ে খুন করিয়েছে সেটাও একটা প্রশ্ন।

এ দিকটা নিয়ে আমি ভেবেছি।

ঋজুদা বলল। তারপরে বলল, এই পরিবারে শুধুমাত্র কন্দর্পর ভাই শার্দুল ছাড়া আর কেউ বন্দুক রাইফেল চালাতেই জানে না। সে তো আমরা বুঝেই গেছি। নইলে মৌলবিকে দিয়ে মোরগা মারতে পাঠায় মিশিরজি গুলি-বন্দুক দিয়ে!

সে তো মৌলবি তোদের বলেছিল। আসলে কে পাঠায় তার খোঁজ করেছিস কি?

ঋজুদা বলল।

আমরা মাথা চুলকে বললাম, না তো।

মোরগ খেয়ে তো হজম করে দিলি। আর এই খবরটাই নিলি না। মৌলবি যা বলল তাই বিশ্বাস করে ফেললি। যুক্তি দিয়ে বিচার না করে কোনও কিছুকে বিশ্বাস করাটাই গোয়েন্দার ধর্ম নয়।

ঋজুদা বিরক্ত গলাতে বলল।

তারপরে বলল, আজই খোঁজটা নে। এই ফাগুয়ারা ভিলাতে গুলি-বন্দুক কার জিম্মাতে থাকে? কী কী রাইফেল বন্দুক আছে এখানে? কার্তুজ বা অ্যামুনিশানই বা কী আছে? কে সেই অ্যামুনিশান ইস্যু করে?

তিতির বলল, ভীষ্মনারায়ণকে যেদিন খুন করা হয় সেদিন শার্দুলনারায়ণ কি এখানে ছিলেন?

হ্যাঁ। ঋজুদা বলল, খোঁজ নিয়েছি। ছিলেন। কিন্তু এও জেনেছি যে

শার্দূলনারায়ণ এবং তাঁর স্ত্রী দিয়া ভীষ্মনারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন এই পরিবারে। দিয়া গোয়ালিয়রে একটি কলেজের লেকচারার হিন্দি পড়ায়। হিন্দিতে কবিতা লেখে। বলতে গেলে, ভীষ্মনারায়ণই ছিলেন দিয়ার মেন্টর, আদর্শ, ফিলসফার।

সে জন্যেই হয়তো শাদূর্লের রাগ থাকতে পারত ভীষ্মনারায়ণের উপরে।

ঋজুদা বলল, নট আনলাইকলি। কিন্তু মনে হয় না। আমি ভাল করে খোঁজ নিয়েছি শার্দূল পুরো পরিবারে তার দেবতুল্য দাদা ভীষ্মনারায়ণকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। দিয়া ভীষ্মনারায়ণের কন্যাসমা—তার সঙ্গে স্ত্রী-হারা হলেও ভীষ্মনারায়ণের অন্য কোনও সম্পর্কর কথা অভাবনীয়। রাজরাজেন্দর শুক্ল পরিবারের সকলের এবং পরিবারের বাইরেও যত লোকের সঙ্গে আমি রায়পুরে কথা বলেছি সকলেই এক বাক্যে এ কথা বলেছেন।

তুমি একদিনেই এত তথ্য জোগাড় করলে কী করে! আর তা রায়পুরেই বা পেলে কী করে?

আমি অবাক গলাতে বললাম।

রায়পুরেই তো বাবু রাজরাজেন্দর শুক্লর পৈতৃক নিবাস ছিল। সেখানেই তো ব্যবসা করে তিনি এত টাকা রোজগার করেন। এত অল্প সময়ে কী করে এত জানলাম সেই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি যে আমার যোগাযোগ ছিল রায়পুরে। এবং গড ইজ কাইন্ড টু মি—একস্ট্রিমলি কাইন্ড ইনডিড।

তিতির বলল, কী রকম?

বিদ্যাচরণ শুক্লর নাম শুনেছিস তো? ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার সময়ে যাঁর নাম শ্রদ্ধা হয়তো অশ্রদ্ধার সঙ্গেও ঘরে ঘরে উচ্চারিত হত! এই বিদ্যাচরণ শুক্লর ছেলের সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে জানিস?

কার?

আমাদের বাংলার মহিষাদলের রাজপরিবারের মেয়ের। শক্তিপ্রসাদ গর্গকে মনে নেই, রাইফেল ক্লাবে আসতেন? সেই শক্তিদারই দাদার মেয়ের সঙ্গে।

বাঙালির মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন বিদ্যাচরণজির ছেলে?

কেন?

তিতির বলল।

কেন করবেন না। অপরূপ সুন্দরী, প্রায় মাখন দিয়ে তৈরি বাঙালি রাজার মেয়ের সৌন্দর্য মধ্যপ্রদেশের রাজসদৃশ ক্ষমতাবানের অপছন্দ হবার তো কিছু ছিল না।

ও। তাই বলো।

তিতির বলল।

রায়পুরে নেমেই সটান আমি ওদের বাড়ি গিয়ে উঠি। ওরাও তো শুক্লই যদিও রাজরাজেন্দ্রর শুক্লর সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা ছিল না ওঁদের। ওখানেই সারাদিন

থেকে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করে খেয়ে ওদেরই গাড়ি করে রাতে বেরিয়ে একেবারে সোজা নাগপুর এয়ারপোর্ট গিয়ে পৌঁছলাম। ভোর ভোর। শীতের দিন, তখনও অন্ধকার ছিল।

সত্যি! তোমার ব্যাপারই আলাদা।

ভটকাই বলল।

তিতির বলল, মরুভূমি বা সমুদ্রর মধ্যেও হয়তো তোমার এরকমই কানেকশানস বেরিয়ে যাবে।

আমি কে? সবই উপরওয়ালার দয়া।

আজকাল দেখি ঋজুদা প্রায়ই উপরওয়ালার কথা বলে। আর চলে-যাওয়া বন-জঙ্গলের বন্ধুদের কথা, গোপাল সেন, সুব্রত চ্যাটার্জি, নাজিম সাহেব, এই সব। বুড়ো হচ্ছে বোধহয়।

ভাবলাম আমি।

তিতির বলল, ফরেনসিক রিপোর্ট কী বলছে? কলকাতাতে খোঁজ নিয়েছ নিশ্চয়ই ভটচার্যি সাহেবের কাছে।

ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্ট নয়। জানতে হবে বিনোদ ঠাকরের কাছ থেকে। রাঁচি থেকে। এখন ঝাড়খণ্ড-র রাজধানী তো রাঁচি। ভটচার্যি সাহেব বিকেলে রাঁচির সঙ্গে কথা বলে জানাল, কোনও লাইট-বোর রাইফেল দিয়ে মারা হয়েছে ভীষ্মনারায়ণ শুক্লকে। এগজাক্ট বোরটা পরে জানা যাবে। তবে পুরো খবরের জন্যে আমি রাঁচির বড় উকিল বীরু রায়কে ফোন করেছি। বীরুদার দাদা রাঁচি হাইকোর্টের জজও ছিলেন। বীরু খবর নিয়ে এলে মোবাইলে জানাবে। চমৎকার মানুষ বীরু। আমার বন্ধু।

তারপর ঋজুদা বলল, দোতলার বারান্দাতে ভীষ্মনারায়ণ বিকেলে রোদে ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। পাদুটি ছিল গদি-বসানো মোড়ার ওপরে। ডানদিকে ছিল একটা তেপায়া। তাতে চায়ের পট, পেয়ালা-পিরিচ-দুধের পট, চামচ। কিছুক্ষণ আগেই চা খেয়েছিলেন। টি-কোজিতে মোড়া চায়ের পটও ছিল। তাতে চা গরম ছিল। হয়তো আরেক কাপ নেবেন!

গুলিটা কোথায় লেগেছিল? বুকে?

না। একেবারে কপালে। দু-চোখের মাঝে। প্রথম গুলিটা। তারও পর আরও দুটি গুলি করে আততায়ী। একটি বুকের বাঁদিকে, অন্যটি গলাতে। যে মেরেছে তার হাত আর্মির স্নাইপারদের মতো ভাল। তা ছাড়া, বাড়ির কেউই গুলির আওয়াজ পায়নি। দেওয়ালির আগের দিন। জঙ্গলের মধ্যের গাঁয়ের ছেলেরা ধানি পটকা ও আছাড়ি পটকাও ফাটাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। আওয়াজ হয়ে থাকলেও দূরাগত সে আওয়াজকে পটকার আওয়াজ বলেই ধরে নিয়েছে সকলে। গুলিগুলো কাছ থেকে আদৌ করা হয়নি। দোতলার খোলা বারান্দা যথেষ্ট উঁচু। সেখানে বসে থাকা মানুষকে মারতে হলে যথেষ্ট উঁচু থেকেই মারতে হবে এবং

সেরকমই মারা হয়েছে এবং গুলির শব্দ যখন বাড়ির লোকেরা তেমন পাননি কাছ থেকে তখন ধরেই নিতে হবে যে গুলিটা বেশ দূর থেকেই করা হয়েছে। এখন ঠিক কোথা থেকে যে করা হয়েছে তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। মাটিতে দাঁড়িয়ে মস্ত চওড়া দোতলার বারান্দার পেছন দিকে বসে-থাকা ভীষ্মনারায়ণকে মারা অসম্ভবই ছিল।

ভটকাই হঠাৎ বিজ্ঞর মতো বলল, কিন্তু মোটিভ। খুনের মোটিভ কী এবং কে খুন করেছে সেটা তো বের করতে হবে।

নিশ্চয়ই!

ঋজুদা হেসে ফেলে বলল, ঠিক সেই কম্মো করতেই তো কন্দর্প আমাদের অনুরোধ করেছেন। তা ছাড়া, শুধু খুনি নিজেই নয়, সে যদি অন্য কারও নির্দেশে খুন করে থাকে তবে সে কার নির্দেশে খুন করেছে, সেটাও খুঁজে বের করতে হবে। মানে abetment-এর চার্জ কাদের উপরে আসতে পারে সেটাও দেখতে হবে।

তা ঠিক।

আমি বললাম।

তিতির হঠাৎ বলল, ভাল কথা মনে পড়ে গেল। তিনদিন হয়ে গেল, আমরা যে নদীর বালিতে অদ্ভুত একটা জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম এবং হাতির পুরীষের মতো পুরীষ জায়গাতে জায়গাতে, তা তো ঋজুদাকে রিপোর্ট করলে না ভটকাই।

ভটকাই অপরাধীর মুখে বলল, সময় পেলাম কই? তোরা সবসময়েই এত কিচিরমিচির করছিস, যেন পাখি নয়তো বাঁদর, দুটো সিরিয়াস কথা বলতে পারি, একটু কনসেনট্রেট করতে পারি তার সুযোগ কোথায় পাচ্ছি।

আমি বললাম, নে। ঢের হয়েছে। এবারে বল।

কী বলবে?

ঋজুদা উৎসুক হয়ে বলল।

ভটকাই বলল, সেদিন ফাগুয়ারা ভিলাতে বিকেলে জঙ্গল থেকে হেঁটে ফেরার সময়ে পথ দিয়ে না ফিরে আমরা নদীর বুক ধরে ফিরেছিলাম। যাতে এ বনে কী জন্তু-জানোয়ার আছে তার একটা হদিশ পাওয়া যায়। দিনমানে না হলেও রাতের বেলা তো তারা ওই নদীর বুক ধরে যাওয়া-আসা করেই।

শুধু নদীর বুক ধরে কেন সামনের বড় কাঁচা রাস্তা দিয়েও যাওয়া-আসা করে। সন্ধের পরে এ-বাড়ির ত্রিসীমানাতেও তো কোনও মানুষজন আসে না। পুরো এলাকাটাই তখন বন্যপ্রাণীদের দখলে চলে যায়।

তারপর বলল, বল কী দেখলি?

বালিতে শম্বরের পায়ের দাগ দেখলাম, কোটরা হরিণ, চিতল হরিণ, শজারু বলেই বলল, শজারুকে হিন্দিতে কী যেন বলে?

তিতির বলল, সাহিল।

হ্যাঁ সাহিল। তারপর সাপের যাওয়ার দাগ, নানা পাখির পায়ের দাগ। কিন্তু একটা জন্তুর পায়ের দাগ দেখলাম তেমন দাগ আজ অবধি কোনও জঙ্গলেই দেখিনি।

কোনও জঙ্গলে মানে?

মানে, ভারতের বা আফ্রিকার।

ঋজুদা চিন্তিত ভটকাইকে দেখে হেসে ফেলল।

ভটকাই তাড়াতাড়িতে বলল, মনে কোরো না আমি একাই দেখিনি। তিতির এবং রুদ্র তোমার দুই ভাস্টলি এক্সপিরিয়েন্সড ওয়ার্ল্ড-ট্র্যাভেলড সাগরেদরাও দেখেনি।

ঋজুদা এতক্ষণে হয়তো ভাবছিল আমরা, ভটকাই ওর সঙ্গে মজা করছি—। বলল, সত্যি নাকি রে?

সত্যি!

আমি আর তিতির সমস্বরে বললাম।

দাগটা কীরকম। পাগ-মার্ক না হুফ-মার্ক?

হুফ মার্ক। তিতির বলল। হুফ মার্ক যে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

গ্রামের গোরু-মোষের পায়ের দাগ দেখে থাকবি নিশ্চয়ই।

তাহলে কি আমরা চিনতে পারতাম না?

নয় বলছিস?

তারপর একটু ভেবে বলল, তাহলে সম্ভবত নীলগাই-এর পায়ের দাগ দেখেছিস।

আমি বললাম, নীলগাইয়ের পায়ের দাগও আমাদের চেনা।

হুমম-ম-ম।

ঋজুদা বলল। তারপর বলল, দাঁড়া এক ফিল পাইপ খেয়ে নিই। বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিলি তোরা।

তারপরই বলল, হাতির পুরীষ না কীসের কথা বললি তোরা। কিন্তু হাতি তো এ অঞ্চলে নেই।

একটাও নেই?

না, একটাও নেই। তবে কয়েকবছর বাদে বাদে পানুয়ানা টাঁড় থেকে কোনও হাতি দলছুট হয়ে 'রোগ' হয়ে চলে আসে। তারা রে-রে-রে করে রীতিমতো জানান দিয়েই আসে। বাড়ি-ঘর গাই-বয়েল ভেঙে, আছড়ে মেরে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে যায়। এ অঞ্চলে হাতি এসেছে অথচ স্থানীয় মানুষ খোঁজ রাখে না এমনটি হতেই পারে না।

তাহলে কীসের পুরীষ?

তাই তো ভাবছি।

তারপরেই বলল, আচ্ছা, কাল সকালে এক কাপ করে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব

তোদের সঙ্গে। ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে। সময় তো আর বেশি নেই। আমায় পনেরো তারিখে ব্যাঙ্গালোরে যেতেই হবে। এই রহস্যের উন্মোচন পনেরো তারিখের মধ্যেই করতে হবে যে করে হোক।

আর যদি না করা যায়?

তাহলে হবে না। মানে আমাদের দ্বারা হবে না। অন্য কেউ করবেন হয়তো পরে। সংসারে সব অঘটনের রহস্য উদ্‌ঘাটনই যে আমাদেরই করতে হবে তারই বা কী মানে আছে? তা ছাড়া আমাদের চেয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ তো কম নেই এই ভারতভূমে। আমরাই কি একমাত্র তালেবর?

সেটা ঠিক। কিন্তু কখনও তো তুমি হারোনি।

একবার না-হয় হার স্বীকার করেই দেখা যাক। Failures are the pillars of success. বুঝেছ ভটকাইচন্দ্র।

তারপরই বলল, এবারের খাদ্য পানীয় সম্বন্ধে ভটকাই-এর একেবারেই ইন্টারেস্ট দেখা যাচ্ছে না। কী ব্যাপার বল তো রুদ্র। ওর শরীর-টরির খারাপ নাকি?

করে মরি তোমাদেরই জন্যে আর তোমরাই আমাকে লাফিং স্টক করো। তাই এবারে ইচ্ছা করেই ওদিকে যাচ্ছি না। ওদিকে না গেলেও মিশিরজি, কিচেন ম্যানেজার মি. শর্মা এবং অন্যেরা মিলে বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি রাখেননি। তবে তাঁরাই আমাকে একটু কনসাল্ট করেছিলেন লাঞ্চ-এর পরে। কী করে লোকে বুঝে যায় কে জানে!

ভালই তো, আমরা তো তোমাকে চিনলাম না। যাঁরা চিনলে ভাল তাঁরাই তো চিনেছেন। তিতির বলল।

তাই? ভটকাই বলল উজ্জ্বল মুখে।

ঋজুদা হাসি হাসি মুখে ভটকাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, রাতে কী হচ্ছে?

যা ঠান্ডা পড়েছে, রাতের মেনুটাই আসল।

এখনই কী ঠান্ডা! পরে ঠান্ডা বাড়বে।

তিতির বলল, তুমি জানলে কী করে।

ছেলেবেলা থেকে সেই জেঠুমনির সঙ্গে যখন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম তখন থেকেই জেনে আসছি। জানুয়ারি মাসের ২৩ থেকে ৩১ পূর্ব ভারতের বনে পাহাড়ে বৃষ্টি হবেই আর তার সঙ্গে নামবে কনকনে ঠান্ডা। বৃষ্টি মানে, মুষলধারের বৃষ্টি নয়। তা হলেও সামান্যক্ষণের জন্যে হবে। তারপরই একটা উথাল-পাথাল হাওয়া বইতে থাকবে ফুল পাতা আর বনগন্ধ উড়িয়ে নিয়ে আর সঙ্গে ফিসফিসে বৃষ্টি। ঠান্ডা পড়বে তখন, যাকে বলে ঠান্ডা।

তারপরই বলল, সে যাই হোক, ভটকাই কী বলে শোনা যাক আজকের রাতের মেনুর কথা।

ভটকাই গলাটা খাঁকরে নিয়ে বলল, মুলিংগাটানি স্যুপ। তবে তিতির ভালবাসে না বলে তিতিরের জন্যে চিকেন ব্রথ।

তারপর?

তারপর ছাতুর লিট্টি, বেগুনভাত্তা সঙ্গে কাঁচালঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, টোমাটো কুচি। সঙ্গে ময়ূরের কাবাব—

কীসের কাবাব?

চমকে উঠে ঋজুদা বলল।

ময়ূরের।

তুই জেলে যাবি এবং আমাদেরও পাঠাবি?

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ ঋজুদা। এই এককালীন রাজ-এস্টেটের মধ্যে মানুষ মারলেও যেমন জেল হয় না, ময়ূর মারলেও হয় না। 'ইয়ে সব হামারা রাজ হ্যায়।' মহান ভারতের ভিতরে এখনও এরকম অনেক ইন্ডিপেন্ডেট স্টেট বেঁচে আছে। কয়লা রাষ্ট্রায়ত্ত হলে কী হয়, খোঁজ নিয়ে দেখো এখনও অনেক জায়গাতে বে-আইনি খাদান চালু আছে, বিশেষ করে ওপেন-কাস্ট মাইন। 'বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, জগজন মানিবে বিস্ময়।'

ঋজুদা ভটকাইয়ের রসিকতাতে মোটেই গলল না। বলল, ময়ূর মারল কে? তুই?

তারপরই আমার দিকে ফিরে বলল, তুই তোর পিস্তল ওকে দিয়েছিলি? আমি সজোরে মাথা নাড়িয়ে বললাম, মাথা খারাপ।

তবে?

তবে আমি কী করে জানব?

ভটকাই বলল, সবই খাবার টেবিল-এ বসে মিশিরজি আর শর্মাজির কাছে শুনো। বিনা কারণে আমাকে দুষছ কেন? তবে হ্যাঁ। যখন ময়ূরের মাংসর কথা শর্মাজি বললেন দুপুরে, আমি মানা করিনি কারণ ঋজুদা তার টাগরার সঙ্গে জিভ লাগিয়ে কতবার বলেছে, 'আহা! বেস্ট হোয়াইট মিট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।' তখন আমার জিভেও জল এসেছে বারবার। তা ছাড়া অন্যায়টা তো আমি করছি না। ওঁরা কারওকে দিয়ে করাচ্ছেন হয়তো। হয়তো সেই মৌলবিই হবেন। তা সে সব ওদের ব্যাপার।

তারপর বলল, যাই হোক ঋজুদা, কথা দিচ্ছি, এই ফার্স্ট আর এই লাস্ট। এর পরে এ জীবনে এই অন্যায় কর্ম আর করব না। নিজে মারার কথা তো ওঠেই না অন্যে মারলেও তাকে জেলে দেব। মাংস ফেলে দেব।

ঋজুদার মুড অফ্‌ফ হয়ে গেছিল। বারবারই মাথা নাড়ছিল আর বলছিল, ন্যাশনাল বার্ড! কী অন্যায়।

তারপরে বলল, আরে আমরা কি আজ খেয়েছি? তখন তো ন্যাশনাল বার্ড ছিল না। আমি তখন হাফ-প্যান্ট পরতাম। রুদ্র আর তিতিরও তো খায়নি। কই? ওদের তো তোর মতো লোভও হয়নি খাবার!

ভটকাই মুখ নিচু করে কাঁধ শ্রাগ করে বলল, ওরা ভাল, আমি খারাপ।

তিতির ওই সিরিয়াস পরিবেশের মধ্যেও হঠাৎ খুক করে হেসে উঠল। এবং হাসি সাংঘাতিক ছোঁয়াচে—। তিতির হাসতেই আমরাও হেসে ফেললাম, মায় ঋজুদা পর্যন্ত।

## ৪

আমরা ফাগুয়ারা ভিলাতে ফিরে যেতেই আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে শার্দূলনারায়ণ সিং চলে গেলেন। গাড়িতে ঝুমরি তিলাইয়ার উলটোদিকে ডোমচাঁচে গিয়ে ক্রিশ্চান মাইকা ইন্ডাস্ট্রিজ-এর গেস্ট হাউসে রাতটা কাটাবেন। তারপর ভোর রাতের গাড়ি ধরে কলকাতা চলে যাবেন। তারপর রাতের বম্বে মেল ধরে রায়পুর। তাঁর স্ত্রী দিয়াদেবীর এক বান্ধবীর অসুস্থতার খবর শুনে উনি অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন। তাঁর মন এমনিতেই ভারী খারাপ। ভীষ্মনারায়ণের তিনি খুবই কাছের মানুষ ছিলেন।

শার্দূলনারায়ণ বললেন, ঋজুদার হাত ধরে, আপনাকে কী আর বলব। আমার দেবতুল্য দাদার হত্যাকারীকে যদি খুঁজে বের করতে পারেন তবে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। ফিস-এর জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।

বলেই বললেন, আমি বরং আপনাকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে যাচ্ছি।

ঋজুদা হাত ধরে বললেন, ওসব কোনও ব্যাপারই নয়। কন্দর্পনারায়ণকে আমি বহুদিন হল জানি। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে। এই দুঃখবহ ঘটনার সূত্রে আপনাদের সকলের সঙ্গেও চেনা হল। তারপরই বলল, প্রয়োজনে আপনার কাছে যেতে হতে পারে। হয়তো না-জানিয়েই রায়পুরে গিয়ে উপস্থিত হব। দিয়াদেবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে আমার কাজের খুব সুবিধা হত।

শার্দূলনারায়ণ যেন কেমন মিইয়ে গেলেন এই কথাতে। বললেন, আমার স্ত্রী যদিও অধ্যাপিকা কিন্তু একেবারেই মিশুকে নন। কারও সঙ্গেই দেখা করতে চান না। যদি তেমন প্রয়োজন ঘটে তবেই আসবেন। ওঁর ব্যবহারে যেন ওঁকে ভুল বুঝবেন না। তবে আগে জানিয়ে আসবেন। উনি তো গোয়ালিয়রে থাকেন। ওঁকে আসতে বলতে হবে।

ঋজুদা বলল, আপনার অত অ্যাপলজেটিক হবার কোনও দরকার নেই। সমস্ত রকম মানুষের সঙ্গেই মেশা আমার কাজ। আমি একটুও ভুল বুঝব না ওঁকে। এবং নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে ওঁকে বিরক্তও করব না। আমিও গোয়ালিয়রে যেতে পারি ওঁর রায়পুরে আসার অসুবিধে থাকলে।

রাতে খেতে বসে ঋজুদা ইচ্ছে করে কেয়ারটেকার মিশিরজি এবং কিচেন ম্যানেজার শর্মাকে আপারহ্যান্ড দিল। ওরাই বক্তা আর আমরা শ্রোতা। মালিকদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন। তিনিও আজ চলে গেলেন তাই এখন

ওঁরাই মালিক। মুখে একবারে খই ফুটছে।

সব মানুষই কথা বলতে ভালবাসেন শুধু ইন্ধন জোগানো চাই। দুজনের মধ্যে কে বেশি জানেন তা নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলছে। ঋজুদা তো বটেই আমরাও ওঁদের পেট থেকে এই শুক্ল পরিবারের সব ভাই এবং তাঁদের পরিবার সম্বন্ধে যত কথা জানা যায় সব জেনে নিচ্ছিলাম।

সবচেয়ে আগে ময়ূর-রহস্য উন্মোচন করা হল। যা ভেবেছিলাম তাই। মৌলবি সাহেবকেই ভার দেওয়া হয়েছিল তবে ময়ূর পথ পাশের ঝোপে-ঝাড়ে তো তত দেখা যায় না তাই মৌলবি সাহেব তাঁর ভাতিজা মুনতাজারকে দিয়ে মারিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মুনতাজারও ভাল শিকারি। মৌলবি সাহেবের ভাতিজা হলেও ওর নাকি অন্য নানা ধান্দা আছে। বোঝা গেল, তাকে মিশিরজি বা শর্মাজি বিশেষ পছন্দ করেন না।

মিশিরজি বলেছিলেন, ছেলেটা নাকি খুব উদ্ধতও। মৌলবিকেও মানে না। এখানে সব সময়ে থাকেও না। হাজারিবাগ, কোডারমা, গেয়া, চাতরা, নওয়াদা, গিরিডি এই সব অঞ্চলেই ঘুরে বেড়ায়। মুম্বাইও যায় মাঝে মাঝে। নানারকম খতরনাক লোকজনের সঙ্গে ওর মেলামেশা। কোনও মালিকই ওকে পছন্দ করে না, তবে বড়বাবু কন্দর্পনারায়ণ ওকে ছোটবেলা থেকে জানেন এবং নিজের কোনও সন্তান না থাকাতে মুনতাজারকে ছেলেবেলাতে অনেক চকলেট খাইয়েছেন, খেলনা দিয়েছেন, সাইকেল এবং এয়ার-গান কিনে দিয়েছেন। পুরনো স্নেহের কিছুটা এখনও রয়ে গেছে। বড়বাবু ওকে টাকা-পয়সাও দেন বলে ওঁদের ধারণা। অন্য মালিকেরা চান না যে মুনতাজার এ প্রাসাদে আসুক। ছোট রানিমা, মানে, দিয়াদেবী তো ওকে একেবারেই পছন্দ করেন না। দিয়াদেবী অত্যন্তই সুন্দরী। অনেকটা কারিশমা কাপুরের মতো।

শর্মা সাহেব যোগ করলেন। তাঁকে নাকি কী একটা খারাপ কথা বলেছিল কখনও মুনতাজার। সেই থেকে বড়বাবুই বারণ করে দিয়েছেন মুনতাজারকে ফাগুয়ারা ভিলাতে আসতে, যতক্ষণ ছোট রানি এখানে থাকেন।

কন্দর্পনারায়ণের স্ত্রীর নাম রোজি কেন? তিতির শুধোল।

ভটকাই-এর ওই pertinent question-এর উত্তরে যা শোনা গেল তা সত্যিই অবাক হওয়ারই মতো। এখানকার নিরামিষাশী, ব্যবসা-অন্তপ্রাণ, দেব-দেবীতে মনপ্রাণ নিবেদিত কন্দর্পনারায়ণ নাকি যৌবনে অন্যরকম ছিলেন। এ নিয়ে রাজা রাজরাজেন্দ্রর নারায়ণের সঙ্গে তাঁর মতান্তর লেগেই থাকত। রোজি আসলে মুম্বাই-এর মেয়ে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। মুম্বাই-এর একটা নামী নাইট ক্লাব-এর ক্রুনার ছিলেন তিনি। গান গাইতেন। পপ গান। বিটলসদের গান। কন্দর্পনারায়ণও তখন রেগুলার বার ক্রুনার। এবং নানা নাইট ক্লাব-এ তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ওই বিয়েতে রাজাসাহেব এবং রানিসাহেবার একটুও মত ছিল না। কিন্তু কন্দর্পনারায়ণ অটল। শেষে রাজাসাহেব এই শর্তে বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন যে রোজি বহুজি

কোনওদিনও এ পরিবারের কোনও প্রাসাদে বা মেহাল-এ ঢুকতে বা থাকতে পারবেন না। তাঁর সন্তান হলে তারা এই পরিবারের সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। কলকাতাতে রাজাসাহেব আলাদা বাড়ি কিনে দিয়েছিলেন রোজি বহুজির জন্যে, এবং বম্বের জুহুতে সমুদ্রতটের উপরে একটা ফ্ল্যাটও কিনে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে কন্দর্পনারায়ণ বড় ভাই হিসেবে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিবারের কারওরই কোনও সম্পর্ক ছিল না। আজও নেই। রোজি বহুজির কোনও খবরও মানে এর বেশি খবর ওঁদের কারওরই জানা নেই।

রাজা রাজরাজেন্দর শুক্লর কোন ছেলে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

মিশিরজির বয়স প্রায় সত্তর মতো। এ বাড়িতে জিম্মাতে আছেন আজ চল্লিশ বছরেরও বেশি। বললেন, মেজছেলে ভীষ্মনারায়ণ। কত দেখে-টেখে বিয়ে দিলেন অনসূয়াদেবীর সঙ্গে—রূপে গুণে সরস্বতী-লক্ষ্মীও বটেন—তাঁর বাবার একমাত্র মেয়ে ছিলেন—মুম্বাই-এর নামী জহুরি ছিলেন ওঁর বাবা। কিন্তু বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন। তাতে যেন মেজকুমারের প্রতি রাজা ও রানিমার স্নেহ আরও উথলে উঠল। আর হবেই বা না কেন? অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। অন্য ছেলেরা ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল বটে অনেক কিন্তু মান তো অত পাননি। 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' অমন মানুষকে কেউ মারতে পারেন এ কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

রোজি মেমসাহেব, থুড়ি, রানি এখন কোথায় থাকেন? কলকাতা? না মুম্বাই?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

জানি না।

ওঁর খবর কে রাখেন?

কেউই রাখে না। যতদূর জানি বড় রাজকুমারও রাখেন না। তবে টাকা পাঠিয়ে যান অনবরত। বড় রাজকুমারের মনে শান্তি নেই। ডিভোর্স করতে চেয়েছিলেন কিন্তু রোজি মেমসাহেব ডিভোর্স দেবেন না। দেবেনই বা কেন? সাহেব চোখ বুজলে সবই তো তাঁর।

উনি মুম্বাইতেই থাকেন শুনছি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে মুনতাজার।

মুনতাজার?

আমরা সকলেই চমকে উঠলাম।

ওঁরা অবাক না হয়ে বললেন, পোষ্য নেননি বটে কিন্তু ছেলেবেলা থেকে বড় রাজকুমার পুত্রজ্ঞানেই তো দেখেছেন মুনতাজারকে। তা ছাড়া, রোজি মেমসাহেবও ওকে পছন্দ করেন।

মেমসাহেবের বয়স এখন কত?

বেশি নয়। বড় রাজকুমারের চেয়ে প্রায় বিশ বছরের ছোট তো। বিয়ের সময়ে

তো শুনেছি সতেরো বছর বয়স ছিল। এখন হবে চল্লিশ-টল্লিশ।

অ।

ভটকাই এমন মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে 'অ' টা উচ্চারণ করল যে আমরা সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

তিতির বলল, তা মুনতাজারের চাচা মোরগা-যম মৌলবি সাহেব তো সাইকেলে করেই ঘোরাফেরা করেন। মুনতাজারের বাহন কী? না কি পায়ে হেঁটেই এত সব জায়গা চষে বেড়ায়।

না, তা কেন? তার একটা ঝিং-চ্যাক মোটর সাইকেল আছে এখানে চড়বার জন্যে। যা কিছু দুষ্কর্ম মোটর সাইকেলে চড়েই করে। তারপর বম্বে সিনেমার স্টাইলে উধাও হয়ে যায়। মোটর সাইকেলই বা কেন এয়ারোপ্লেন ছাড়া চালাতে জানে না এমন কোনও যানই নেই। কানাঘুষোতে শুনেছি, ওর চড়ার জন্যে কলকাতা ও মুম্বাইতে বড় রাজকুমার জিপ এবং গাড়িও রেখেছেন। তবে সেসব নিয়ে এখানে কখনও আসে না। এখানে থাকেই বা কতটুকু সময়! ডুমুরের ফুল সে। থাকে না বলে আমরাও নিশ্চিন্ত থাকি। তাকে আমরা সকলেই ভয় পাই। সে করতে পারে না এমন কোনও কাজ নেই।

কী রকম?

এই তো গত বছর মেজকুমার ভীষ্মনারায়ণের এক বন্ধু আর স্ত্রী তাঁদের প্রিয় সাদা একটা পমেনারিয়ান কুকুর নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন মেজ রাজকুমারের সঙ্গে। বিকেলে কুকুরটিকে নিয়ে ওঁরা তিনজনে বেড়াতে বেরিয়েছেন, মুনতাজার আসছিল নদীর দিক থেকে মোটর সাইকেলে চড়ে। কুকুরটিকে পছন্দ হওয়াতে সে কোলে তুলে নিয়ে বাইক হাঁকিয়ে চলে গেল। আমরা সকলে লজ্জাতে মরি। মেহমান বলে কথা! মেজকুমারও মৌলবিকে দিয়ে মুনতাজারকে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে আসেনি। বলেছিল, আমি শুক্ল পরিবারের বান্দা নই। তারপরে কী মনে করে এসেছিল—এসে মেজকুমারকে বলেছিল আপনার দোস্তকে জিজ্ঞেস করুন কত দিয়ে কিনেছেন কুকুরটাকে। দাম আমি দিয়ে দেব।

স্তম্ভিত মেজকুমার বলেছিলেন ভালবাসার কী দাম হয়? কুকুরটার দামের চেয়ে ভালবাসার দাম যে অনেক বেশি।

মুনতাজার বলেছিল এ দুনিয়াতে সব ভালবাসারই দাম হয়। পয়সা দিলে পাওয়া যায় না এমন কিছুই নেই এখানে। আমি তো কুকুরের মালকিনকেও তুলে নিয়ে যেতে পারতাম। তাঁকেও তো আমার পছন্দ হয়েছিল—। ভারী নমকিন। কিন্তু তা তো নিইনি।

মেজকুমার বন্ধুর সামনে মুখ নিচু করে আমাকে বললেন, মিশিরজি, ও লোকটা যেন আর কোনও দিন এই ফাগুয়ার ভিলার হাতার মধ্যে না ঢোকে, বলে দেবেন।

মিশিরজি বললেন।

তারপর?

তারপর আর কী? আমি কিছু বলার আগেই মুনতাজার বলল, আমি আসতে চাইলে আমাকে আটকায় এমন কে আছে? দয়া করে আমি আসি না, এই যা। আপনাদের ছোট বহু দিয়ারানিকেও আমার খুব পছন্দ। সে এলে, তাকে একটু দেখবার জন্যেই আসি। কিন্তু সে এত নিষ্ঠুর যে এলেও দেখা দিতে চায় না।

মেজকুমার বললেন, মিশিরজি, বন্দুকটা কোথায়? বন্দুকটা আনুন। আমি এখুনি এর বদতমিজি শেষ করব। তারপর সারাজীবন জেল খাটতে হয় কি ফাঁসি যেতে হয় তাই যাব।

মুনতাজার মেজকুমারের পায়ের কাছে থুথু ফেলে বলেছিল, বন্দুক থাকলেই কি হয় নাকি? চালাতে জানতে হয়।

বলেই, সে চলে গেছিল।

ভটকাই বলল, এত বড় কথা। ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। হয়ে গেলে কুরুক্ষেত্র বাঁধত।

তিতির বলল, ময়ূর মারে, এ তো অ্যান্টিন্যাশনাল। ছিঃ!

মি. শর্মা বললেন, জুগনু নামের একটা রাখাল তার ঘরে না-ফেরা গোরু খুঁজতে খুঁজতে এক রাতের বেলা জঙ্গলে ঢুকেছিল। মুনতাজার তার জিভটা কেটে দেয়। জুগনু বোবা হয়ে গেছে।

মিশিরজি গভীর উষ্মার সঙ্গে বললেন।

আর তারপরও সেই মানুষ মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়, আপনাদের সঙ্গে ধমকে কথা বলে, আপনাদের বাড়িতে সে আসে!

না, বাড়িতে সেই কুকুরের ঘটনার পরে আর আসেনি। আর তার সঙ্গে দেখাই হয় না, তার কথা কী হবে।

আপনাদের গাঁয়ের মানুষগুলো মানুষ নয়।

ভটকাই ভীষণ রেগে মুঠি পাকিয়ে বলল।

হয়তো তাই।

মিশিরজি বললেন।

তারপর বললেন, গাঁয়ের মানুষেরা গরিব, খুবই গরিব, কোনওরকমে দিন গুজরান করে বেঁচে থাকে।

ঋজুদা এতক্ষণে বলল, ওরা তো আপনাদেরই প্রজা ছিল এত বছর। জমিদারি বিলোপের পরে না-হয় জমিদারি গেল এই দেশে। কিন্তু ওদের গোলামি তো শেষ হয়নি। আপনারা ওদের মানুষের মর্যাদা দিলে খাওয়া-পরার সু-বন্দোবস্ত করলে ওরা মানুষের মতো বাঁচত, মানুষ হত, এইভাবে অসম্মানের মধ্যে নিজেদের ধর্মের চরম অপমান সহ্য করেও খাওয়া-পরার জন্যে, নিছকই নিশ্বাস নেবার জন্যে বাঁচত না, এমন মনুষ্যেতর জীবন বইত না।

শর্মাজি বললেন, আমরা তো কর্মচারী, আমরা কী করব।

কর্মচারী যেমন, তাঁদের মনিবও তেমনই জোটে।

ভটকাই ফুট কেটে বলল।

তিতির বলল, ভটকাই এঁদের বলে দে কাল থেকে আমরা ডাল-ভাত আর একটা সবজি খাব দুপুরে আর রাতে স্রেফ খিচুড়ি। এসব শুনে খাওয়া-দাওয়ার স্পৃহা চলে গেছে।

তারপরই স্বগতোক্তি করল, একটা লাফাঙ্গা, সে তালিবানিই হোক আর যাই হোক, পুরো বস্তি, পুরো রাজবাড়িকে এমনভাবে টেররাইজ করে রাখবে এ সহ্য করা যায় না।

তারপরই খাওয়ার টেবিল ছেড়ে আমরা উঠে এলাম।

থানা কী করে? এখানে কি থানাটাই নেই?

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঋজুদাকে।

থানাই যদি কিছু করত তবে কি মুনতাজারের অত বাড় বাড়ত?

ঋজুদা বলল।

মিশিরজি এবং শর্মাজি দুজনেই কিচেনের ভিতরে গেছিলেন। ওরাও বোধহয় এখন পস্তাচ্ছেন আমাদের এত কিছু বলে ফেলে।

ঋজুদা গলা নামিয়ে বলল, আমরা এখানে দাঙ্গা-মারামারি করতে আসিনি। যাদের যা যোগ্যতা তারা সেরকমই জীবন পায়। ক্লীব, ভীরু, নিজস্বার্থপরায়ণ মানুষদের এমন কুকুর, বেড়ালের মতোই বাঁচতে হবে। এরা নিজেদের হাতে-পায়ে বল সঞ্চার না করলে বাইরে থেকে এসে আমরা এদের বলীয়ান করতে পারব না।

ভটকাই বলল, তাহলে আমরা কী করব?

এখান থেকে আমরাও চলে যাব। কন্দর্পনারায়ণ তো আমাকে এ আপদের কথা ঘুণাক্ষরেও বলেননি অথচ দেখা যাচ্ছে এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তাঁরই হাতে তৈরি, তাঁর পুত্রসম। এ তো মহা গোলমেলে ব্যাপার দেখছি।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে ঋজুদার ঘরে গিয়ে আমরা একটু নিরিবিলিতে পরামর্শ করলাম। ঋজুদা বলল, কাল বিকেলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমার এমনিতেই ফিরতে হত। এখানে না হচ্ছে বিশ্রাম—মানে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম—না হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি। তা ছাড়া কন্দর্পনারায়ণের এই ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে চাপানোর রকমটা গোড়া থেকেই আমার পছন্দ হয়নি।

চলে যাব?

হতাশ গলাতে ভটকাই বলল।

চলে যাব, তবে কাল সকালে তোদের সঙ্গে নদীতে যাব। কী সব রহস্যময় পদচিহ্ন এবং পুরীষ দেখেছিস তোরা বললি তা একটু আমার দেখা দরকার।

কেসটা ছেড়ে দেবে ঋজুদা? তাহলে ভীষ্মনারায়ণের মৃত্যুর তদন্ত হবে না আর মুনতাজার না কে সে হনুমানটা এখানে এমন করেই তাণ্ডব করে যাবে?

সেসব কন্দর্পনারায়ণের পরিবারের ব্যাপার। সব দায়িত্ব কি আমার নাকি? না

আমাদের?

কিন্তু কেসটা মাঝপথে ছেড়ে দিলে কী হবে?

কী হবে? গোয়েন্দার কি অভাব আছে না কি? কন্দর্পনারায়ণের পয়সা আছে। পয়সা ফেললে গোয়েন্দার অভাব কী?

না, তা নয়, আমতা আমতা করে তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, ভীষ্মনারায়ণের হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন করি আর নাই করি ওই আউট-ল মুনতাজারকে একটু টিট করতে আসব একবার শিগগির। তবে এখানে উঠব না।

কোথায় উঠবে?

পিতিজ বনবাংলোতে। একেবারে নদীর উপর ছোট্ট কিন্তু সুন্দর বনবাংলো আছে। দুটি বেডরুম, মাঝে ড্রয়িং-কাম ডাইনিং। বারান্দাটা চওড়া এবং ভারী সুন্দর। কাজমি সাহেব এখন হাজারিবাগের ডি. এফ. ও.। কলকাতাতে ফিরেই ফোনে ওঁকে বলে দেব রিজার্ভেশনের জন্যে।

কোন কাজমি? যিনি পালামৌতে ছিলেন? সাউথ কোয়েলে?

আমি বললাম।

যাঁর জিপ ল্যান্ডমাইনে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল জঙ্গি ছেলেরা? ড্রাইভার মারা গেছিল?

তিতির বলল।

হ্যাঁ। সেই কাজমি সাহেবই।

তারপর বলল, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব আমি। এই ছেলেদের দিয়েই আমি ওই মুনতাজারকে শায়েস্তা করব।

গুপ্তচরদের সঙ্গে এদের যোগ নেই তো?

ভটকাই উদ্বিগ্ন গলাতে বলল।

না। ওরা দেশদ্রোহিতা করবে না। ছেলেগুলো ভাল।

তুমি জানলে কী করে!

তিতির বলল।

আমার সঙ্গে ওদের একটা দলের দেখা হয়েছিল।

কোথায়? আমাদের তো বলোনি।

আমি বললাম।

পালামৌর কেঁড় বাংলোতে। বছর পাঁচেক আগে একা ছিলাম কেঁড় বাংলোতে। একটা জরুরি লেখা লিখতে গেছিলাম। বিদ্যুৎ ছিল না। সারাদিন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত লিখতাম তারপর সন্ধের পরে চান করে বারান্দাতে বসে থাকতাম থামের গায়ে পা তুলে দিয়ে। সূর্য ডুবত, চাঁদ উঠত আর এম সি সি-র ছেলেরা হাততালি দিয়ে দিয়ে দারুণ ছন্দোবদ্ধ এবং মহড়া-দেওয়া সমবেত সংগীত গাইত জঙ্গলের মধ্যে বসে। একদিন ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম একা।

তোমাকে কিছু করল না?

আমি বললাম।

না তো। আমাকে বসতে দিল বাঁশের খোঁটার মোড়াতে। বোঝা গেল যে, রুদ্র রায়ের কল্যাণে ওরা আমাকে চেনে। আমার সম্বন্ধে নানা লেখা ওরা পড়েছে। তা ছাড়া 'কোজাগর'ও পড়েছে ওরা। 'কোজাগর'-এ নকশাল ছেলেদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন চাপা তো ছিল না।

তারপর বলল, তখনই ওরা বলেছিল, যে কোনও প্রয়োজনে ওদের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করি আমি। একটা পাসওয়ার্ডও দিয়েছিল। যে কোনও গাঁয়ের পান বিড়ি বা চায়ের দোকানে সেই পাসওয়ার্ড বললেই ওরা আলাদা করে ডেকে নিয়ে আমার কথা শুনবে তারপর রাঁদেভুঁ পয়েন্ট ঠিক করে নিয়ে দেখা করবে।

পাসওয়ার্ড কী?

ভটকাই বলল।

তোকে বলব কেন? তুই একটা নিরেট হচ্ছিস দিনে দিনে—বুদ্ধি-সুদ্ধি সব ব্যাকগিয়ারে দিয়ে রেখে মহানন্দে আছিস।

ভটকাই লজ্জা পেল।

আমি বললাম, তা ছাড়া, পাঁচ বছরের পুরনো পাসওয়ার্ড এখন বাতিলও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

## ৫

খুব ভোরে এক কাপ চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। দারুণ ঠান্ডা। যদিও তেইশে জানুয়ারি ধারে কাছে নেই। নদীর জল থেকে ফ্রিজের দরজা খুললে যেমন ঠান্ডা ধোঁয়া বেরোয় তেমনই ধোঁয়া বেরোচ্ছে, যদিও জল খুবই কম গভীর।

নদীর বালির দিকে তাকাতে তাকাতে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। যার চোখে যে জানোয়ারের পদচিহ্ন পড়ছে, কথা না বলে অন্যদের তা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে সে।

একটা মস্ত ভালুকের পায়ের দাগ দেখা গেল। যা আগের দিন দেখা যায়নি। তার আধ মাইলটাক যাবার পরে সেই কিম্ভূত জানোয়ারের পায়ের দাগও দেখা গেল। বেশ টাটকা দাগ। হয় রাতে গেছে, নয় কিছুক্ষণ আগে।

ঋজুদাকে তিতির আঙুল দিয়ে দেখাল দাগটা। ঋজুদা মনোযোগ সহকারে দেখল। তারপর সেই দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল। দাগটা গিয়ে নদীর উলটোদিকে একটা মস্ত বড় পিপ্পল গাছের নীচে থেমেছে। সেখানে জানোয়ারটা

ঘুরেছে-ফিরেছে, অনেকক্ষণ ছিল হয়তো ওই একই জায়গাতে। এবং সেখানেই, যাকে আমরা হাতির পুরীষ বলে ভেবেছিলাম, তেমন পুরীষও পড়ে আছে। বেশ টাটকাই।

ঋজুদা সেই গাছতলাতে ঘুরে-ফিরে আমাকে বলল, জুতোজোড়া খুলে ফ্যাল তো!

এই ঠান্ডায় খালি-পা হব? কী করব?

জুতো খুলে এই গাছটাতে ওঠ। যা বলছি, তাই কর। উপরে উঠে দ্যাখ তো ফাগুয়ারা ভিলার পেছনের দোতলার খোলা বারান্দাটা দেখা যায় কি না! যদি দেখা যায়, তবে ভীষ্ম নারায়ণ যে জায়গাতে চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন বলে আমাদের বলা হয়েছে বারান্দার সেই জায়গাটা দেখা যায় কি না?

ঋজুদার কথামতো জুতো খুলে ফেললাম আমি। মোজাজোড়াও খুললাম। খালি পায়ে গাছে চড়তে সুবিধা হবে। তারপর আস্তে আস্তে পিপ্পলগাছটার ওপরে উঠতে লাগলাম। প্রায় পঁচিশ ফিট উঠেছি এমন সময়ে আমার চোখ পড়ল একটা মাচা। তার উপরে গাঢ় সবুজ-রঙা একটা শতরঞ্জি পাতা। দুটো শুকনো কমলালেবু রাখা আছে শতরঞ্জির উপরে আর কিছু শুকনো মেওয়া।

অবাক হয়ে সাবধানে আমি মাচার উপরে উঠে বসলাম। তারপর সামনে তাকিয়ে দেখি, মাচার সামনেটার ডালপালা কিছুটা পরিষ্কার করে ছাঁটা। মাচাতে বসে ফাগুয়ারা ভিলার পেছনের বারান্দাটা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। As a crow flies—হয়তো একশো গজও হবে না।—মনে হল—। আসলে, বারান্দাটা সেখান থেকে শ' দুয়েক গজ দূরে হবে।

আমি উত্তেজনাতে হাঁফাচ্ছিলাম। নীচে কেউ কোনও কথা বলছিল না। আমাকে নীচ থেকে দেখাও যাচ্ছিল না।

মাচার উপরে ওই পিপ্পলগাছেরই ডাল কেটে বানানো একটা tripod দেখলাম। যেটার উপরে রাইফেলের ব্যারেল রেখে নির্ভুল নিশানা নিয়ে রাইফেল ছোড়া যায়। তার মানে, এইখানে বসেই ভীষ্মনারায়ণকে পরপর তিনটি গুলি ছুড়ে, খুন করেছে আততায়ী। মাচার ডানদিকে একটা ফোকর ছিল দুটি ডালের মাঝে। সেখানে কী একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়ল। তুলে দেখি, রাইফেলের একটি খালি কার্তুজ। সেটিকে পকেটে চালান করে দিলাম। তারপরে তাড়াতাড়ি নেমে এলাম গাছ থেকে। আমার বুক ধুকপুক করছিল। যদি সেই আততায়ী ফিরে আসে এক্ষুনি—তখন কী হবে? আমরা তো প্রায় নিরস্ত্রই।

কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে হাতে নিলাম মাটিতে নেমেই।

ঋজুদা যেন জানেই আমি কী দেখেছি উপরে এমন ভাবে বলল, কী দেখলি?

তুমি যা ভেবেছিলে।

তাই?

বলেই ঋজুদা একটু ভাবিত মুখে উপরে তাকাল। বললাম, মক্কেল ফিরে

আসবে আবার। একজোড়া কমলালেবু, মুঠিভর শুকনো মেওয়া, এসব রাখা আছে মাচার উপরে শতরঞ্জিতে।

তার মানে, আরও কারওকে মারবে।

তিতির বলল।

তুই কী করে বুঝলি?

ঋজুদা বলল।

তাই তো মনে হচ্ছে। এটা আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যেও করা হয়ে থাকতে পারে। দেখাবার জন্যে যে সে মাচাতে বসে জানোয়ার শিকার করতেই এসেছিল। কমলালেবু আর মেওয়াটা সেটা প্রমাণ করার জন্যেই রাখা ছিল। ভীষ্মনারায়ণ তো আর দু-একদিন আগে খুন হননি!

ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, ঠিক।

তারপর বলল, চল এবার চটপট কেটে পড়ি এখান থেকে। জুতোজোড়া পরে নে রুদ্র। যেই আসুক, সে গাছের নীচে বালির উপরে আমাদের এত জনের জুতোর ছাপ অবশ্যই দেখতে পাবে। এবং আমরা যে তার হাইড-আউট ইনসপেক্ট করতেই এসেছিলাম তাও বুঝতে পারবে।

তিতির বলল, হুঁ।

তারপর, ফিসফিস করে বলল, লেটস ক্লিয়ার দ্য এরিয়া।

আমরা যেদিক দিয়ে এসেছিলাম তার উলটোদিকে এবং নদীর অন্য পাড় দিয়ে ফেরার পথ ধরলাম সিংগল ফরমেশানে।

তিতির বলল, সব তো বোঝা গেল কিন্তু ওই জানোয়ারটা কী?

কোন জানোয়ারটা?

ঋজুদা বলল।

ওই যে! মিস্টার কিম্ভুত, যার পুরীষ দেখলাম, পায়ের দাগ।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, ইয়েতি।

তিতির রেগে গিয়ে বলল, বলো না ঋজুকাকা?

আমরাও একটু অবাক হলাম।

ঋজুদা বলল, ঘোড়া, যার নাম অশ্ব। তবে রেসের ঘোড়া নয়, বড় ঘোড়া নয়। টাট্টু ঘোড়া। প্রায় অশ্বেতরের কাছাকাছি। বিভিন্ন প্রদেশের গাঁয়ের হাটে দেখিসনি? দিশি ঘোড়া। কত দেখেছিস আর তার পায়ের দাগ চিনতে পারলি না?

আমরা কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম জংলি জানোয়ারের পায়ের দাগের মধ্যে ও দাগ দেখে।

তার মানে, যে আগন্তুক এই পিপ্পলগাছে বসে ভীষ্মনারায়ণ সিংকে গুলি মারে সে তো ঘোড়া করেই যাতায়াত করে।

ভটকাই বলল।

বুদ্ধি খুলেছে তাহলে।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, তাই তো করবে। হেঁটে গেলে সময় নষ্ট হয় আবার জিপ বা মোটর সাইকেলে এলে আওয়াজ শোনা যায় এই নির্জন জায়গাতে দূর থেকে। তা ছাড়া, জিপ বা মোটর সাইকেল সব জায়গাতে যায়ও না কিন্তু ঘোড়া স্বচ্ছন্দেই যায়। খুনির বুদ্ধি আছে।

ভটকাই বলল, বোঝাই যখন গেছে তখন আর দেরি কেন? চলো মুনতাজারকে অ্যারেস্ট করে থানাতে দিয়ে আসি।

কেন? মুনতাজার কেন? সাক্ষী প্রমাণ কিছু আছে? এখানে ঘোড়সওয়ার কারা আছে তা বের করতে হবে। থানাতে নিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়। তা ছাড়া কোন থানা?

বললাম, চৌপারন?

তিতির বলল, হান্টারগঞ্জ?

ভটকাই বলল, ঘাংড়ি?

ঋজুদা বলল, না, কোনওটাই নয়। এমনকি চাতরাও নয়। থানা বলতে হাজারিবাগ। একেবারে কোতেয়ালি—বড় রাস্তাতেও—চওকের কাছে।

বলেই বলল, কিন্তু থানায় গেলে কিছুই হবে না। তিতির ঠিক বলেছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ কী আছে আমাদের? শুধুই surmise। তা ছাড়া মুনতাজারই যে গুলি করেছে তারই বা কী প্রমাণ আছে আমাদের কাছে?

আমরা যখন এই সব কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, উলটোদিক থেকে তিনি আসছেন। তাঁর আগমন তো নয়, যেন আবির্ভাব।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে যেদিকে পারি উল্কার টুকরোর মতো ছিটকে গেলাম। তিনি এলেন এবং চলেও গেলেন। আমরা যে যার প্রাণ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বিরাট এক মদ্দা ভালুক। কুচকুচে কালো, বুকে সাদা 'V' চিহ্ন—যেন V for victory। রাইফেল বন্দুক কিছুই নেই সঙ্গে—পিস্তল দিয়ে একে কবজা করা যেত না। তা ছাড়া, কবজা করবই বা কেন?

কেষ্টর এমন কেলে-কিস্টি মিষ্টি জীব। ঝগড়া তো আমাদের তার সঙ্গে নয়। তার রাজত্বে আমরাই বরং অবাঞ্ছিত আগন্তুক। ঝগড়া সে করতেই পারত আমাদের সঙ্গে। কিন্তু করে তো নি।

নমঃ ভালুক নমঃ, ভালুক নমঃ, ভালুক নমঃ করতে করতে আমরা ফাগুয়ারা ভিলার দিকে ফিরে চললাম।

ভটকাই বলল, কোনও অ্যাডভেঞ্চারই হল না অথচ কীরকম খিদে পেয়ে গেছে, দেখেছিস?

আমি বললাম, হুঁ।

ঋজুদা বলল, মিশিরজি এবং শর্মাজিকে বলে দিস ভাল করে, ওঁদের মালিকেরা কেউই যেন কিছুদিন দোতলার খোলা বারান্দাটা ব্যবহার না করেন। রোদ পোয়াতে কি গল্প করতে হয়, তো সামনের বারান্দা এবং দেড়তলার ঢাকা বারান্দাই যেন ব্যবহার করেন। তবে ফার্নিচারের অ্যারেঞ্জমেন্ট যেমন আছে তেমনই থাকবে যাতে মনে হয় এখুনি কেউ এসে বসবেন ও বারান্দাতে। ফার্নিচার কিছুমাত্র নড়বে না জায়গা থেকে। তারপরই বলল, আমরা পিপ্পলগাছে কী দেখেছি না দেখেছি তা বলার দরকার নেই কারওকেই। না-বলার কোনও কারণও নেই যদিও, তবু। ভটকাই বলল, বুঝেছি। কী বুঝেছে তা ভটকাই-ই জানে। আমি কিছুই বুঝলাম না। ঋজুদার মাথাতে কখন যে কী আসে তা ঋজুদা নিজেও কি বোঝে? ভটকাই বুঝবে কোত্থেকে।

ফাগুয়ারা ভিলা থেকে কোডারমা স্টেশনে আসার সময়ে ওদের ড্রাইভারের সামনে কোনও আলোচনাই করা হবে না যে একথা ঋজুদা বলেই দিয়েছিল। কে কার চর তা কে জানে!

ট্রেনে উঠে ঋজুদা বলল, পুরো ব্যাপারটা জট পাকিয়ে গেল।

তিতির বলল, কেন? মুনতাজারই তো মেরেছে মনে হচ্ছে ভীষ্মনারায়ণ সিংকে।

অত সহজেই বুঝলি। মুনতাজারই যে মেরেছে অন্য কেউ মারেনি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলি কী করে। দ্বিতীয়ত, ওর উদ্দেশ্য কী? জঙ্গুলে জায়গা। ও মারতে চাইলে তো পথে-ঘাটে যেখানে হয় মারতে পারত। অত কষ্ট করে পিপ্পলগাছে শিকারিদের মতো মাচা বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে এসে মারার হরকৎ করতে যাবে কেন?

ভীষ্মনারায়ণ তো ইনট্রোভার্ট। উনি তো বাড়ি থেকে বেরোতেনই না, শুধুই পড়াশুনো করতেন। ওঁকে বাইরে পেলে তো মারবে!

ভটকাই বলল।

সেটা ঠিক। কিন্তু তাও যদি না হয়, তবে মাচাটা এখনও বাঁধা রয়েছে কেন? শতরঞ্জি বিছানো, কমলালেবু, মেওয়া, কেন? অন্য আর কাকে মারতে চায় সেই আততায়ী?

হয়তো ছোট রাজকুমার বা দিয়ারানিকে।

তাঁরা তো এখানে নেই, আবার কবে আসবেন তারও ঠিক নেই।

এখানে তাঁর আসার কথা আছে কি শিগগিরি? জিজ্ঞেস করেছিলি মিশিরজিকে।

ঋজুদা বলল, আমাকে।

হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বা ওঁরা আসছেন না তবে কন্দর্পনারায়ণের আসার কথা পরশু। উনি তো জানেন আমরা এখনও আছি ফাগুয়ারা ভিলাতেই।

তা উনি যা খুশি ভাবতে পারেন। লেট হিম ফাইন্ড ফর হিমসেলফ। আমি হাত ধুয়ে ফেলব। গাজোয়ারি করে কেস চাপানো ঘাড়ে! অত্যন্তই বিরক্ত হয়েছি কন্দর্পনারায়ণের উপরে। লোকটা নিজেকে ভাবেটা কী? সেই 'অ্যালবিনো' রহস্যর মুলিমালৌয়ার রাজবাড়ির বিষেনদেও সিংদের মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল আর তারপর থেকে একটু একটু করে ঘাড়ে চড়েছে। একেবারে নাছোড়বান্দা। অমন গায়েপড়া, জোর করে সম্পর্ক করা মানুষদের আমি একেবারেই পছন্দ করি না। সত্যিই আমি বিরক্ত।

আমরা চুপ করে রইলাম।

কোডারমা থেকে যদি আমরা উলটোদিকে যেতাম তবে পরপর অনেকগুলো টানেল পড়ত পথে। টানেলের মধ্যে দিয়ে যখন ট্রেনটা যেত তখন কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকার হয়ে যেত রেলের কামরা দিনমানেও। তা তো নয়। আমরা যাচ্ছি ধানবাদের দিকে। এর আগে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে, মানে, সারিয়া পেরিয়ে এলাম।

ঋজুদা বলল, মনে হচ্ছে, এই প্রথম হার হবে আমাদের। এ রহস্যর সমাধান আমাদের দ্বারা হবে না।

ভটকাই বলল, বললেই হল। তুমি মাঝপথে কেস ছেড়ে দিলে আমাদের বে-ইজ্জত হয়ে যাবে। আমরা হারিনি কখনও, হারব না। হারতে ভাল লাগে না।

তবে আর কী? যাকে খুশি তাকে আসামি বলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিবেকের কাছে ছুটি নিয়ে নে, পুলিশেরা যা করে।

তিতির রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' থেকে একটি কলি গেয়ে উঠল: 'চোর চাই। চোর চাই। যে করেই হোক। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে।'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, যা বলেছিস।

তারপরেই ঋজুদাকে বললাম, তোমার বর্তমান মানসিক অবস্থাতে একটু আশার আলো দেখাতে পারি।

কীরকম?

অন্যমনস্ক ঋজুদা বলল।

আমি পকেট থেকে মাচার পাশের ফোকরের মধ্যে পাওয়া রাইফেলের কার্তুজের খালি খোলটা ঋজুদাকে দিলাম বের করে।

ঋজুদার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, কোথায় পেলি।

বললাম। তারপর বললাম, একটা রাইফেল থেকে ইজেক্টেড হয়ে ফোকরের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। একটা ফাঁকা খোলের হিসেব মিলছিল না বলেই বোধহয় খুনি মাচাতে আবার এসেছিল ওটারই খোঁজে। অথচ খুঁজে পায়নি।

ঋজুদা খোলটাকে নেড়ে-চেড়ে বলল, কী বোর-এর রাইফেলের এম্পটি

কাট্রিজ হতে পারে এটা? রুদ্র?

আমি তো আগেই নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম।

বললাম, থার্টি ও সিক্স? বুঝতে পারছি না।

উঃ হুঃ।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, আমার মনে হয়, থ্রি ফিফটিন-এর। ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানি যে রাইফেল তৈরি করে—এবং গুলিও।

এখন বের করতে হবে মুনতাজারের কাছে থ্রি ফিফটিন রাইফেল ছিল কি?

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, ফাগুয়ারা ভিলাতে তো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসসন-এর দোনলা বন্দুক আছে তোরা বললি। আর কী কী ওয়েপন আছে জানতে হবে। বলেই, মোবাইল ফোনটা অন করে বোতাম টিপল। কাকে করছ?

কন্দর্পনারায়ণকে।

ও।

লাইন লাগলে ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। একটা ইনফরমেশানের জন্যে ফোন করলাম।

—হ্যাঁ। অফ্‌ফ করে রেখেছিলাম। ফোন একটা বিরক্তিকর জিনিস।

—হ্যাঁ। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। কে বলল? মিশিরজি?

—হ্যাঁ। এ কেস আমার দ্বারা মীমাংসা হবে না। এসবের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি, চিন্তাভাবনা লাগে। হুট করে বললেই তো হত্যা রহস্যর জট খোলা যায় না।

—হ্যাঁ। যা বলছিলাম। ফাগুয়ারা ভিলাতে কী কী ওয়েপনস আছে? সেগুলো ব্যবহার করে কে বা কারা? কীসের জন্যে?

এবং তারপর ঋজুদা বেশ কিছুক্ষণ শুনল কন্দর্পনারায়ণবাবুর কথা। ওপাশ থেকে উনি কী বলেছিলেন তা তো আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না।

আপনি তাহলে পরশু আসছেন এখানে। আমি ভেবেছিলাম আমরা ফিরে যাচ্ছি শুনে আপনি আর আসবেন না।

তারপরই মোবাইলটা অফ্‌ফ করে দিল ঋজুদা।

আমরা চুপ করে তিনজনই ঋজুদার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ঋজুদা বলল, একটি ডাবল-ব্যারেল বন্দুক, তোরা যেটা দেখেছিলি, একটা পয়েন্ট টু-টু, চেকোশ্লোভাকিয়ান রাইফেল আর একটি ফোর সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল জেফরি রাইফেল—বাঘ বা হাতির মোকাবিলার জন্যে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে থ্রি ফিফটিন নেই ফাগুয়ারা ভিলাতে।

ভটকাই বলল।

তিতির বলল, ফাগুয়ারা ভিলাতে খুনির রাইফেল থাকবেই বা কেন? মানে, থাকতে হবেই কেন?

ঋজুদা তিতিরের মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মুখে কিছুই বলল না।

তারপর বলল, ফাগুয়ারা ভিলার ফোন নাম্বার তোদের কারও কাছে আছে?

আমার কাছে আছে। মিস্টার শর্মা কলকাতাতে আসবেন শিগগিরি। তাঁকে একটু খাতির করতে হবে। আমাদের এত খাতির যত্ন করলেন।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা ভটকাইকে থামিয়ে বলল, লাইনটা লাগা। মিশিরজির সঙ্গে কথা বলব।

মিস্টার শর্মাই ফোনটা ধরলেন। ধরে ভটকাই-এর প্রশ্ন শুনে বললেন, মিশিরজি নেই। নেই, মানে পুজো করছেন।

ঋজুদা হাতঘড়ির দিকে চাইল একবার।

হাত দিয়ে ফোনটা আড়াল করে বললাম, আর কিছু বলব?

না ছেড়ে দে।

ঋজুদা বলল।

তারপর আমাকে বলল, ট্রেন থেকে নামবার আগে আবার ফোন করবি রুদ্র। মিশিরজিকে পেলে জিজ্ঞেস করবি ওঁর পুজো হয়ে গেছে? উনি কখন পুজো করেন সেই সময়টা জেনে নিবি। উনি এখন সত্যিই পুজো করছেন কী না আমাদের জানা দরকার।

কেন জানি না, এই শর্মা লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, তুই তো শর্মাকে বিয়ে করছিস না। পছন্দ হবার দরকারই বা কী?

আমরা হেসে উঠলাম। তিতির অপ্রতিভ হল।

ভটকাই বলল, মি. শর্মা চমৎকার মানুষ। অনেক বিষয়ে পড়াশুনো আছে।

কিচেন ম্যানেজার হলে কী হবে। ওয়াইডলি ট্রাভেলডও। আগামী মে মাসেই তো বাইরে যাচ্ছেন।

ঋজুদা একটু অবাক হয়ে বলল, শর্মা? বাইরে? কী করতে?

বেড়াতে।

তাই? বাঃ।

মিশিরজিকে মনে করে ফোনটা করিস রুদ্র। উনি থাকলে আমাকে দিবি।

তারপরে বলল, এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

যা বলেছ।

তিতির বলল।

গল্পে গল্পে এক সময়ে হাওড়াতে পৌঁছানো গেল। দশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন ঢুকে যাবে প্ল্যাটফর্মে। হঠাৎ ফোন করার কথা মনে পড়ল। লাইনটা লাগাতেই মিশিরজিই ধরলেন। আমি ঋজুদাকে দিয়ে দিলাম ফোনটা।

ঋজুদা বলল, পুজো হয়ে গেল?

—ও। তাই।

—বন্দুক রাইফেলের গুলি কলকাতার কোন দোকান থেকে কেনেন? আমার

ভারী অসুবিধে হচ্ছে। ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশানের মেম্বারশিপের কোটাতে তুলতাম—একটা গোলমালে ঝামেলা হচ্ছে।

—কী বললেন? ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস কোম্পানি? ১ নং চৌরঙ্গি? হ্যাঁ। হ্যাঁ। এ. বি. বাবু। চিনি তো। ওঁর সঙ্গে কি আজকের আলাপ?

—ও। কন্দর্পনারায়ণবাবুর লোকই গুলি তুলে পাঠিয়ে দেয়? ঠিক আছে।

—আপনাদের খুব জ্বালিয়ে এলাম।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। আসব আবার কখনও। নমস্তে নমস্তে...

ঋজুদা বলল, রুদ্র তুই সকালেই ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস-এ যাবি। এ. বি . বাবু একটু দেরি করে আসেন আজকাল। উনি না থাকলে ওঁর ছেলে চাঁদুর সঙ্গে দেখা করে বলবি যে আমার কাছ থেকে আসছিস—এই নে একটা কার্ড রাখ।

আমাকে তো চেনেন ওঁরা।

ও। তাই?

কী বলব?

জিজ্ঞেস করবি, কন্দর্পবাবুর লোক বছরে শটগান এবং দুটি রাইফেলের জন্যে কত গুলি তোলে? ভাল করে রেকর্ড দেখে আসবি? লাইসেন্স কার নামে আছে বন্দুক রাইফেলগুলোর? কন্দর্পনারায়ণের কি অন্য ওয়েপনও আছে? যদি থাকে, তাহলে সেগুলি কী কী?

নকশাল আন্দোলনের সময় থেকে এবং অন্য কারণেও অনেকেই বন্দুক রাইফেল বন্দুকের দোকানেই রেখে দেন, প্রয়োজনের সময়ে তুলে নেন—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আবার দোকানে জিম্মা দিয়ে দেন। সমস্ত ইনফরমেশন কারেক্টলি টুকে আনবি। সন্ধেবেলাতে আমার বাড়িতে আসবি। ভুনি খিচুড়ি করতে বলব গদাধরকে। বহুদিন আমার ওখানে জমায়েত হয়নি। ছাতুর লিট্টি খেয়ে পেটের অবস্থা একেবারে শোচনীয়। ভটকাই কি আসবি?

নেমন্তন্ন না করলে যাই কী করে।

বাবা। খুব যে পায়াভারী হয়েছে দেখছি। আগে তো খিচুড়ির গন্ধ পেলেই দৌড়ে যেতিস।

আমি বললাম।

আগের ভটকাই তো আর নেই আমি। থিঙ্গস হ্যাভ চেঞ্জড।

আই সি।

ঋজুদা বলল, তিতিরও আসিস কিন্তু। কাল সন্ধেবেলা। ভুলে যাস না।

আসব।

তিতির বলল।

পরদিন সন্ধেবেলা আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখনও আর কেউ আসেনি। আমি ছোট মামাবাড়িতে গেছিলাম যোধপুর পার্কে—নইলে ভটকাই-এর সঙ্গেই আসতাম।

বল, কী খবর?

খবর আছে। শটগানের গুলি বছরে দু বাক্স তোলেন।

কী কী লটস?

দু নম্বর চার নম্বরই বেশি আর গোটা পাঁচেক এল.জি., এস.এস.জি।

আর রাইফেলের গুলি?

সেটাই একটু অবাক করল। পয়েন্ট টু-টুর গুলি এক হাজার তুলেছেন দেখলাম।

অত গুলি। একার লাইসেন্সে?

অন্য কারও লাইসেন্সেও তুলতে পারেন। জানি না, সেটা লিগালাইজ করে নিয়েছেন বিশ্বাসবাবুরা নিশ্চয়ই। কিন্তু অত গুলি কেন?

পয়েন্ট টু-টু দিয়েই হয়তো মুরগি তিতির বটের প্যাট্রিজ খরগোস ইত্যাদি মারা হয়। তিতির মুরগি মারতে তো অত গুলি লাগতেই পারে না।

আমি বললাম, টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পারে। কিন্তু সেই মার্কসম্যানটি কে? কন্দর্পনারায়ণ নিশ্চয়ই নন।

ঋজুদা বলল।

তা কি বলা যায়? কন্দর্পনারায়ণ হয়তো রাইফেল শুটিং কম্পিটিশনে নাম দেন।

আর ফোর সেভেন্টির গুলি?

ও রাইফেলের গুলি তিন বছর আগে দশ রাউন্ড নেওয়া হয়েছিল।

ও রাইফেল ব্যবহারই হয় না। বাঘ বা হাতি তো রোজ এসে ফাগুয়ারা ভিলার গেটে মাথা ঠোকে না গুলি খাওয়ার জন্যে।

আর কিছু?

হ্যাঁ। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং খবর হচ্ছে যে থ্রি ফিফটিন রাইফেলের গুলিও তোলা হয়েছে।

রাইফেল কার নামে?

জনাব মুনতাজার আলি সাহেবের।

এই সব গুলি কে তুলেছে দোকান থেকে? লাইসেন্স প্রডিউস করে?

অধিকাংশ সময়েই মুনতাজার। মিস্টার শর্মা একবার তুলেছিলেন, এবং কন্দর্পনারায়ণ নিজেও একবার। গত পাঁচ বছরের হিসেব দেখে বলছি।

হুম্ ম্ ম্।

বলল, পাইপটা ভরতে ভরতে।

শেষবারে গুলি কে তুলেছে?

মি. শর্মা।

কবে?

মাস দুয়েক আগে।

থ্রি ফিফটিন এর গুলিও?

না। থ্রি ফিফটিন-এর গুলি তুলেছে একমাত্র মুনতাজারই। তাও গত বছরে।

কত গুলি তুলেছিল?

কুড়িটা।

হ্যাঁ। থ্রি ফিফটিনটা মুনতাজারেরই নামে আছে?

হ্যাঁ। এ. বি. বাবু বলেছেন, দুবছর আগে কন্দর্পনারায়ণ রাইফেলটা ওদের দোকান থেকেই কিনে প্রেজেন্ট করেছেন মুনতাজারকে। লাইসেন্সও হোম ডিপার্টমেন্টে বলে পাইয়ে দিয়েছেন।

আমার আর কিছু বলার নেই।

আমি বললাম।

হ্যাঁ। আমারও নেই। এখন ভাববার সময়। ভাব। সকলে মিলে ভাব।

তুমি কি কোনও ক্লু পেলে?

ক্লু পাইনি। এখনও surmise-এর স্টেজেই আছে। Acid test-এ ট্যাঁকে কি না দেখতে পাইনি।

তারপরই বলল, এই ব্যাপারটা শেষ না করে ফেললে অন্য কোনও কাজে মন লাগাতে পারছি না। চল, রুদ্র, আমরা কালই Scorpion গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কন্দর্পনারায়ণও পরশু গিয়ে পৌঁছচ্ছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সুবিধাও হবে।

কাল তিতির আর রুদ্র কি যেতে পারবে? ওদের দুজনেরই তো কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র বিয়ে আছে বলছিল না।

না যেতে পারলে যাবে না। আমরা তো আর পিকনিক করতে যাচ্ছি না যে না গেলে কিছু মিস করব। ওখানে দু-তিনদিন থাকব তারপর তো ফিরেই আসব। এখানে না ফিরে তো রহস্যর জট পুরো খোলা যাবে না। অনেক loose ends tie-up করতে হবে।

হুঁ। আমি বললাম।

কাল কখন বেরোবে?

এখন পথ যা ভাল হয়ে গেছে। দু নম্বর হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে বেরিয়ে যাব।

ব্রেকফাস্ট করে বেরোব পথে কোথাও দুপুরের খাওয়া খেয়ে নেব। রাতে পিতিজ-এর বনবাংলোতে খিচুড়ি।

বলেই বলল, ভাল কথা, হাজারিবাগে কাজমি সাহেবকে ধর তো। বলে দি। এবারে একদিন ওঁর বাড়ি বিরিয়ানি খেতে যেতেই হবে হাজারিবাগ শহরে। তা

ছাড়া নাজিম সাহেবের ছেলেরাও আছে। বানাদাগ-এর পথের কবরখানাতে নাজিম সাহেবের কবরে মোমবাতিও দিতে হবে।

তারপর বলল, দোস্তরা কেউই নেই। হাজারিবাগে যেতেই ইচ্ছে করে না আর।

কাজমি সাহেবের সঙ্গে ঋজুদার কথাও শেষ হল আর তিতির ও ভটকাইও প্রায় একই সঙ্গে হাজির হল।

বাবাঃ। কী টাইমিং।

আমি বললাম।

হাতঘড়িতে সাড়ে সাতটাতে তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে ভটকাই বলল, ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারিস।

তাই তো দেখছি।

ঋজুদা বলল, উন্নতি হচ্ছে আস্তে আস্তে।

ওরা বসতে বসতে আমি বললাম, মুনতাজার-এর থ্রি ফিফটিন রাইফেল আছে।

আছে?

বলেই, ভটকাই লাফিয়ে উঠল। বলল, আমি বলেছিলাম না!

তিতির বলল, তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। মুনতাজারই মাচাতে বসে ভীষ্মনারায়ণকে গুলি করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। আর যদি করেও থাকে, কী কারণে? হোয়াট ওজ দ্য মোটিভ বাহাইন্ড?

কারেক্ট!

ঋজুদা বলল।

রুদ্র, বন্দুকের দোকানে কী কী তথ্য পেলি ওদের জানা। তারপর ভাব। সকলে মিলে ভাব।

ভটকাই বলল, পণ্ডিচেরির অরোভিল এর কম্যুনিটি থিংকিং-এর মতো?

ঋজুদা ভটকাই-এর প্রগলভতার জবাব দিল না।

ইতিমধ্যে গদাধরদা এসে বলল, এই যে সোনারা সব এসে গেছ। ভুনি খিচুড়ি তো করিতিচিই কিন্তু তোমাদের খপর যেটি দেবার তা হতিচি বাংলাদেশ থিকি বদরুল মিঞা মস্ত এট্টা ইলিশ পাইট্যেচে প্লেনে কইরে। পাঁচশো টাকা নাকি কেজি। আমাদের টাকায়। ফোনে আমাকে বইলতেছিল। তোমরা সবাই না এসি পড়লে এ মাছ নে আমি কী বিপদেই না পইড়তাম বলো দিকি।

দূর! এক কেজি ইলিশ মাছে স্বাদই হয় না।

ভটকাই বলল, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

এক কেজি!

গদাধরদা আহত হয়ে বলল, আরে, না, না। প্রায় আড়াই পৌনে-তিন কেজি মাছটা।

আমরা হই হই করে উঠলাম।

তিতির বলল, গত দু বছরে কলকাতার কোনও বাজারেই বড় ইলিশ পাইনি।

বাবা তো ইলিশ গত প্রাণ। একটা ঘটনার মতো ঘটনা ঘটালে বটে গদাধরদা তুমি।

আমরা তো খিচুড়ির সঙ্গে ভাজাই খাব। গদাধরদা, বাকি মাছ তুমি তিন ভাগ করে গাদা-পেটি আলাদা করে যাবার সময়ে ওদের দিয়ে দিয়ো। বাড়িতে রান্না করে খাবে যার যেমন রুচি।

ঋজুদা বলল।

এ কী! এ কী! তুমি কী খাবে?

আমরা সমস্বরে বললাম।

ঋজুদা মিথ্যে কথা বলল, ইলিশ মাছ আমার ভাল লাগে না।

ভটকাই তিতিরের দিকে চেয়ে বলল, এইজন্যেই বলে "খেয়ে যায়, নিয়ে যায় আরও যায় চেয়ে, কে যায়, কে যায়? বাঙালির মেয়ে।"

ঋজুদা আমাদের নতুন প্ল্যানটার কথা বলল ওদের। কাল ব্রেকফাস্টের পরে মাহিন্দ্রর টার্বো ইঞ্জিন-এর Scorpion গাড়ি নিয়ে আমরা ইটখোরি পিতিজ যাচ্ছি। তবে থাকব পিতিজ বনবাংলোতে, ফাগুয়ারা ভিলাতে নয়।

ওরা দুজনে শুনেই প্রায় কেঁদে ফেলল।

তিতির বলল, ঋজুকাকা এ কী চককান্ত।

এবং যথারীতি ভটকাই আমাকে সন্দেহ করল।

বললাম, এই সিদ্ধান্ত ঋজুদা হঠাৎই নিয়েছে। বন্দুকের দোকান থেকে যা তথ্য পাওয়া গেছে তারই ভিত্তিতে যাওয়াটা দরকার।

দু-তিনদিন থেকেই হয়তো ফিরে আসব আমরা। খুব প্রয়োজনে দিন পাঁচ সাত থাকতেও হতে পারে।

ঋজুদা বলল।

তিতির আর ভটকাই আমাকে বলল, বন্দুকের দোকানে কী খবর পেলি বল।

ওই তো। মুনতাজারকে কন্দর্পনারায়ণ থ্রি ফিফটিন রাইফেল কিনে দিয়েছেন—। ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স ফ্যাকট্রির। ফাগুয়ারা ভিলা-তে কেউ রাইফেল প্র্যাকটিস করছে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল দিয়ে। তার মানে, সেখানে কোনও মার্কসম্যান আছেন যিনি হয়তো স্নাইপিং করতে পারেন।

বলেই, ঋজুদার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, তাই তো?

ঋজুদা বলল, হুঁ।

ভটকাই বলল, তুই একটা মারাত্মক ভুল করছিস। ভীষ্মনারায়ণকে যে গুলি করেছিল সে থ্রি-ফিফটিন দিয়ে গুলি করেছিল, পয়েন্ট টু-টু দিয়ে নয়। গাছের কোটরে তুই-ই তো থ্রি ফিফটিন রাইফেলের এম্পটি সেল পেয়েছিলি কুড়িয়ে। ভুলে গেলি? তারপরেও অন্য রাইফেলের কথা আসে কী করে।

সেটা ঠিক।

আমি বললাম।

তিতির বলল, ওই অঞ্চলে টাট্টু ঘোড়া কার আছে খোঁজ লাগাও গিয়ে। ঘোড়াটাও একটা ফ্যাকটর।

ঋজুদা বলল, হুঁ।

এই যে। খাবার লাইগ্যে দিচি। খেতি খেতি কথা বলবে একন।

আমরা খাওয়ার ঘরে গিয়ে সবাই চেয়ার টেনে বসলাম একে একে।

ফাগুয়ারা ভিলাতে তো বেশি লোক থাকে না। দুজন নেপালি দারোয়ান—তারাও অবশ্য রাইফেল বন্দুক চালাতে জানতে পারে। পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বলতে প্রায় বৃদ্ধ মিশিরজি আর ভটকাই-এর নতুন বন্ধু মি. শর্মা। বাড়ির অন্য কাজের লোকেরা কেউ বন্দুক রাইফেল চালায় এটা ভাবাটা বাড়াবাড়ি।

সবই ভাবতে হবে। ঋজুদা বলল। তারপর বলল, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।'

তিতির বলল, হ্যাঁ।

ভটকাইকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ঋজুদা বলল, ইলিশের কাঁটা জিভে বা মাড়িতে ফুটে যাবে। হড়বড় করিস না, টেক ইয়োর ওন টাইম।

ভটকাই লজ্জা পেয়ে খাওয়ার স্পিড কমাল।

ঋজুদা বলল, তুই তৈরি হয়ে থাকিস রুদ্র। তোকে আমি পৌনে নটা নাগাদ তুলে নেব। পরেই বলল, তার চেয়ে তুই এখানেই চলে আয় বরং আটটার মধ্যে একটা ট্যাক্সি নিয়ে। গাড়ি তো তখন পাবি না। এখানেই ব্রেকফাস্ট সেরে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাব। কম ঘোরা হবে। বিশপ লেফ্রয় রোড থেকে আর বিদ্যাসাগর সেতু কতটুকু পথ।

ঠিক আছে।

তবে তোর রাইফেলটা সঙ্গে নিস।

কোনটা?

বিষেণদেওবাবু যেটা তোকে উপহার দিয়েছিলেন। আর দশ রাউন্ড গুলি। আমার এখানে এসে আমার থ্রি ফিফটিন রাইফেলটা, দশ রাউন্ড গুলি এবং দূরবিনটা নিবি। তোরটাও নিয়ে আসিস। আমার আলমারি থেকে নাইট ভিশান-এর দূরবিনটাও নিয়ে নিস। এখন কৃষ্ণপক্ষ। রাতে ঘুটঘুটি অন্ধকার হবে। প্রয়োজন হতে পারে।

বললাম, ঠিক আছে।

ঋজুদা ওদের দুজনকে উদ্দেশ করেই বলল, তোরা তাহলে কোনও ক্রমেই যেতে পারছিস না।

না ঋজুদা। ইমপসিবল। এমন কাছের মানুষের বিয়ে যে না থাকলেই নয়।

ফুঃ। বিয়ে করার আর সময় পেল না সব।

ভটকাই-এর রাগে আমরা হেসে ফেললাম। বেচ্চারি বর-বউ!

ওক্কে। কী আর করা যাবে।

যাওয়াটা সেখানে হচ্ছে না, না? কোনওমতেই?

ভটকাই আবার বলল।

না। টাইম ইজ দ্য এসেন্স। সময় অনেকই নষ্ট হয়েছে আর নষ্ট করার সময় নেই।

ঋজুদা বলল।

শীতের দিনে গাড়িতে করে ঘুরে কোথাও যেতে আলাদা আনন্দ। তবে এখন এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি হয়ে গিয়ে শীত-গ্রীষ্ম বোঝার উপায় তো নেই। শীতে গরম গাড়ি আর গরমে ঠান্ডা। এই কৃত্রিম ব্যাপারটা ভাল লাগে না আমার। কিন্তু এও ঠিক যে পথের ধুলো ধোঁয়া আওয়াজ সবেরই হাত থেকেই তো বাঁচা যায়। তবে একটা গাড়ি করেছে বটে মাহিন্দ্র অ্যান্ড মাহিন্দ্র। Scorpion! পৃথিবীর যে কোনও এই শ্রেণীর গাড়িকে টেক্কা দিতে পারবে। গাড়ি তো নয়, যেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বনে-জঙ্গলে-পাহাড়-পর্বতে এ গাড়ির জবাব নেই—সকলকে বাঁ পায়ে দশ গোল দিয়ে দেবে।

ঋজুদা বলল, আমরা হাজারিবাগ হয়ে যাব, কারণ, থানাতে আর ফরেস্ট অফিসে একবার করে হয়ে যেতে হবে। কিছু সময় বেশি লাগবে তাতে।

তারপর বলল, তুই-ই চালা, আমি বাঁদিকের কাচ নামিয়ে দিয়ে একটু পাইপ খাই। সারা পৃথিবীতে স্মোকিং-এর বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রচার চলেছে তাতে বিদেশ তো বটেই এ দেশেই আর কদিন এই আনন্দ থাকবে বলা যায় না।

ক্যানসার তো সত্যিই হচ্ছে।

ছাড় তো! গড়িয়াহাটের বা চৌরঙ্গির মোড়ে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে যা ক্ষতি হয় তা দশ বছর স্মোক করার ক্ষতির সমপরিমাণ। আগে পথ-ঘাট-মাঠ সব দূষণ-মুক্ত করো তারপরে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতে হাত দাও। পটলামামার আশি বছর বয়স—এখনও দিনে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট খাচ্ছেন আর দু চামচ চিনি দিয়ে পনেরো কাপ চা। কই তাঁর তো কিছুই হয়নি। না ডায়াবেটিস, না ক্যানসার না হার্ট-প্রবলেম। মনের আনন্দটাও তো একটা ব্যাপার না কি? যার হবার তার হবে। অমন পুতু পুতু করে বাঁচার কোনও মানে হয় না। দুস-স-স।

না খাওয়াই ভাল। তুমি অসুস্থ হলে আমাদের কী হবে? অনেকদিন খেলে তো।

আমি বললাম।

আমার কিছু হলে তোমাদের কিছুই হবে না। তোমরা সব আরও তালেবর হবে। আমাকে বিছানাতে ফেলে রেখে নিজেরা অ্যাডভেঞ্চার আর গোয়েন্দাগিরি করবে। যে যতদিন দৌড়াচ্ছে ঠিক আছে। থেমে গেলেই সব সঙ্গীরা তোমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তারাও নিরুপায়। মানুষের ধর্মই হচ্ছে সামনে চলা। পিছন দিকে তাকানো মানেই ফুরিয়ে যাওয়ার আগের স্টেজ। আইদার ড্যু রান ওর

ড্রপ আউট। নিজে অন্যদের বোঝা হওয়াটা কখনওই উচিত নয়। আমি অসুস্থ হলে এই সুন্দর পৃথিবীতে বাইরে না বেরিয়ে তোরা আমার বিছানাতে বসে আমাকে প্রবোধ দিবি, আমার সেবা করবি, এত বড় দুর্দৈব ঈশ্বর যেন কখনওই না ঘটান। এই প্রার্থনা করি।

তুমি ঈশ্বর মানো? ঋজুদা?

খুব মানিরে! দুশো ভাগ মানি। ঈশ্বরের দয়া ছিল বলেই তো আজ জীবনে কিছু পেয়েছি। পরিচয়, নাম, যশ, তোদের মতো চেলা-চামুণ্ডা।

চামুণ্ডিও আছে।

তা ঠিক। তাঁর দয়া না থাকলে কিছুই হয় না। পুরুষকার দরকার, খুবই দরকার। কিন্তু শুধুই পুরুষকারে কিছুই পাওয়া যায় না।

তারপর বলল, এসব কথা তোর বয়সে বুঝবি না। অতি-সপ্রতিভ নিরীশ্বরবাদীদের জীবনভর অনেকেই শিখতে হয়। যদি শেখার মতো মন তাদের থাকে। এসব বোধ চট করে ভিতরে আসে না। যদি তোর আধার ভাল না হয় তবে ঈশ্বরবোধ যে কী জিনিস তা তুই সারাজীবনেও বুঝতেই পারবি না। সকলের সব কিছু হয় না। যাদের হল, তারা ভাগ্যবান, যাদের হল না তারা অভাগা। বিজ্ঞানের সঙ্গেও ঈশ্বরের কোনও বিরোধ নেই, যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ নয় তাঁরাই ভাবেন যে বিরোধ আছে।

তারপর বলল, তোর সিনহা সাহেবকে মনে আছে?

কোন সিনহা সাহেব?

ছত্রিশগড়ের গর্ভনর। আমরা না তাঁর অতিথি হয়েই ছত্রিশগড়ে গিয়েছিলাম গত বছর। ইন্দ্রাবতী প্রপাতে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মোটরকেড নিয়ে। মনে নেই?

মনে আবার নেই। আমাদের সঙ্গে নাগপুরের প্রদীপ গাঙ্গুলি কাকু, রায়পুরের প্রদীপ মৈত্র কাকুরা সব ছিলেন।

হ্যাঁ। সিনহা সাহেব তো আগে বিহারের আই. জি. পুলিশ ছিলেন। এখনও তাঁর খুব সম্মান বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে। ওঁকেই কাল রাতে ফোন করেছিলাম ঝাড়খণ্ডের ডি. জি. পি-কে বলে দিতে। ডি. জি. পি. হাজারিবাগের এস. পি.-কে বলে রাখবেন যাতে আমাদের যা সাহায্য লাগে তা পাওয়া যায় নির্বিঘ্নে।

তুমি কি রহস্যর সমাধান করে ফেলেছ? ঋজুদা।

পাইপের পোড়া টোব্যাকো বাইরে খুঁচিয়ে ফেলতে ফেলতে ঋজুদা বলল, অলমোস্ট। তবে আমি তো আর খুনি বা খুনির মদতকারীদের অ্যারেস্ট করতে পারব না। পুলিশকে সব ক্লু দেব। ভীষ্মনারায়ণের সব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদেরও দেব। তারপর পুলিশ সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করে চার্জ ফ্রেম করবে। এ ব্যাপারে আত্মীয়রা যতটুকু পারেন সাহায্য করবেন পুলিশকে। সেই জন্যেই ইচ্ছা আছে হাজারিবাগ থেকে টুটিলাওয়া সীমারিয়া বাঘড়া মোড় হয়ে চান্দোয়া হয়ে রাঁচি চলে

যাব। সেখানে ডি. জি. পি.-র সঙ্গে দেখা করে ও বীরুর সঙ্গে আড্ডা মেরে পরদিন ভোরে বেরিয়ে বিকেলে কলকাতাতে এসে পৌঁছব।

কোথায় উঠবে রাঁচিতে? বি. এন. আর.-এ?

এখন এস. ই. আর.। কিন্তু সে হোটেল আগের মতো আর নেই। আমরা উঠব অশোকাতে। আই. টি. ডি. সি-র হোটেল। হাইকোর্টের কাছেই। নিরিবিলি। এবং ভাল।

## ৭

হাজারিবাগের পুলিশ সাহেবের বাড়ি ক্যানারি হিল রোড আর সার্কিট হাউসের রাস্তার মোড়ে।

ঋজুদা বলল, পুরনো বাড়িটার অনেক রদবদল হয়েছে। পঞ্চাশ বছরেরও আগে আমার বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জির বাবা এই বাড়িতে থাকতেন। হাজারিবাগের এস. পি. ছিলেন। তখন হাজারিবাগ মস্ত জেলা ছিল—গিরিডি, কোডারমা, চাতরা সবই হাজারিবাগের মধ্যে ছিল।

আমরা যেতেই পুলিশ সাহেব মি. রাওয়াল বেরিয়ে এলেন। লন-এ সামিয়ানার মতো তাঁবু খাটানো।

আমাদের ছেলেবেলাতেও এসবই দেখেছি। বুঝলি।

ঋজুদা বলল।

উনি চা-বিস্কিট খাইয়ে বলেছিলেন, কোতোয়ালিতে যখন দরকার পড়বে তখনই আসবেন। এখন সময় নষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। আমার মোবাইলেই ফোন করবেন। যদি সুইচ-অফ্‌ফ করা থাকে তবে বড় দারোগার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। তাঁকে করবেন। তাঁকে সব বলা আছে। কোনও অসুবিধে হবে না।

ঋজুদা বলল, একটা উপকার করতে হবে। এখন ডি. এফ. ও. কাজমি সাহেবের কাছে আমি গেলেই উনি আটকে দেবেন। বিরিয়ানি না খাইয়েই ছাড়বেন না। আপনি বাঁচান। ওঁকে খবর দিয়ে দিতে হবে যে আমি এসে গেছি—পিতিজ বাংলোতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব। ওঁর সঙ্গে কাল কথা বলব মোবাইলে।

ঠিক আছে। বলে দেব। বাই অল মিনস। বললেন, রাওয়াল সাহেব।

আমরা ওঁর বাংলো ছেড়ে পিতিজ-এর দিকে এগোলাম।

গরম জলে চান করে জামাকাপড় বদলে বাইরের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছি। মুগের ডালের খিচুড়ি ফিনফিনে করে কাটা আলু আর মুরগি ভাজা হচ্ছে বাবুর্চিখানাতে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ভটকাইটা থাকলে আমরা সকলেই

নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে মিস করছি। আমি গরম কফির কাপ নিয়ে বসে হাত গরম করছি আর ঋজুদার হাতে কনিয়াকের গ্লাস। ভি. এস. ও. পি.। তবে ব্রান্ডি গ্লাস-টাস এখানে নেই। চা কফির গ্লাসেই ঢেলে নিয়েছে ঋজুদা।

আগে ঋজুদা এসব খেত না। গত বছর দু-তিন হল দেখছি একটু খায়। বলে, বুঝলি রুদ্র, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ঠেকনার দরকার হয়।

আমি জানি, এসব বাজে কথা। বুড়ো কখনওই হবে না ঋজুদা। ইচ্ছে হচ্ছে খাচ্ছে, তার আবার এত বাহানা কেন? যখন ইচ্ছে হবে না, খাবে না।

ভাল ঠান্ডা বাইরে। তা ছাড়া, নদীর একেবারে উপরেই বাংলোটা। ঠান্ডাটা বেশি লাগে সে জন্যে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। আকাশ ভর্তি তারা। বারান্দার লণ্ঠনটা ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছে ঋজুদা। নদীর এপার থেকে একটি নাইটজার ডাকছে আর ওপার থেকে সাড়া দিচ্ছে তার দোসর। নদীর বুকের উপর দিয়ে একজোড়া ডিড ড্যু ড্যু ইট পাখি চমকে চমকে ডাকতে ডাকতে বাঁ থেকে ডাইনে উড়ে যাচ্ছে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে। অন্ধকারে তাদের ঝুলন্ত পা দুটিকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তাদের ডাকে নদীর জলও যেন চমকে উঠে চলকে যাচ্ছে।

ঋজুদা বলল, রান্না হলে তাড়াতাড়ি খেয়ে কম্বলের তলায় যাব। বুঝলি। কাল সকাল সকাল বেরোব। ফাগুয়ারা ভিলার আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করে ব্রেকফাস্ট-এর সময়ে ফাগুয়ারা ভিলাতে ঢুকে কন্দর্পনারায়ণকে চমকে দেব। তারপর জমিয়ে ব্রেকফাস্ট করব।

তারপর বলল, খাওয়ার কথা উঠলেই ভটকাইয়ের কথা মনে আসে।

—কী ব্রেকফাস্ট করবে?

গরম গরম পরোটা, আলুর চোকা, আঁওলার আচার, বেগুন ভাজা-ঘি চপ চপ। আর রাবড়ি। ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কপালে কী জোটে!

ঘুম ভাঙল এক জোড়া র‍্যাকেট-টেইলড় ড্রঙ্গোর ধাতব আওয়াজে। ভারী ঝগড়া করে পাখিগুলো।

মুখ হাত ধুয়ে দু কাপ করে গরম চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। চা-এর ব্যাপারে ঋজুদা আর তিতির খুবই খুঁতখুঁতে। ঋজুদা যেখানেই যায় নিজের দার্জিলিং অরেঞ্জ পিকো চা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলে না। তিতিরও ওই চায়ের ভক্ত। আমি আর ভটকাইও ওঁদের সঙ্গগুণেই কন্যোসার হয়ে গেছি।

গাড়িটা করেই বেরোলাম। আমাদের রাইফেল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সব গাড়িতেই তুলে নিলাম। আমাদের উপরে হয়তো এক বা একাধিক মানুষে লক্ষ রাখবেন। থানা থেকেই যে আমাদের আসার খবরটা রি-বাউন্ড করে আমরা এখানে পৌঁছবার আগেই এসে পৌঁছয়নি তাও বলা যায় না। আজকাল ডি. জি. পি., আই. জি., এস. পি. কারওকে জানাটাই যথেষ্ট নয়। শুধু পুলিশই নয়, সব

সরকারি দপ্তরেই ঘুন ধরে গেছে। তাই গাড়ির মধ্যেই সব কিছু রইল। দুজনের পিস্তল আছে কোমরে। সব সময়ের সঙ্গী।

গত রাতে ঋজুদা চৌকিদারের সঙ্গে অনেক গল্প করছিল। নেহাত গল্প করার জন্যেই নয়, খবর জোগাড় করার জন্যেও। স্থানীয় প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকেই নানা খবর পাওয়া যেতে পারে। সেগুলোকে ঝাড়াই বাছাই করে নিতে হয়। চৌকিদারের চেলা রান্না করছিল আর চৌকিদার আমাদের কম্পানি দিচ্ছিল। ঋজুদার প্রশ্নর উত্তরে সে বলল, এখানে, মানে এই অঞ্চলে দুটি টাট্টু ঘোড়া আছে। একটা মুনতাজার আলির অন্যটা ফাগুয়ারা ভিলার।

ফাগুয়ারা ভিলাতে টাট্টু ঘোড়া আছে? কোথায় থাকে?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

ভিলার পেছন দিকে আস্তাবল আছে। আগে বড় বড় দুটো উইলার ঘোড়া ছিল। রাজাবাবুর আমলে।

'উইলার' মানে 'ওয়েলার' বুঝলাম। নামী ইংলিশ ঘোড়া।

চৌকিদার বলল, হাজারিবাগের মস্ত বড়লোক টুটু ইমাম তাদের নিয়ে নিলেন। টুটু ইমাম সাহেবের অনেক রেসের ঘোড়া ছিল এক সময়ে। ফাগুয়ারা ভিলাতে এখন ঘোড়া নেই ওই টাট্টুটা আছে। ফাগুয়ারা ভিলাতে মেহমানদের বাচ্চা-টাচ্চারা এলে চড়ানো হয় তাদের। ভিলার কেউ চড়ে কিনা বলতে পারব না।

মুনতাজার চড়ে?

হ্যাঁ। সেই তো এখানকার মাস্তান। সে কীসে না চড়ে! মোটর সাইকেল আছে, সাইকেল আছে, ঘোড়াভি আছে। তবে সে নিজের টাট্টুতে চড়ে, ফাগুয়ারা ভিলার টাট্টু নয়।

ছেলেটা কেমন?

খতরনাক। আরও বেশি বাড় বেড়েছে বড় রাজকুমারের জন্যে। খুব আহ্লাদ দেন তিনি। আজ নয়, বচপন থেকে। নিজের তো ছেলেমেয়ে নেই। যত পেয়ার-দুলহার সব এই অপোগণ্ডর উপরে।

চৌকিদারের নাম, রজব আলি। সে গলা নামিয়ে বলল, মুনতাজারের কথা আর বেশি আলোচনা না করাই ভাল। ওর চর আছে চতুর্দিকে। কিছুদিন হল ও এমন এমন সব মানুষের সঙ্গে মিশছে যে ওকে ভয় করি আমরা।

তারা কারা?

স্থানীয় লোক নয়। আনজান জায়গা থেকে আসে। জিপে করে, মোটর সাইকেলে করে। মুনতাজারকে আমরা তাই এড়িয়ে চলি। বম্বে সিনেমার ভিলেইনের মতো ও যা-খুশি তাই করে। এর মেয়ে ওর বউ উঠিয়ে নিয়ে যায়, এর মোরগা তার মকরি।

এখানে হিন্দি সিনেমা তোমরা কোথায় দেখো?

পাঞ্চায়েতে কালার টিভি আছে। সেখানেই দেখি। নমাসে ছমাসে হাজারিবাগ

শহরে গেলে শহরের হলেভি দেখে আসি।

হুঁ।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, এই টিভি আর বলিউড-এর সিনেমাই ভারতবর্ষের যা কিছু শাশ্বত ও ভালত্ব ছিল, যা কিছু ভারতীয়ত্ব তার প্রায় সবই নষ্ট করে দিল। খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানি এত বেড়ে গেছে চারদিকে এই জন্যে। তা ছাড়া লোভ? লোভ ঢুকে গেছে অরণ্যে পর্বতে। মানুষ, কোনও মানুষই আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়। সকলেরই সব চাই। এই 'সব'-এ তার সত্যিই প্রয়োজন আছে কি নেই, এসব কেউ ভাবে না।

তারপরে বলল, বার্ট্রান্ড রাসেলের একটা কথা আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে, বুঝলি।

কী কথা?

'উই ডু নট স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স, উই স্ট্রাগল টু আউটশাইন আওয়ার নেবার্স।' এই কথার সত্য শহরের বাসিন্দাদের দেখে রোজই মনে হয়। এই সব জঙ্গলে-গ্রামে ওই দৌড় অতখানি তীব্র হয়ে ওঠেনি এখনও। তবে ভবিষ্যতে হয়তো হবে। হয়তো কেন, অবশ্যই হবে। এখন এদের চোখও লোভে চকচক করে।

ঋজুদা বলল, চল আগেই যাই ফাগুয়ারা ভিলাতে। তারপরে ওখানের খবর-টবর জেনে চারধারে ঘুরে নেওয়া যাবে। নদীর পারের সেই পিপ্পলগাছের হাইড-আউটে তো এই ভারী গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। হেঁটেই যেতে হবে।

যাবে কি না একবার পরখ করে দেখাই যাক। Scorpion-এর এঞ্জিন যা ক্ষমতাসম্পন্ন তা জাহান্নমে গিয়ে জন্নত-এও ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে আমাদের।

তাহলে চল। তাই যাওয়া যাবে।

ফাগুয়ারা ভিলার গেটে গিয়ে হর্ন বাজাতে একটু পরে নেপালি দারোয়ান ছোট গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আগন্তুকদের পরিচয় জানতে এসেই আমাদের চিনে ফেলে স্যালুট করল।

ঋজুদা বলল, কন্দর্পনারায়ণবাবু হ্যায় ক্যা?

দারোয়ান জবাব দিতে দিতে উনি নিজেই চলে এলেন গেটের কাছে। জগিং স্যুট পরে জগিং শু পরে হাঁটছিলেন ভিলার হাতার মধ্যে। আমাদের দেখে ওঁর মুখ কালো হয়ে গেল মনে হল।

বললেন, কী ব্যাপার? সারা রাত গাড়ি চালিয়ে আসছেন না কি কলকাতা থেকে?

মনে করুন তাই। ঢুকতে দেবেন তো? খিদে পেয়েছে খুব। নাস্তা করব।

ততক্ষণে কন্দর্পনারায়ণ নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বললেন, বাহাদুর গেট খোলো। বলেই আমাদের পাইলট করে নিয়ে চললেন। ভিলার সামনে যেখানে

ভোরের রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে সেখানে সাদারঙা বেতের চেয়ার ও গোল টেবিল পাতা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। কন্দর্পনারায়ণ একজন খিতমদগারকে বললেন, চায়ে লাও, আর নাস্তা বানানে বোলো পাঁড়েজিকো।

গাড়ি পার্ক করে আমরা এসে চেয়ারে বসলাম। উনিও বসলেন। তারপর বললেন, এই গেলেন আবার না বলেকয়ে ফিরে এলেন, ব্যাপারটা কী? অ্যাই কওন হ্যায়? গাড়িসে সব সামান উতারো।

ঋজুদা বলল, না না, আমরা নাস্তা করেই চলে যাব। থাকব না। হাজারিবাগ শহর হয়ে রাঁচি যাব বাঘড়া মোড় হয়ে।

কেন? রামগড় হয়ে না কেন?

যা ট্রাফিক থাকে ওই রাস্তাতে। ঘোরা পথ হলেও সময় কম লাগবে।

কন্দর্পনারায়ণ এবারে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বললেন, বাত ক্যেয়া হ্যায় ঋজুবাবু? মার্ডারার কি পতা মিলা কি?

কাছাকাছি এসেছি কন্দর্পবাবু। আপনি এত করে অনুরোধ করলেন, আর এত গোয়েন্দা থাকতে করলেন আমাকেই! আমাকেই যে কেন করলেন তা নিয়েও ভেবেছি।

ভেবে কী বের করলেন?

এখনও পারিনি।

বলেই বলল, মি. শর্মাকে একবার ডাকবেন? আর মুনতাজার কি আছে এখন বস্তিতে? থাকলে, তাকেও একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতাম।

মুনতাজার ছিল কিন্তু গতকালই বম্বে মেইল ভায়া ইলাহাবাদ ধরে মুম্বাই চলে গেছে।

কোন স্টেশান থেকে ধরল ট্রেন?

কেন? কোডারমা।

তারপরে বললেন, আপনার সন্দেহ আছে নাকি?

না। আমার ইনফরমেশান, ও গয়া থেকে ট্রেন ধরেছে।

তাই? সে কি? কে আপনাকে বলল?

গোয়েন্দারা কি ইনফরমারের আইডেনটিটিটা ডিসক্লোজ করে? কে বলেছে, তা বলব না।

তাজ্জব কি বাত।

অবাক হয়ে বললেন কন্দর্পনারায়ণ। তারপর বললেন, মি. শর্মার সঙ্গে কী কাজ পড়ল?

তিনি এলেই জানবেন। আপনার আড়ালে বলার মতো কোনও কথা নেই।

কন্দর্পনারায়ণ ভিতরে খবর পাঠালেন মি. শর্মাকে ডাকতে।

ঋজুদা বলল, ভদ্রলোক কি খুব ওয়েল-অফ্‌ফ? কিন্তু এতই যদি ভাল অবস্থা হবে তাহলে এই জঙ্গলে কিচেন ম্যানেজারি করছেন কেন?

ভাল অবস্থা নয় তবে জঙ্গল খুব ভালবাসে। কে কী করে, কেন করে তা কি এত স্বল্প পরিচয়ে জানা যায় ঋজুবাবু।

ভাল অবস্থা না হলে বিদেশে কেউ বেড়াতে যেতে পারেন?

ও। আপনি তাও জানেন দেখছি।

ওঁর টিকিট কি আপনিই কেটে দিয়েছেন?

ওই! ইকনমি ক্লাস-এর টিকিট। স্টেটসে আমার এক বন্ধুর কাছে উঠবে তারপর সে-ই একটু ঘুরিয়ে দেবে এদিক-ওদিক। গ্রেহাউন্ড-এ করেও যেতে পারে। তা ছাড়া বিজনেস অ্যাসোসিয়েটসও তো আছে কিছু আমার।

তা তো থাকবেই।

ধুতির ওপরে সবুজ-রঙা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর তার উপরে হলুদ-রঙা একটি আলোয়ান গায়ে দিয়ে পায়ে বাথরুম স্লিপার গলিয়ে মি. শর্মা এলেন। ওঁর স্যুট পরা চেহারাটাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম আমরা। তাই এই পোশাকে দেখে একটু অবাক হলাম।

শর্মাসাহেব বললেন, নমস্তেজি!

ঋজুদা বলল, নমস্তে নমস্তে। আসুন বসুন।

উনি বসতে চাইছিলেন না কিন্তু কন্দর্পনারায়ণের চোখের ইঙ্গিতে বসলেন।

ঋজুদা বললেন, রিসেন্ট কার্ড আছে আপনার কাছে?

কীসের কার্ড?

চমকে উঠে বললেন, মি. শর্মা।

শর্মাসাহেব যেমন অবাক হলেন প্রশ্নটা শুনে আমরা সকলেও কম অবাক হলাম না।

ঋজুদা বলল, টার্গেট কার্ড।

শর্মাসাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপনি জানলেন কী করে।

আমাদের অনেক কিছু জানতে হয়।

তারপর বলল, এই জঙ্গল ছাড়াও, গুমিয়ার ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস কোম্পানির শুটিং রেঞ্জেও কি প্র্যাকটিস করেন?

প্র্যাকটিস আর কী? ওঁদের ইয়ারলি চ্যাম্পিয়ানশিপের আগে একটু হাতটা ঠিক করে নিই। ওই।

তারপরে বললেন, গুমিয়ার রাইফেল ক্লাবের কথা জানলেন কী করে আপনি?

ওই ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। ওই রেঞ্জে পিস্তলও ছুড়েছি বহুবার যদিও প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করিনি। আপনাদের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট সুব্রত চ্যাটার্জি ছিলেন না?

তা বলতে পারব না। তখন আমি মুম্বাইতে কেটারিং পড়তে গিয়েছিলাম।

ও। তাহলে দেখান না শেষ কার্ড দু-একটা।

শর্মাসাহেব উঠে গেলেন মুখ গোঁজ করে।

কন্দর্পনারায়ণ বললেন, তাজ্জব কি বাত।

ঋজুদা বলল, তাজ্জবের কী আছে? রাইফেলে মি. শর্মার হাত যে ভাল তা কি আপনি জানেন না? না জানলে, প্র্যাকটিসের জন্যে অত কার্ট্রিজ আপনি প্রতি বছর কলকাতার দোকান থেকে ওঠাতেন?

অন্য গুলির সঙ্গে ওঠাতাম। আমি অত জানব কী করে। শিকারও করি না শিকারের মাংসও খাই না। এরা যেমন যেমন চায় তেমন তেমন পাঠিয়েছি। তা ছাড়া পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের গুলির দাম তো সবচেয়ে সস্তাও।

তা ঠিক।

শর্মাসাহেব দুটি কার্ড নিয়ে এলেন। ঋজুদা হাতে নিয়েই একটু উপরে তুলে বলল, চমৎকার। তারপর আমাকে দিয়ে বলল, দ্যাখ।

দেখলাম, বুলস আই-এর টাকার মতো কালো জায়গাটা একেবারে ফুটো হয়ে গেছে।

ঋজুদা বলল, আপনার তো ন্যাশনালে যাওয়া উচিত। এত ভাল পাঞ্চ করেছেন কার্ড। তাও স্পোর্টিং রাইফেল দিয়ে, ম্যাচ রাইফেল দিয়ে নয়।

না। ম্যাচ রাইফেল কোথায় পাব।

চমৎকার। কনগ্রাচুলেশানস মি. শর্মা।

তারপরই বলল, কন্দর্পনারায়ণের দিকে ফিরে, আমরা একটু রোদে পিকনিক করব। আপনাদের এখানে শতরঞ্জি হবে একটা? রাতেই ফেরত দিয়ে যাব। অথবা বিকেলেই। নিজেরা না আসতে পারলে পাঠিয়ে দেব কাউকে দিয়ে।

কন্দর্পনারায়ণ বললেন, শতরঞ্জি কি হবে? কী শর্মা হবে কি?

শর্মাজি বললেন, একটিই আছে।

আনতে বলুন তাহলে।

জি হাঁ।

শর্মা সাহেব চলে গেলে ঋজুদা বলল, কার্ড কখনও পাঞ্চ করেছিস?

না তো!

আমি বললাম।

এই দ্যাখ, মধ্যের এটাকে বলে বুলস আই। তা তো জানিসই বোধহয়, লেম্যানরাও জানে। তারপরে যে সার্কেলটা, সেটার নাম 'ইনার'। তারও পরে যে বৃত্ত সেটার নাম 'ম্যাগপাই' আর সবচেয়ে বাইরে যে বৃত্ত তার নাম 'আউটার'। বুলস আই-তেই যে শর্মা সাহেবের গুলিগুলো লেগেছিল শুধু তাই-ই নয়, কোনও কোনও গুলি একটার ঘাড়ে আরেকটা পড়েছে, মানে, ফুটো দিয়ে গলে গেছে।

আমি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম।

এই জঙ্গলে বসে কিচেন ম্যানেজারি করে রাইফেলের হাত এইরকম রাখা মস্ত বাহাদুরি বলতে হবে।

তিব্বর বটের বগারি মারেন হয়তো সালভর, যখন যা পাওয়া যায়—এমনি

করেই হাত ঠিক রেখেছেন।

বললাম, গুমিয়ার সুব্রত চ্যাটার্জি মানে তোমার বন্ধু? সেই গোপালদা-সুব্রতদা-নাজিম সাহেব?

ইয়েস। সুব্রত ও গোপাল দুজনেই চলে গেছে। নাজিম সাহেব তো কবেই গেছেন।

শর্মাসাহেব ফিরে এলেন একজন খিতমদগারের হাতে শতরঞ্জি দিয়ে। দেখলাম সবুজ-রঙা একটি শতরঞ্জি, সেই পিপ্পলগাছের উপরের মাচার উপরে যেটা ছিল। ঋজুদার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল।

ঋজুদা বলল, বাঃ ফারস্ট ক্লাস। এখান থেকে যাওয়ার সময়ে গাড়িতে তুলে নিস রুদ্র।

কন্দর্পনারায়ণের মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

উনি শর্মাসাহেবকে বললেন, আপনি গিয়ে নাস্তা লাগানোর বন্দোবস্ত করুন তাড়াতাড়ি। উনি চাইছিলেন না যে শর্মাসাহেব আর বেশিক্ষণ আমাদের সামনে থাকুন।

ঋজুদা কন্দর্পনারায়ণকে বললেন, রহস্যটা সমাধান প্রায় করেই ফেলেছি। আপনার মেজভাই ভীষ্মনারায়ণকে আততায়ী রাইফেল দিয়ে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু যে রাইফেল দিয়ে মেরেছে সেটা পয়েন্ট থ্রি ফিফটিন—ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স এর।

আমি অবাক হয়ে ঋজুদার মুখে চেয়ে রইলাম।

তারপরই বলল, আপনার কি কারওকে সন্দেহ হয়?

চমকে উঠে কন্দর্পনারায়ণ বললেন, আমার?

তারপরই সামলে নিয়ে বললেন থ্রি ফিফটিন রাইফেল দিয়ে কেউ গুলি করে থাকলে একজনকেই সন্দেহ হতে পারে।

কে সে?

মুনতাজার আলি। তাকে আমি থ্রি ফিফটিন রাইফেল কিনে দিই একটা। সেই রাইফেল দিয়ে সে যে আমার ভায়েরই রক্তপাত ঘটাবে তা জানব কী করে। আপনি রাইফেলের বোরের কথা না বললে তো আমি বুঝতেই পারতাম না। বড় বিচিত্র এ সংসার। মুনতাজারকে এ বাড়ির কেউই দেখতে পারে না। আমিই শিশুকাল থেকে প্রশ্রয় দিয়ে এই দৈত্য বানিয়েছি। নানারকম মাস্তানির জন্যে মানুষে আমাকে দোষ দেয় এখন যদি তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে ভীষ্মনারায়ণের মার্ডারের চার্জে, লোকে এবং আমার পরিবারের মানুষেরাই বা কী ভাববে?

কী আর ভাববে। ভাববে আপনিই তাকে ভীষ্মনারায়ণকে মারতে প্ররোচিত করেছেন।

ভাববে কি না বলুন!

মুখে উনি এ কথা বললেন বটে ওঁকে একটুক্ষণ আগের তুলনাতে বেশ উৎফুল্ল

দেখাচ্ছিল। হাঁক ছাড়লেন হঠাৎ জোরে, আরে নাস্তাকা ক্যা হুয়ারে। আরে রে রামখিলাওন।

ভিতর থেকে পাঁড়েজি চিৎকার করে বলল, বন গ্যয়া হুজৌর। ঔর ফ্রিফ পাঁচ মিনট।

পাঁড়েজির নামই কি রামখিলাওন পাঁড়ে? বোঝা গেল না ঠিক। তবে গলার স্বরটা অবশ্য তেমনই মনে হল।

ভাল করে নাস্তা করার পরে কন্দর্পনারায়ণের কাছে বিদায় দিয়ে আমরা বেরোলাম। ঋজুদা বলল, শতরঞ্জিটা নিয়ে চল। আমি শতরঞ্জিটাকে Scorpion-এর পেছনে তুলে নিলাম।

কন্দর্পনারায়ণ বললেন, কলকাতাতে কবে দেখা করব আপনার সঙ্গে?

আপনি কবে ফিরবেন? যেদিন ফিরবেন সেদিনই বিকেলে ফোন করবেন একটা। কবে ফিরবেন?

কথা তো আছে পরশু।

ঠিক আছে। আপনার সময়মতো আসুন। ততদিনে বোধহয় ফ্যায়সালা একটা হবে। মুনতাজারের বিরুদ্ধে কেসটা তৈরি করতে মানে চার্জ ফ্রেম করতে আপনার অনেক সাহায্যর দরকার হবে।

ঠিক আছে।

ফাগুয়ারা ভিলার বাইরে বেরিয়ে আমি বললাম, সেই পিপ্পলগাছের কাছে যাব কি?

আমিই চালাচ্ছিলাম গাড়ি।

না তার দরকার নেই। শতরঞ্জিটাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। পুলিশের স্নিফার ডগকে শতরঞ্জির গন্ধ ভাল করে শুঁকিয়ে দিলে তারাই শর্মাকে ধরবে ফাগুয়ারা ভিলাতে তাদের নিয়ে এলে। বাকিটা ফরেনসিক এক্সপার্টরা করবেন।

এবারে কোন দিকে যাব?

পিতিজ বাংলোতে। একবার চেক করে নে কিছু ফেলে গেলাম কিনা। তোয়ালে দুটো টগর গাছের উপরে মেলে দেওয়া আছে সে দুটোকে তুলে নিতে হবে।

তারপর?

তারপর কোতোয়ালিতে গিয়ে শতরঞ্জিটা জিম্মা দিতে হবে এবং এস. পি-র সঙ্গে কথা বলতে হবে।

তারপর?

তারপর টুটিলাওয়া সীমারিয়া বাঘড়া মোড় হয়ে চান্দোয়া টোরি হয়ে কুরু হয়ে বিজুপাড়া হয়ে রাঁচি। কোতোয়ালি থেকে বেরিয়ে বীরুকে একটা ফোন করতে হবে।

আমি পিতিজ বাংলোতে গিয়ে তোয়ালে দুটো গাড়ির পেছনে তুলে নিলাম। শুকিয়ে গেছিল ততক্ষণে। চৌকিদার ও তার চেলাকে বকশিস দিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, দুজনকেই দিয়েছিস তো?

হ্যাঁ।

বড় পাত্তি।

হ্যাঁ।

কোন বড় পাত্তি?

পাঁচের।

ঠিক হ্যাঁ।

এই বকশিসের ব্যাপারে ঋজুদার মতো উদার-হস্ত খুব কম মানুষকেই জানি। ঋজুদা বলে, গরিব দেশ আমাদের—স্যোশালিস্ট হবার এমন সহজ পথ আর নেই। Always from the Haves to the Have nots! আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা এত ভাল যে, সোনা দিয়ে এদের ওজন করলেও তুল্যমূল্য হয় না।

চৌকিদারদের সেলাম আর থামে না। এ জীবনে এক রাত থাকা বাবু অন্য কেউ পাঁচশো টাকার পদ্মফুলের রঙের নোট আর কখনও দিয়েছেন বা দেবেন এমন আশা ওরা কখনওই করেনি।

গাড়িটা হাজারিবাগমুখো করে বললাম, ঋজুদা এবার summing-up করো। আর প্রতীক্ষা সহ্য হয় না। আমিই তোমার সবচেয়ে পুরনো সাগরেদ—তাই সিনিয়রিটি বিচার করলেও আমাকেই সবচেয়ে আগে কনফিডেন্সে নেওয়া উচিত।

ঋজুদা বলল, দাঁড়া! পাইপটা ভাল করে ধরিয়ে নি।

তা ধরাও কিন্তু জানালা খুলো না। বড় ঠান্ডা হাওয়াটা।

তুই প্যাসিভ স্মোকিং করবি?

তা না হয় একটু করলামই। তোমার গোল্ডব্লক টোব্যাকোর গন্ধটা আমার ভারী ভাল লাগে।

পাইপটা ধরিয়ে ভাল করে এক টান লাগিয়ে ঋজুদা বলল, কী জানতে চাস বল?

মাচাতে থ্রি-ফিফটিন রাইফেলের গুলি পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও শর্মাসাহেবই পয়েন্ট টু-টু দিয়ে ভীষ্মনারায়ণকে মেরেছেন এমন তুমি ভাবলে কেন?

কন্দর্পনারায়ণের চাল ওটা। উনি এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু করতে গিয়ে ওভার কনফিডেন্ট হয়ে গেছিলেন যে জন্যে এই বিভ্রাট। উনি নিশ্চয়ই মুনতাজারের কাছ থেকে থ্রি ফিফটিন-এর এম্পটি কাট্রিজ চেয়ে নিয়েছিলেন একটি বা একাধিক। শর্মাও চাইতে পারে কন্দর্পনারায়ণের নির্দেশে।

—কী বলে চাইলেন?

—সে কত কিছু বলে চাওয়া যায়। বাচ্চারা খেলবে বা তাবিজ বা মাদুলি বানাবেন। তা ছাড়া, যিনি রাইফেলটাই প্রেজেন্ট করেছেন এবং গুলিও সাপ্লাই করেন তিনি চাইলে না দেওয়ার কী আছে?

কিন্তু আমিই ভেবে দেখলাম অত দূর থেকে থ্রি ফিফটিন রাইফেল দিয়ে অমন

স্নাইপিং করা প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া টেলিফোটো লেন্স তো ছিল না।

ছিল না যে তা তুমি জানলে কী করে?

বলতে পারিস, আন্দাজেই কিছু হ্যাজার্ডাস গেসস তো করতে হয়ই। পরে অবশ্য ভটচার্যি সাহেব পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং ফরেনসিক টেস্টের রিপোর্ট-এ পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের ব্যাপারটা কনফার্ম করলেন। বুলেট দেখেই ওরা জানতে পেরেছিলেন।

বলেই বলল, কন্দর্প, এই ডাইভার্সনটা মানে, ফোকরে শর্মাকে দিয়ে থ্রি ফিফটিনের এম্পটি শেল নিয়ে রাখাটা মারাত্মক চাল চেলেছিল। যে কোনও গোয়েন্দা এই গাড্ডায় পড়লে আর উঠতে পারত না। তুই যেমন পড়েছিলি! ভটকাইও। তিতির কিন্তু পড়েনি। মেয়েটা প্রচণ্ড ইন্টেলিজেন্ট যে এ কথা তোকে স্বীকার করতেই হবে।

সে কথা কি কখনও অস্বীকার করেছি? সব দিক দিয়েই ও আমাদের মধ্যে বেস্ট।

আমার বন্ধু জনসন সাহেব একটা কথা বলতেন।

কী কথা?

একটা কম্যুনিটি যখন ডুবে যেতে বসে তখন দেখা যায় মেয়েরা সব দিকে ভাল হয়ে উঠে আসছে আর ছেলেরা তলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাঙালি সমাজেও এখন তেমনই ঘটছে। আজকে বাঙালি মেয়েরা ছেলেদের দশ গোল দিয়ে যাচ্ছে জীবনের সমস্ত পরীক্ষাতে।

আমি চুপ করে রইলাম। মিনমিন করে বললাম, তা ঠিক।

শুধু ঠিকই নয়, বল, বিলকুল ঠিক।

বিলকুল ঠিক।

তারপর বললাম, কিন্তু কন্দর্পনারায়ণ তো জানতেনই যে থ্রি ফিফটিন রাইফেলের গুলি পেলে মুনতাজারকেই ফাঁসাবে পুলিশ।

জানতেনই তো। শুধু তাই-ই নয়, পুলিশ তো ওই কর্মটাই করত যদি না তুই এম্পটি শেলটা পকেটস্থ করতিস। কোতোয়ালিতে মোটা মোটা খামও দিয়ে রেখেছিল কন্দর্প ঘটনা ঘটার আগেই, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সে ভেবেছিল, আমার কানেকশানস সে তার অ্যাডভান্টেজেই লাগাবে কিন্তু তা যে তার বিপক্ষে চলে যাবে তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। আমরা কলকাতা থেকে ট্রেনে চড়বার দুদিন আগেই মার্ডারটা হয়েছিল এবং ফাগুয়ারা ভিলাতে এসে পুলিশ সুপারফিশ্যাল এনকোয়ারি করে চলেও গিয়েছিল। কিন্তু মেজভাই-এর মৃত্যুতে বড়র নির্বিকার থাকাটা ভাল দেখায় না বলেই কন্দর্পনারায়ণ লোক দেখানোর জন্যে গোয়েন্দা লাগানোর কথা ভেবেছিল।

শার্দুলনারায়ণকে জেরা করে জেরবার করেছিল নিশ্চয়ই। বেচারা মিশিরজিকেও রেয়াত করেনি।

কে?

পুলিশ।

তা তো হবেই। জেরবার তো চিরদিন নিরপরাধীরাই হয়।

মুনতাজারকে ফাঁসিয়ে লাভ কী হত কন্দর্পনারায়ণ-এর।

আমি বললাম।

মুনতাজার দৈত্যকে আর বোতলে ফেরাতে পারছিল না কন্দর্পনারায়ণ। মুনতাজার এবং রোজি মিলে কন্দর্পনারায়ণকে রীতিমতো নিংড়ে নিচ্ছিল। কন্দর্পনারায়ণ কলকাতাতে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে সেখানে টিভি সিরিয়ালের এক নায়িকাকে রেখেছে বছর দুই হল। মুনতাজার তা জানতে পেরে নিয়মিত ব্ল্যাকমেইল করছিল কন্দর্পনারায়ণকে। এমনকী সেই মেয়েটিকেও টেররাইজ করছিল।

তুমি জানলে কী করে।

এসব তথ্য রায়পুরে কন্দর্পনারায়ণের পরিবারের নানা মানুষ ও পরিচিতদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। তথ্যে ভুল নেই কোনও।

এই না তুমি বললে, মেয়েরা উঠে আসছে আর ছেলেরা তলিয়ে যাচ্ছে। টিভি সিরিয়ালের মেয়েটির বেলাতে কী হল?

ঠিকই বলেছি। যারাই উঠে আসে তারাই জানে উঠে আসার কত রকম হ্যাপা। একটি মেয়েকে দেখে তুই বিচার করতে পারিস না। একসেপশান প্রুভস দ্য রুল। এক-এক পেশার এক-এক রকম। দোষ দেওয়া উচিত নয়।

তারপর।

তাই শর্মাকে দিয়ে ভীষ্মনারায়ণকে মারিয়ে সেই হত্যার দায় মুনতাজারের উপরে চাপিয়ে দিয়ে কন্দর্পনারায়ণ এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। এবং সেই চেষ্টাতে প্রায় সফল হয়েও এসেছিল।

কিন্তু কন্দর্পকে পুলিশ ছোঁবে কী করে? তার তো এই হত্যাতে কোনও ইনভলভমেন্ট নেই।

নেই কী রে! অ্যাবেটমেন্টের দায়ে পড়বে না। শর্মাকে স্পেইনে বেরিয়ে আসার খরচ সে দেবে কেন? যৌথ মালিকানার পারিবারিক অবসর বিনোদনের ফাগুয়ারা ভিলা-র কিচেন ম্যানেজার তার এত প্রিয় হবে কেন?

স্টেটস নয়?

না স্টেটস নয়, স্পেইন।

আচ্ছা, মি. শর্মা কেন এমন কাজ করতে গেলেন?

অলিম্পিক দেখতে যাবে বলে—তাও ওর যাতে ইন্টারেস্ট—তাই দেখতে।

দেখতেই যাচ্ছে শুধু, রাইফেল, পিস্তল ও স্কিট আর ট্রাপ গান-শুটিং। এবারে অলিম্পিক কোথায় হচ্ছে?

স্পেইনের বার্সিলোনাতে। বার্সিলোনাতে সে যাচ্ছে, তার টিকিটও কাটা হয়ে

গেছে। স্টেটসে যাচ্ছে এ খবর ভুল। মিথ্যে করে বানানো। রাইফেল শুটিং শর্মার নেশা। নেশার জন্যে মানুষ কত অন্যায় কাজই না করে। অলিম্পিক দেখার সুযোগ ছাড়াও থোক ক্যাশ টাকাও নিশ্চয়ই পেয়েছে অথবা পাবে। শর্মা ব্যাচেলর। এই তার নেশা। নেশা তো নয়, নাশা।

শর্মা যে অলিম্পিক দেখতে যাচ্ছে তা জানলে কী করে তুমি!

ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে ক্রস ভেরিফাই করিয়েছি কলকাতার সি. বি. আই.-কে দিয়ে। ফোন করেছিলাম ইস্টার্ন জোনের ডিরেক্টরকে। কন্দর্পনারায়ণ কয়েকটা মস্ত ট্যাকটিকাল ভুল করেছিল। তার মধ্যে একটি তার নিজের কোম্পানির ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে মি. শর্মার ট্রাভেল অ্যারেঞ্জমেন্ট করানো। টিকিট, প্যাসেজ মানি, ক্যাশও দেওয়া হয়েছে। হোটেলের রিজার্ভেশানও করেছে তারই এজেন্ট। তারপর ফেরার পথে ব্যাংককও হয়ে আসবে শর্মা তিনদিনের জন্যে। এসব ভেরিফাই করে তারপরই আজ শর্মার সামনে এসেছি। তা ছাড়া সীতা ট্রাভেল এজেন্সির মিসেস হানসা প্যাটেলের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁর স্বামী নিরঞ্জনকে আমি বহুদিন হল চিনি।

বাবাঃ। এত তুমি করলে কখন?

মোবাইল ফোনের যুগে শুভ কর্ম বা অপকর্ম কিছু করতেই সময় লাগে না। যেমন কন্দর্পনারায়ণ যদি মোবাইলে তার চেলাদের বা মুনতাজারকেও বলে দেয় যে আমাদের হাজারিবাগের পথেই ওয়েলেইড করতে—মোটর সাইকেলে করে দুটো ছোঁড়া অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে পথেই আমাদের মেরে রেখে যেতে পারে।

তা অবশ্য ঠিক। এখন এ. কে. ফর্টিসেভেন নেই কার কাছে! আমরা তো আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি।

আমার গাড়ির কাচ অবশ্য বুলেট প্রুফ। মর্টার ছাড়া রাইফেলে সুবিধা কিছু করতে পারবে না।

সত্যি! এই ইনফরমেশান টেকনোলজির রমরমাতে ভাল যেমন হয়েছে খারাপও কম হয়নি। কী বলো?

আমি বললাম, ঋজুদাকে।

খারাপটাই বেশি হয়েছে ও হবে। যত দিন যাবে, ততই বোঝা যাবে।

এবারে বলো, ভীষ্মনারায়ণকে খুন করবার পেছনে কন্দর্পনারায়ণের মোটিভ কী?

আমি বললাম ঋজুদাকে। এটা আমার মাথাতেই আসছে না।

এক কথাতে বলব?

বলো।

ঈর্ষা।

বলো কি? গুণী মানী ছোটভায়ের উপরে দাদার ঈর্ষা এরকম চেহারাও নিতে পারে।

দেখলিই তো যে নিয়েছে। এত টাকার মালিক হয়েও মেজভাইয়ের পৃথিবীব্যাপী যশ ও সম্মান, আত্মীয়স্বজনের কাছে সমাদর, টিভি এবং নানা মিডিয়াতে লাগাতার এক্সপোজার এসবে পাগলা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত অবস্থা হয়েছিল কন্দর্পনারায়ণের। সংসারে আজকাল টাকা থাকলেই মান পাওয়া যায়। কিন্তু সেই মানের একটা সীমা আছে—একটা বিশেষ উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছানো যায় টাকা নিয়ে। কিন্তু তারপর টাকার কোনও দামই থাকে না।

ভীষ্মনারায়ণ কিন্তু এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। দাদাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিও করতেন, দাদা বলেই, তাঁর দোষগুণ বিচার না করেই পায়ে হাত দিয়ে হোলি ও দিওয়ালিতে প্রণাম করতেন। তিনি যে বিশেষ মানী মানুষ এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না আদৌ এবং এ কারণে তাঁর আত্মীয়স্বজন চেনাপরিচিতিরা তাঁকে আরও শ্রদ্ধা করতেন। আর এসবই অসহ্য লাগত কন্দর্পনারায়ণের। তিনি বড়ভাই হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয়রা, এমনকি নিজের অন্য ভায়েরাও ভীষ্মনারায়ণের কাছেই উপদেশ আদেশের জন্যে আসতেন।

আমি বললাম, ভাবা যায় না। ঈর্ষা মানুষকে এত নীচে নামাতে পারে?

পারে বইকী। ঈর্ষা তো ছয় রিপুর এক রিপু।

তাই?

নয়? মাৎসর্য। মাৎসর্য তো ঈর্ষারই এক নাম। মাৎসর্য হচ্ছে 'পরগুণদ্বেষ'।

মাইকেলের ভাষায় 'বিষদশন'।

আচ্ছা ঋজুদা, তুমি যে এই অ্যাডভেঞ্চার বা গোয়েন্দাগিরি করো এবং আমাদেরও তোমার সাগরেদ করো এতে কি তুমি আনন্দ পাও?

কেন? তোরা পাস না?

আমরা পাই, কিন্তু মনে হয়, মানে না বুঝে পাই। মানে, তাৎপর্য না বুঝে।

ঋজুদা হেসে ফেলল আমার কথা শুনে।

তারপর বলল, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই যে আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা—এর দামও তো বড় কম নয়। জোসেফ ম্যাটসিনির সেই কথা আছে না? 'যখন তুমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করবে, তখনই তুমি কর্তব্যভ্রষ্ট হবে।' উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'মম্যুরসি মন্যং ময়ি ধেহি'।

তারপর বলল, অত দূরে যাবার দরকার কী আমাদের, হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথ থাকতে?

'...ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

—'নৈবেদ্য'-র কবিতা।

তারপর বলল, রবীন্দ্রনাথ পড় ভাল করে রুদ্র তোরা রবীন্দ্রনাথ পড়।

অনেকেই যে আজকাল বলছে শুনি, রবীন্দ্রনাথ ফালতু, রবীন্দ্রসংগীত অশ্রাব্য।

বলছে বুঝি? তা বলুক। এরা সব 'আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।' জীবনানন্দের লাইন মনে পড়ে গেল।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলল, বুঝলি রুদ্র, জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতার সীমা কোনওদিনই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় থাক, জীবনে তরে যাবি।

# ছোটিডোঙ্গরির চিতা

সূর্য ডোবার দেরি আছে তখনও ঘণ্টাখানেক। আমরা একটা শালগাছের দুদিকে বসে আছি। এমন কখনও আগে করিনি কোথাওই শিকারে গিয়ে। একই গাছে উত্তরমুখো মাচাতে বসেছি আমি আর দক্ষিণদিকের মাচাতে বসেছে ঋজুদা। ডোঙ্গাজারি পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ঋজুদা যেদিকে বসেছে সেইদিক থেকে আর ছোটিডোঙ্গরির বনবাংলোটা দেখা যাচ্ছে আমি যেদিকে বসেছি সেদিক থেকে। ছোটিডোঙ্গরির বাংলোটা ছোট। অবুঝমারের দিকে যেতে এইটাই সম্ভবত শেষ বাংলো ছত্তিশগড় বনবিভাগের। এখন ছত্তিশগড়ের। আগে ছিল মধ্যপ্রদেশের। সেই অবুঝমার যেখানে বাইসন-হর্ন মারিয়াদের বাস। এখনও অবুঝমারে মেয়েরা গায়ে জামা পরে না। আদিমতা আছে এখনও।

তবে অবুঝমারে যেতে অনেক বাধা নিষেধ আছে। বস্তারের ডি.এম.-এর স্পেশাল পারমিশান লাগে। এদের বাইসন-হর্ন মারিয়া বলে এইজন্য যে এরা নাচবার সময়ে এদের মাথাতে বাইসনের শিং লাগিয়ে নাচে। এদের নাচ এবং রংচঙে পোশাক দেখবার মতো। অনেকে আবার রণপা-তে চড়েও নাচে।

আসলে একটি পরিত্যক্ত ঘোটুলে গত সন্ধেবেলা নাচ দেখতে গিয়েই আমাদের আজকে রাইফেল বাগিয়ে সারা রাত মাচায় কাটাতে হবে। সারা রাত থাকার আমার একটুও ইচ্ছে নেই। তবে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ঋজুদা যা বলবে তাই করতে হবে।

কাল নাচটা অবশ্য আমরা খুবই এনজয় করেছি। চারধারে কাঠের অসমান তক্তার বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘোটুলের সামনে যে ফাঁকা জায়গা থাকে সেই জায়গার ঠিক মধ্যিখানে একটি কাঠ পোঁতা। সেই কাঠের মাথাটাতে একটি সমান চারকোনা কাঠ লাগানো। তারই ওপরে কেরোসিনের হ্যাজাক রেখে ছেলেমেয়েরা নাচছিল। গান গাইতে গাইতে। ওরা এক রকমের লাঠি তৈরি করে সেই লাঠি হাতে করেই নাচে, সেই লাঠি শূন্যে নাড়ালে তা থেকে বাঁশির মতো শব্দ বেরোয়। ভারী মজার।

ঘোটুল কাকে বলে তা এখন বলার সময় নেই আমার। ছোটিডোঙ্গরি বাংলোর

দিকে আমার চোখ। তিতির ভটকাই আর নারায়ণপুরের ডি.এফ.ও. শর্মা সাহেব বাংলোর সামনের ফাঁকা জায়গাটাতে চেয়ারে বসে জমিয়ে চা খাচ্ছে। চা-এর সঙ্গে টাও খাচ্ছে। দু-তিনজন লোক ট্রেতে বসিয়ে প্লেট নিয়ে আসছে বাবুর্চিখানা থেকে।

দিনের আলো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোনও ভয় নেই। কারওরই। রাত নামার আগেই ওরা বাংলোর মধ্যে ঢুকে যাবে। তবে তিতির ও ভটকাই-এর কাছে একটি শটগান ও একটি রাইফেল আছে। শর্মাসাহেবের আর্দালির কাছে টু-ফিফটিন রাইফেল আছে। চিতাটা বাংলোতে গিয়ে হামলা করার মতো বোকা হবে না, অনুমান করা যায়।

আমরা গতরাতে নারায়ণপুর আর ছোটিডোঙ্গরির মাঝে সেই পরিত্যক্ত ঘোটুলে নাচ দেখার জন্যেই এসেছিলাম নারায়ণপুর থেকে। রেঞ্জার গনজালভেস মানা করেছিলেন, কিন্তু ডি.এফ.ও. শর্মাসাহেব শোনেননি। মানুষটি একটু পাগলাটে আছেন। তার উপরে যখন মদ-টদ খান তখন তাঁর পাগলামি আরও বেড়ে যায়। এইসব জঙ্গলে 'সালফি' নামের এক রকমের পানীয় হয়। স্থানীয় মানুষেরা প্রায়ই খায় এবং খেয়ে মারামারি করে মরে। আমাদের যেমন তাল বা খেজুরের রস ওদেরও সালফি। ওড়িশার জঙ্গলে ঋজুদার সঙ্গে গিয়েই দেখেছি বড়লোকদের বাড়ির বাগানে যেমন palm গাছ হয় জঙ্গলে সেইরকম palm গাছ হয়। তাতে হাঁড়ি বেঁধে জঙ্গলের মানুষেরা রস জমায়। ওড়িশাতে ওই গাছগুলোকে বলে সল্বপ গাছ। আর সেই রসকে বলে সল্বপ-রস্ব। সেই রসকেই এখানে এই ছত্তিশগড়ের বস্তারে বলে 'সালফি'। শর্মাসাহেবের স্ত্রী উষাদেবী নুন আর গোলমরিচ মিক্সিতে গুঁড়ো করে সালফির জাগ-এ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। 'ব্যাপারটা কী?' এবং 'সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাই করতে হয়' ঋজুদার এই ফরমান মেনে আমরা সকলেই এক গ্লাস করে খেয়েছিলাম। খেতে দারুণ লেগেছিল। ভটকাই বলেছিল, জমে গেছে। আরেক গ্লাস খাব।

ঋজুদা বলেছিল। একদম নয়। তিতির বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন জানো না?

ভটকাই বলেছিল, কী?

আমি আর ঋজুদা একটু অবাক হয়েছিলাম 'সালফির' মধ্যে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ এসে পড়াতে। তিতির বলেছিল, ভাল জিনিস কম বলিয়াই ভাল। বুঝেছ। আর খায় না।

ঋজুদা অবশ্য গ্লাস চারেক খেয়েছিল। শর্মাসাহেবের গ্লাস গুনিনি। উনি বলছিলেন, কিডনির পক্ষে এ-জিনিস খুবই ভাল। ওষুধের কাজ করে। যে প্রায়ই সালফি খায় তার কখনওই কিডনির গন্ডগোল হবে না।

কিডনি ঠিক রাখতে তো আর ওড়িশা আর ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে প্রায়ই আসা সম্ভব নয়।

ভাবছিলাম আমি।

শর্মা মেমসাহেব কিন্তু একটুও খাননি। স্বামীর পাশে সবসময়ে থাকেন ছায়ার মতো আর পাগলাটে স্বামীকে সামলান। এরকম ভাল মহিলা বেশি দেখা যায় না।

ঋজুদা তিতিরকে বলেছিল, দেখে রাখ, রোল মডেল!

তিতির বলেছিল,—আমি এরকম কথা না-শোনা মানুষকে কোনওদিন বিয়েই করব না।

ভটকাই বলল,—তা হলে তিতির দিদি? মনের মধ্যে বিয়ের চিন্তা কি জাগছে নাকি মাঝে মাঝে?

বাজে কথা বোলো না।

তিতির বলেছিল।

ভটকাই বলেছিল, ইক্কেরে না। অই চিন্তা করনের কাম নাই। তোমার বিয়া হইলে আমাগো দল ভাইঙ্গা যাইব গিয়া।

আমি বলেছিলাম, কেন দলের জনসংখ্যা বাড়লে তো ভালই।

আর সংখ্যা বাড়াইয়া কাম নাই। অন্য জিপ বা গাড়ি লাগব। ঋজুদা সামনে আমরা তিনজন পিছনে। এখন আমাগো টিম সবদিক দিয়াই ইক্কেরে ঠিকোই আছে।

ছোটিডোঙ্গরিটা একটা টিলা-মতো। বাংলোর পেছনে ছোট একটা বস্তি আছে, যে ছেলেটার লাশ পড়ে আছে শালগাছটার সামনে, তার বাড়ি ওই গ্রামেই। ঘোটুলে সে নাচতে গেছিল। ঋজুদা পাঁচশো টাকা বকশিস দিয়েছিল ওদের। নাচ শেষে সে যখন তার জোড়ির সঙ্গে ফিরছিল গ্রামে, আরও অনেকের সঙ্গে, পথে তার শুশু পাওয়ায় সে পথের পাশের একটি ঝোপের আড়ালে শুশু করছিল দাঁড়িয়েই। আর ঠিক সেই সময়েই চিতাটা পেছন থেকে এবং বাঁদিক থেকে একলাফে তার ঘাড় কামড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার প্রাণ বের করে তার ঘাড় কামড়ে টানতে টানতে নিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেছিল । সঙ্গীদের কারও কাছে বন্দুক ছিল না। এমনকী তির-ধনুকও নয়। ছিল সেই বাঁশির মতো আওয়াজ করার নাচের লাঠি। রণপা-টণপা ওসব ঘোটুলেই রেখে এসেছিল।

শুক্লপক্ষের সপ্তমী। আকাশে চাঁদ ছিল। ওরা নাচের আগে ও পরে ভাল পরিমাণ সালফি খেয়েছিল। তাই পথ দিয়েও প্রায় নাচতে নাচতে এ-ওর সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে গ্রামের দিকে ফিরছিল। দূরের গ্রামে একটি চিতাবাঘ মাঝে মাঝেই মানুষ ধরলেও ছোটিডোঙ্গরি গ্রাম থেকে একজনকেও ধরেনি। যতক্ষণ না বিপদ এসে নিজের দরজাতে টোকা মারে ততক্ষণ বিপদকে বিপদ বলে মনে করে না কেউই। ওরাও তাই স্বপ্নেও ভাবেনি যে দূরে অন্যদের গ্রামে অঘটন ঘটলেও সেই অঘটন তাদের গ্রামের মধ্যেও ঘটবে।

যখন চিতাটা ছেলেটিকে ধরে, তখন ওরা গ্রামের পাঁচশো গজের মধ্যে এসে গেছিল। নিরস্ত্র আতঙ্কিত ওরা চিৎকার চেঁচামেচি করে ছেলেটিকে উদ্ধার করতে না পেরে দৌড়ে গ্রামে এসে খবর দিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা আলো টাঙ্গি ও

তির-ধনুক নিয়ে ছেলেটির লাশ খুঁজতে বেরিয়েছিল বটে কিন্তু রক্তের চিহ্ন পেয়েও, তাঁর ছেঁড়া-খোঁড়া গাঢ় লাল হলুদ জামা ও ধুতি, মালা-টালা সব ছেঁড়া-খোঁড়া অবস্থাতে বনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেও ভয়ে আর বেশিদূর এগোয়নি। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে করে নারায়ণপুরের বনবাংলোতে এসে খবর দেয় ওরা। যা হবার তা তো ততক্ষণে হয়েই গেছে। লোকদুটিকে ফেরত পাঠিয়ে ছোটিডোঙ্গরি বনবাংলোতে অপেক্ষা করতে বলে দিলেন ডেপুটি রেঞ্জার রায় বাবু। উনি হচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের বাঙালি। শর্মাসাহেব তাঁকে কোনও এক হিন্দি ছবির ডায়ালগ নকল করে ডাকেন 'বাবুমোশোয়' বলে।

আমরা চান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে সকাল সাড়ে নটার মধ্যে ছোটিডোঙ্গরিতে পৌঁছে গেলাম। রায়বাবু ওই লোকগুলোকেই বলে দিয়েছিলেন যে আমরা দুপুরে ছোটিডোঙ্গরি বাংলোতেই লাঞ্চ করব। সেই মতো রান্না-বান্নার বন্দোবস্ত যেন করে বাংলোর চৌকিদার দুজন।

চিতাটা ছেলেটাকে ওখানেই খেয়েছিল। ছেলে বলছি বটে, কিন্তু তার বয়স আমাদের থেকে বেশিই ছিল এবং অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। পুরোটা খায়নি। তার বুক ও ঘাড় থেকে খেয়েছিল এবং একটি পায়ের মাংস উরু থেকে কাফ মাসল অবধি পুরোই খেয়েছিল। পেছনের একদিক খেয়েছিল। মুখের মধ্যে নাক আর চোখ দুটো এবং গালের মাংস খেয়েছিল। বীভৎস দেখাচ্ছিল সেই মৃতদেহ যখন আমরা তা আবিষ্কার করি এই শালবনের ছায়াতে। আংশিক খাওয়ার পরে মৃতদেহটি বয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল চিতাটা। এদিকে একটি ঝরনা মতো আছে। মানে নালা। সেই জলের পাশে কতগুলো পুটুস আর বেশরম-এর ঝোপের আড়ালে এমন করে লুকিয়ে রেখেছিল যাতে ওপর থেকে শকুনের বা জংলি দাঁড়কাকেদের চোখ তার ওপরে না পড়ে।

ছেলেটির বাবা ও দাদা তাকে নিয়ে গিয়ে কবর দিতে চেয়েছিল। এমনিতে মৃতদেহ তারা দাহই করে কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু হলে কবর দেয়। কিন্তু ততক্ষণে ডি. এফ. ও. শর্মা সাহেব তাঁর জিপ নিয়ে পৌঁছে গেছিলেন ছোটিডোঙ্গরিতে। উনি বললেন, বিলকুল নেহি।

চিতাটা যেহেতু পুরোটা খায়নি ছেলেটাকে এবং যত্ন করে লুকিয়ে রেখে গেছে জলের অদূরে, তার মানে সে রাত নামলেই খেতে আসবে। চিতাটাকে মারতে না-পারলে তারপরে সে এই জঙ্গলে ত্রাসের সঞ্চার করবে। অবুঝমারে যাওয়ার পথও এখান দিয়েই। লোক মারতে মারতে সে অবুঝমারেও পৌঁছে যেতে পারে।

আমরা তো আর এখানে শিকার করতে আসিনি, এসেছি বস্তারের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখতে। আসবার সময়ে সব জায়গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছি, ফেরবার সময়ে থেমে থেমে দেখতে দেখতে জানতে জানতে যাব। জগদলপুর চিত্রকুট জলপ্রপাত, কেশকাল, দন্তেশ্বরীর মন্দির সুন্দরী ইন্দ্রাবতী নদী আরও কত কী দেখার আছে ভাল করে। এখানে তো আমরা মৌরসি-পাট্টা গেড়ে বসে থাকতে

পারব না। অন্য শিকারির বন্দোবস্ত করতে হবে শর্মাসাহেবকে।

নেহাত স্বভাবদোষে যেখানেই যাই সেখানেই হাতিয়ার সঙ্গে থাকে আমাদের। তাই এই বিপত্তি। অবশ্য ঋজুদার যশও বিপদের অন্য একটা বড় কারণ। তবে খারাপও লাগছিল। কাল রাতের অত আলো, অত রং, অত উচ্ছ্বাস, অত গান, অত আনন্দ! তারপর সেই দলেরই একটি ছেলের অমন করুণ পরিণতির কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

এতক্ষণ ছোটিডোঙ্গরি গ্রামের থেকে দিনশেষের নানা আওয়াজ ভেসে আসছিল। ছাগলের ডাক, শিশুর কান্না, কুয়োতলার জল তোলা এবং জল ফেলার নানারকম জলজ আওয়াজ। এখন সেইসব আওয়াজ মরে গেছে। কাল ছেলেটিকে ধরেছে চিতাটা সেই জন্যই বোধহয় আজ এত বিষণ্ণতা ও ভয় সমস্ত গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। পরে হয়তো ক্রমে ক্রমে সয়ে যাবে। এ গ্রামে নাকি গত ষাট বছরের মধ্যে কোনও মানুষখেকো বাঘ বা চিতার আগমন ঘটেনি। সেই কারণেই অঘটনের অভিঘাতটা ভীষণরকমই বিঁধেছে গ্রামবাসীদের বুকে। তারা যেন ব্যাপারটাকে এখনও ঠিক মেনে নিতে পারছে না।

আলো সরে যাওয়ার আগে সব বনই কাকলিমুখর হয়ে ওঠে। পাখিদের মধ্যে কথা বলার ঝোঁক যেন বেড়ে যায়। অনেক ঘণ্টা কথা বলতে পারবে না তাই সব বলি বলি করা কথাই তারা তখন বলে ফেলে। অন্ধকার হয়ে গেলে দিনের পাখিরা সবাই চুপ। তখন রাত-পাখিরা জাগে একে একে। পেঁচা আর পেঁচানি ঝগড়া করে উড়ে উড়ে। ভূতুড়ে চোখ নিয়ে নাইটজার পাখিরা স্থবির বুড়োর মতো পথের মধ্যে অথবা টাঁড়ে জঙ্গলে বসে থাকে। পথের ওপরে গাড়ি এলেও তারা নির্বিকার। গাড়ি যখন তাদের প্রায় চাপা দিয়ে দেবে ঠিক সেই মুহূর্তে যেন গাড়ির বনেট ফুঁড়ে উপরে ওঠে বাদামি ছাইরঙা ডানা দুটি চক্রাকারে ঘুরিয়ে। রেড বা ইয়ালো ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ জঙ্গলের সীমানাতে মাঠে প্রান্তরে কোনও কিছু নড়াচড়া দেখলেই টিটিরটি-টিটিরটি-টিটিটিটি বা ডিড উ্য ড্যু ইট, ডিড উ্য ড্যু ইট-এর মাধ্যমে তাদের নিরন্তর জিজ্ঞাসা বুকে করে লম্বা লম্বা পা দুটি ঝুলিয়ে ও দুলিয়ে ধীরে ধীরে উড়তে থাকে সেই জায়গার উপরে। বড় অস্বস্তি লাগে। কী দেখে সে বা তারা ডাকছে তা দেখা যায় না। কিন্তু কিছু যে দেখেছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না কোনও। তাতে উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে নিথর নিস্তব্ধতা নেমে এল। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারাটা উঠল নীলচে সবুজ স্নিগ্ধতার সংজ্ঞা হয়ে। আর চাঁদও উঠল পুবাকাশে পশ্চিমাকাশে সূর্যকে বিদায় জানানোর পরে। এটা মার্চ মাস। সন্ধের পরে ঠান্ডা লাগে। চাঁদটা যত উপরে উঠছে তত উজ্জ্বল হচ্ছে বনভূমি, তত স্পষ্ট হচ্ছে আলো অন্ধকারের বিভাজন।

আমরা দুজনে দুমুখ করে বসেছি। এইজন্যে যে চিতাটা মড়ির কাছে আসার আগেই তাকে যাতে আমরা দেখতে পাই। সে উত্তর বা দক্ষিণ যেদিক দিয়েই

আসুক। পুবদিক দিয়ে সে আসবে না। কারণ গ্রামটা পুবদিকে। সে তো আর গ্রামে গা ঢাকা দিয়ে থাকেনি দুপুরে! পশ্চিমদিক দিয়ে এলে তাকে অনেকখানি কাঁটাবন আর ঘন পুটুস-এর জঙ্গল পেরিয়ে আসতে হবে। নিঃশব্দে আসা ওপথে তার পক্ষে অসম্ভব। আর মড়িতে সব জানোয়ারই নিঃসন্দেহ হয়ে আসতে চায়।

বন যেখানে গভীর এবং জনমানবহীন সেখানে বাঘ বা চিতা বিকেল বিকেলও এসে যায় অনেক সময়। কিন্তু এই জায়গাটা গ্রামের কাছেই। যতক্ষণ আলো ছিল গ্রামে নানা রকম আওয়াজ এবং মানুষ ও গোরু ছাগলের আওয়াজ ছিল। সব শান্ত হলেও চিতা মড়িতে আসতে চারদিক খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে।

মাচা বানাবার সময়ে শাল গাছের যেসব ডাল কাটা হয়েছিল সেই ডালের টুকরো টাকরা এবং ছেঁড়াপাতা সব কুড়িয়ে নিয়ে জিপে তুলে চলে গেছিল ভটকাই ও তিতির, ছোটিডোঙ্গরি বাংলোর ক্যাম্পফায়ার করার জন্যে। আসল কারণ চিতার যেন কোনওরকম সন্দেহ না হয়, আমাদের উপস্থিতি সে যেন কোনওক্রমেই টের না পায়। থাবার দাগ বা Pugmarks দেখে আমরা বুঝেছিলাম যে চিতাটা বেশ বড় কিন্তু পেছনের একটি পায়ের দাগ তেমনি স্পষ্ট করে পড়েনি। তাতে মনে হয়, ওই পা-টা একটু কমজোরি। হয়তো কোনও চোট আছে ওই পায়ে এবং ওই চোটের কারণেই সে হয়তো তার স্বাভাবিক খাদ্য হরিণ শুয়োর ইত্যাদি ধরতে অপারক হয়েই মানুষের কল্যাণে লেগেছে।

রাত ভাল করে নামার ঘণ্টা দেড়েক পরে একটি কোটরা হরিণ হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ডাকতে ডাকতে দৌড়ে এল জঙ্গলের ভিতর থেকে। তারপর আমার সামনে দিয়ে দৌড়ে ছোটিডোঙ্গরি বাংলোর দিকে চলে গেল। সেদিকে জঙ্গল ফাঁকা হয়ে গেছে। তার কাণ্ড দেখে অবাক হলাম। তারপরই জঙ্গলের মধ্যে থেকে টিটিরটি-টিটিরটি করে ডাকতে ডাকতে ল্যাপউইঙ্গটা জঙ্গলের বাইরের দিকে আসতে লাগল। উত্তেজনাতে আমার হাতের তেলো চুলকে উঠল। দু-উরুর উপরে শোয়ানো ঋজুদার থার্টি-ও-সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটার স্মল অফ দ্য বাট ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে ট্রিগার গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে বসে রইলাম আমি। ঠিক সেইসময়ে জঙ্গল থেকে একটা হুতুম পেঁচা বেজায় দুরগুম-দুরগুম-দুরগুম করে প্রায় কামান দাগার মতো করে ডেকে উঠল পিলে চমকে দিয়ে। যারা জঙ্গলে আগে এ ডাক শোনেনি তারা শুনে মূর্চ্ছাও যেতে পারে, আমি যেমন গেছিলাম আন্দামানের ডেভিলস আইল্যান্ডে প্রথমবার এর ডাক শুনে।

তারপরই বনের মধ্যে থেকে অস্পষ্ট খসখস আওয়াজ করে কোনও জানোয়ার এগিয়ে আসতে লাগল। বাঘ বা চিতার পায়ের তলাতে এত মোটা প্যাড থাকে যে তাদের চলাতে শব্দ হয় না কোনও। তা ছাড়া তারা শিকারি জানোয়ার বলে পা ফেলেও সাবধানে যাতে কোনও শব্দ না হয়। নৈঃশব্দই তাদের বর্ম। কিন্তু ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আসার সময়ে তাদের গায়ের সঙ্গে ঝোপঝাড়ের ঘষা লাগায় মৃদু এক রকমের খসস্ খসস্ আওয়াজ হয়। তৃণভোজী জানোয়ারেরা

জঙ্গলে চলাফেরা করলে খচমচ আওয়াজ হয়। তারা শব্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তা ছাড়া, তাদের পায়ের তলাতে শক্ত খুর থাকে যা পাথুরে জমিতে শব্দ তোলে। যে জানোয়ার আসছে সে মাংসাশী। একটু পরেই একটি ছোট মাপের বাঘ জঙ্গল থেকে বাইরে এসে একটি পাথরের উপরে উঠে চারদিক দেখল। তার নজরে ছেলেটির শবটি পড়েনি। কারণ তা তার বাঁদিকে একটু পেছনে ছিল। পড়লে সে বড়জোর অবাক হত কিন্তু পরের মারা শিকার বাঘ ছোঁয় না। শবকে ছুঁত না। বাঘ চারদিক দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল। মনে হল সে পথ পেরিয়ে ওদিকের জঙ্গলে ঢুকবে শিকারের খোঁজে। ওই পাথরটি থেকে নামবার আগে বহুদূরের ছোটিডোঙ্গরির বাংলোর দিকে দেখল একবার। বাংলোর সামনে আগুন জ্বলছিল। হ্যাজাকটা জ্বলছিল বাংলোর বারান্দাতে। বাইরে কেউই ছিল না।

বড় বাঘের এলাকাতে এক বা একাধিক চিতা থাকে। তাতে বড় বাঘ কিছু মনে করে না কিন্তু এক বাঘের এলাকার মধ্যে অন্য বাঘের প্রবেশ নিষেধ। বাঘ তাদের শরীরের একটি গ্ল্যান্ড থেকে ফেরোমন গাছে বা পাথরে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের এলাকা চিহ্নিত করে রাখে। সেই গন্ধ বা দুর্গন্ধই বলে দেয় যে ওটি কোনও বড় বাঘের এলাকা। ওর মধ্যে অন্য বড় মদ্দা বাঘ ঢুকলে যুদ্ধ অনিবার্য।

এখন চাঁদের আলো আরও জোর হয়েছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশ যদিও আলো এমন জোর নয় যে রাইফেল দিয়ে তার ব্যাকসাইট ও ফ্রন্টসাইট দেখে নির্ভুল নিশানা নেওয়া যায় তবে এই আলোতে শটগান দিয়ে স্বচ্ছন্দে গুলি করা যায় নির্ভুলভাবে।

জঙ্গলের ভিতর থেকে পিউকাঁহা ডাকছে মাথার মধ্যে চমক তুলে তুলে। সাধে কি আর সাহেবরা এই পাখিগুলোর নাম দিয়েছে ব্রেইন ফিভার? মস্তিষ্কের জ্বরে আক্রান্ত না হলে এমন করে ডাকতে পারে না কেউ। তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে একটা পাগলা কোকিল। বসন্ত চলে যাব যাব করলেও তার যাবার কোনও লক্ষণ নেই। প্রত্যেক জঙ্গলেই এমন একটি দুটি পাগলা কোকিল থাকে তারা গ্রীষ্মে ও বর্ষাতেও গলার শিরা ফাটিয়ে ডেকে চলে। ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক তাদের সবসময়েই বসন্ত।

ঘড়িতে দেখলাম, রাত প্রায় সাড়ে আটটা। আমার ঘড়িতে রেডিয়াম নেই কিন্তু ডায়ালটা সাদা বলে চাঁদের আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেলাম ঘড়ি। সেই সময়ে বনের মধ্যে থেকে আরেকটা কোটরা ডেকে উঠল হঠাৎ। ডেকে উঠেই চুপ করে গেল। কেউ কি তার শ্বাসরোধ করল?

তারপরে আবার পিউ কাঁহা আর কোকিলের ডাক। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হল একটা ছায়া যেন সরে গেল নিঃশব্দে আমার ডানদিকে একটা বড় শিমুলের পায়ের কাছে। শিমুল গাছের গুঁড়িতে অনেকগুলো ভাগ থাকে। মনে হল সেই ছায়াটা সেই ভাগের কোনও একটা ভাগের মধ্যে ঢুকে আড়াল নিল। উৎকর্ণ হয়ে আমি সেদিকে চেয়ে বসে রইলাম। ঋজুদা বলেই দিয়েছিল যে চিতাকে দেখতে

পেলে এবং রেঞ্জের মধ্যে পেলে গুলি করবি যদি ভাইটাল জায়গাতে না লাগে নাই-ই লাগল। পরে সেই আহত চিতাকে খুঁজে বের করে মারা যাবে। চিতাটি মানুষখেকো বলেই কোনও ঝুঁকি নেওয়া চলবে না, তাই একে পালাতে দেওয়া চলবে না। যে আগে দেখতে পাবে, মানে যার দিকে সে বেরোবে আড়াল ছেড়ে, সেই গুলি করবে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে রাইফেলের স্মল অব দ্য বাট-এ ডান হাতে তর্জনি ছুঁইয়ে বসে আছি। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছায়াটাকে আরেকবার নড়তে দেখা গেল। চিতাটা শিমূল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে চারদিকে ভাল করে দেখল। তারপর খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে ছেলেটি যে জায়গাতে শুয়ে আছে সেদিকে এগোতে লাগল। নালার শব্দটা ততক্ষণ খেয়াল করিনি। হঠাৎই যেন জলের কুলকুলানি স্পষ্ট হল। এতক্ষণ জলের শব্দ কেন যে পাইনি কে জানে! আমাদের ভারতীয় চিতা বা লেপার্ড বা প্যান্থার যেভাবে হামাগুড়ি দেয় তাকে বলে লেপার্ড ক্রলিং। এন.সি.সি.-তে আমাদের রাইফেল হাতে এরকম হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে শেখানো হয়েছিল, লেপার্ড ক্রলিং করে, তাই জানি।

যতক্ষণ না তাকে জুতমতো পাচ্ছি ততক্ষণ হড়বড়িয়ে গুলি করে লাভ নেই। হঠাৎই দেখলাম ছায়াটি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে শবটির দিকে। সে যে পথে যাচ্ছে তাতে সামান্য পরেই সে কতগুলো পুটুস আর বেশরম ঝোপের পিছনে আড়াল পড়ে যাবে। তারপর তাকে দেখা যাবে যখন সে ছেলেটিকে খেতে শুরু করবে। কিন্তু সে জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন বলে তাকে তখন ভাল করে কেন, প্রায় দেখাই যাবে না। এখনও দেখা যাচ্ছে না, যা দেখা যাচ্ছে তা নেহাতই একটি ছায়ামাত্র। মুহূর্তের মধ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে গুলি করলাম। সে আমার দিকে পেছনে ফিরে ছিল। কোনাকুনি। ঠিকমতো গুলি করতে পারলে তার কাঁধ এবং হার্টকে বিদ্ধ করা যেত কিন্তু গুলিটা বোধহয় ভাল জায়গাতে লাগল না। কোথায় যে লাগল তা বোঝা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে তখন। তবে গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একলাফ মারল সোজা উপরে। আমি সজাগ থাকলে সেই অবস্থাতেও শূন্যে তার গায়ে আরেকটি গুলি করতে পারতাম কিন্তু উত্তেজনাতে তা করতে পারলাম না। লেপার্ডটি মাটিতে পড়েই আরেক লাফে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি হাত কামড়াতে লাগলাম। আমার জায়গাতে ঋজুদা থাকলে লেপার্ড-এর চলে যাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। একে ঋজুদার মাথা কুলফির মতো ঠান্ডা, তারপরে হাত আমার চেয়ে অনেকেই ভাল, অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি। ঋজুদা প্রথম গুলি যদি বে-জায়গাতে লাগাতও লেপার্ড যখন লাফিয়ে উঠল এবং যখন মাটিতে পড়ল তখন তাকে দ্বিতীয় গুলি করে ওখানেই থিতু করে দিত। কিন্তু এখন আর হাত কামড়ে লাভ নেই কোনও। যা হবার তা হয়ে গেছে।

চিতাটা অদৃশ্য হয়ে যাবার মিনিট পনেরো পরে ঋজুদা বলল,—ঝামেলা বাধালি। আগামীকাল ওই চিতাকে খুঁজে বের করে মারতে খুবই ঝামেলা হবে।

তবে মারতে তো হবেই। বিটিং করে বের করতে গেলেও একাধিক বিটারকে সে মেরে দিতে পারে। আহত চিতা বলে কথা। তোকে আমাকেও মারতে পারে। চাঁদের আলো আছে বলেই মাচা থেকে নামবার কথা ভাবছি। অন্ধকার রাত হলে সারা রাত মাচাতেই বসে থাকতে হত। সে দূরে চলে গেছে এমন তো কোনও কথা নেই। সে কাছেই তোর দিকে চেয়ে পড়ে আছে হয়তো মাটি কামড়ে।

তারপর বলল, এক কাজ কর। তুই এখন নামিস না। আমি আগে নেমে তোর মাচার নীচে গিয়ে তোকে cover করে দাঁড়ালে তুই নামিস। তারপর বড় রাস্তা ধরে আমরা ছোটিডোঙ্গরি বাংলোতে ফিরে যাব।

আমি বললাম,—এখুনি একটা হেস্ত-নেস্ত করে গেলে হত না?

তুই একটা উন্মাদ। এতদিনে এই শিখলি। আহত চিতার পেছনে রাতের বেলা কেউ যায় আত্মহত্যা করতে? তাও পূর্ণিমার রাত হলে কথা ছিল। তবে পূর্ণিমার রাতও আহত চিতার জন্যে নির্বিঘ্ন নয়। তার উপরে আবার মানুষখেকো!

আমরা বাংলো থেকে আসার আগে বলে এসেছিলাম যে গুলির শব্দ শুনলেও আমাদের খোঁজে জিপ নিয়ে যেন শর্মাসাহেবরা না আসেন। তিতির ও ভটকাইকেও ঋজুদা বারবার করে বারণ করেছিল। বলেছিল আমরা এলে নিজেরাই আসব তবে ফিরতে ফিরতে সকাল হয়ে যাবে। তোরা দরজা বন্ধ করে থাকবি। রাতের পর বাইরে কেউই থাকবি না। শর্মাসাহেব হয়তো সালফি খেয়ে গজল গাইতে চাইবেন বারান্দাতে বসে। চিতাটা তো আর জানে না ইনিই মহামান্য ডি.এফ.ও. নারায়ণপুরের। মানুষখেকো বাঘ বা চিতা non-respector of persons। কারওকেও রেয়াত করে না ওরা। মিসেস শর্মা থাকলে ভাল হত নইলে শর্মাসাহেবকে ম্যানেজ করা মুশকিল।

ঋজুদা আগে নেমে চিতাটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে তো বটেই চারদিকে নিজের দু-ব্যাটারির টর্চটা ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপরে বন্দুক রেডি পজিশনে ধরে বলল, নাম এবারে। আমার দু-ব্যারেলেই এল.জি. পোরা আছে। চিতা লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়তে পড়তেও ট্রিগার টেনে দিতে পারলে তার দফা রফা হয়ে যাবে।

এই সময়ে সঙ্গে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ থাকলে কাজে লাগত যদিও চাঁদের আলোতে টর্চ-এর আলোর জোর থাকত না। তবে চাঁদের আলোয় সবদিকই কমবেশি দেখা যাচ্ছে। দেখা গেলে কী হবে। পুটুস আর বেশরমের ঝোপের মধ্যে তো দেখা যায় না। আর চিতা হয়তো তাদেরই কোনওটার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

আমি নামলে ঋজুদা আরও একবার পেছনে ফিরে দেখে, দুপাশে দেখে ঝোপঝাড় এড়িয়ে ফাঁকা জায়গা দিয়ে চাঁদের আলোতে সুনসান নির্জন কাঁচা লাল ধুলোর বড় রাস্তাটার দিকে এগোতে লাগল। কিছুটা দূর গিয়েই আমরা দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে ও দুপাশে দেখছিলাম। তারপর বড় রাস্তাতে পৌঁছে ঋজুদা বলল, এই বেশরম-এর ঝোপগুলো যেখানে থাকে, তার নীচে কয়লা পাওয়া যায়।

তাই!

হ্যাঁ ভূতত্ত্ববিদেরা তাই বলেন। বস্তার জেলাতে নানারকমের খনিজ পদার্থ আছে, যদিও এখানে কোনও খননকার্য হয়নি তেমন এ-পর্যন্ত। যখন হবে তখন নানারকম ধাতু ও আকর পাওয়া যাবে হয়তো। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, কয়লা, আরও কত কী। বস্তারে ডেভালাপমেন্ট কিছুই হয়নি। খুবই গরিব জেলা এই বস্তার। কোনও কলকারখানাও নেই। শুধু ঢোকরার কুটির শিল্প আছে কিছু। এদের তাঁতশিল্পও খুব উন্নত। কীরকম রংচঙে পোশাক পরে নাচছিল ওরা দেখেছিস।

ওদের সভ্য করে তোলা যায় না?

আমি বললাম।

ঋজুদা হাসল। বলল,—আমরা নিজেদের সভ্য বলে মনে করি। ওরা হয়তো আমাদের অসভ্য বলে মনে করে। ভেরিয়ার অ্যালউনের লেখা ভাল করে পড়লে এই তথাকথিত অসভ্য গোঁন্দ বাইগা মারিয়াদের কথা জানতে পাবি। এই সেদিন আমার হাতে একটি বই এসেছে, রামচন্দ্র গুহর লেখা, Savaging the Civilized। দারুণ বইটা। এখনও শেষ করতে পারিনি।

রামচন্দ্র গুহ কে?

উনি একজন নাম করা নৃতত্ত্ববিদ।

বইটা তোমার পড়া হলে আমাকে পড়তে দেবে?

দেব কিন্তু সময়মতো ফেরত দেবে।

দেব।

এতক্ষণ আসেনি কিন্তু আমরা বড় রাস্তায় এসে উঠতেই একটা ইয়ালো ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ চাঁদভাসি আকাশে নিঃশব্দে ভেসে এসে আমাদের মাথার উপরে উড়তে উড়তে ডাকতে লাগল, টিটিরটি টিটিরটি টিটিরটি।

ঋজুদা পথের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার চারধারে ভাল করে দেখে নিল একবার।

তারপর আবার এগোল। আমার গা ছমছম করতে লাগল।

আমরা যখন ছোটিডোঙ্গরি বাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন চৌকিদারের লালরঙা কুকুরটা অসীম সাহসে ভর করে দু-তিনবার আহ্লাদের সংক্ষিপ্ত ভুকভুক ডাক ডেকে দৌড়ে এসে ঋজুদাকে স্বাগত জানাল লেজ নাড়তে নাড়তে।

এটি সব জায়গাতেই লক্ষ করেছি। যেমন করেছি নাগাল্যান্ডের বঙ্গপোকপিতেও। কুকুরেরা ঋজুদাকে খুবই পছন্দ করে। কী করে যেন দুমিনিটের মধ্যে ঋজুদা তাদের সঙ্গে দোস্তি করে ফেলে।

কী ব্যাপার।

জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তারপর বললাম, চিতার ভয়ে কুকুরেরা সব জায়গাতেই সিঁটিয়ে থাকে অথচ এই লালি সব জেনেশুনে মরবার জন্যে উদোমে এল কেন রাতের বেলা?

ঋজুদা হেসে বলল,—আমি কুকুরদের জন্যে পকেটে করে বিস্কুট নিয়ে ঘুরি সবসময়ে, তাই জন্যে।

বুঝলাম, কথাটা সত্যি নয়। কোনও মন্ত্রগুপ্তি আছে ঋজুদার।

হয়তো আমাদের গলার স্বর পেয়ে থাকবেন ওঁরা। আমরা বাংলোর হাতায় ঢোকার আগেই দরজা খুলে শর্মাসাহেবের সঙ্গে তিতির এবং ভটকাই বেরিয়ে এল। ভটকাইয়ের হাতে ঋজুদার নতুন পয়েন্ট থ্রি ফিফটিন রাইফেলটা ছিল, ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির।

কী হল। ঋজুকাকা? গুলির শব্দ পেলাম যে।

তিতির জিজ্ঞেস করল।

ঋজুদা বলল,—রুদ্র আহত করেছে চিতাটাকে। কাল খুঁজে বার করে মারতে হবে।

তারপর ঋজুদা আমাকে বলল, ওদের ইনকুইজিটিভনেস মেটাতে কী ঘটনা ঘটেছিল বলো রুদ্র, নইলে ওদের ঘুম হবে না রাতে।

ইতিমধ্যে শর্মা সাহেব বললেন, আপলোগোঁকি লিয়ে খানা বানায়া ভটকাইবাবুনে।

ভটকাই আবার বাবু হল কবে?

ঋজুদা বলল।

ভটকাই গলা নামিয়ে বলল, বাইরের লোকের সামনে বে-ইজ্জত কোরো না।

ও বাবা। তা হলে তুই বাবুই।

কেয়া খানা বনা? বলিয়ে ভটকাইবাবু।

তারপর ঋজুদার দিকে ফিরে শর্মাসাহেব বললেন, উনহোনে তো বাবুর্চিখানামেই থে রাইফেল সাথ লে কর।

ভটকাই বলল,—লুচি আর টকটক আলুর দম, বেগুন ভাজা, আর পচরঙ্গ কোম্পানির আচার।

লুচি কেয়া হোতা হ্যায় ভটকাইবাবু?

পুরি জানতা আপ? পুরি?

ভটকাই তার অনবদ্য হিন্দিতে বলল।

জি হাঁ, পুরি কওন নেই জানতে হেঁ।

লুচি হচ্ছে পুরিকি ছোটি বহিন।

বলেই হাতের তেলো ছোট করে গোল করে বলল,—এইসি ছোটি ছোটি হোতা।

সমঝা। ঔর আলুকি দোম?

দোম নেই দম।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল,—আলুসে বনতা।

ঋজুদা বলল—আলুকা দম কি বেগুন দিয়ে রাঁধা হবে? ঠিক্কে হ্যায়। কাল দোপেহরমে ম্যায় আপলোগোঁকি রিকমচ্ খিলায়েগা।

রিকমচ্! উ কেয়া চিজ হ্যায়?

রন্ধন-বিশারদ ভটকাই বলল অবাক হয়ে।

ঋজুদা মুচকি মুচকি হাসছিল। শব্দটা চেনা চেনা লাগছিল আমার কিন্তু মনে পড়ছিল না জিনিসটা কী!

ঋজুদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব পড়ে বলল,—মধ্যপ্রদেশেরই ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো যেবার মারতে গেছিলাম সেবারে শুনেছিলি?

ঠিক মনে নেই। তারপরই আমার মনে পড়ে গেল। ওখানে ধোকার ডালনাকে রিকমচ্ বলে। ওখানের বনবিভাগের অফিসারেরা খাইয়েছিলেন বটে।

আমি বললাম, ধোকার ডালনা।

তাই? ভটকাই আর তিতির সমস্বরে বলল। ওরা তো যায়নি ঝিঙ্গাঝিরিয়াতে।

তারপর রাইফেলটা আনলোড করে রেখে মুখ-হাত ধুতে আমি বাথরুমে গেলাম। জানলাটা খোলা ছিল। জানলাতে পরদা ছিল না। দূরের জঙ্গল ও প্রান্তর দেখা যাচ্ছিল শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোতে। আমি ভাবছিলাম ছেলেটার শবটা পড়ে আছে অর্ধভুক্ত অবস্থায়। চিতাটাও কোথায় আছে কে জানে! গুলিটা তার পেটেই লাগল কি? পেটে লাগলে তো খুবই যন্ত্রণাও হচ্ছে, রক্তপাতও হচ্ছে। সারা রাত রক্তক্ষরণ হবার ফলে সকালে সে কি মারা যাবে? আমরা যখন তার রক্তের দাগ অনুসরণ করে তার কাছে গিয়ে পৌঁছব তখন কি সে মরণকামড় দেবে আমাকে? লাফিয়ে উঠে টুঁটি চেপে ধরবে আমার, তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে?

ভাবছিলাম, মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে সে মানুষই থাকে, তার একটা নাম থাকে, সে নামে প্রিয়জনে প্রেমভরে তাকে ডাকে। সে কারও ছেলে, কারও ভাই, কারও বন্ধু এই তখন তার পরিচয়। কিন্তু ওই ছেলেটির মতো মরে গেলে তখন তার নাম তখন হয়ে যায় মৃতদেহ, ডেডবডি, লাশ অথবা শিকারের পরিভাষায় kill বা মড়ি। কী আশ্চর্য, না? মানুষের মতো এত তাড়াতাড়ি ভোলার ক্ষমতা বোধহয় অন্য কোনও প্রাণীরই নেই, মানুষের মতো স্বার্থপরও বোধহয় আর নেই।

রাতে খেতে বসে ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। কাল আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই চিতাটাকে খুঁজতে বেরোব আমরা।

শর্মাসাহেব পুরির ছোটবোন লুচি আর আলুর 'দোম' খেয়ে রাতেই জিপ নিয়ে নারায়ণপুরে ফিরে যাবেন। আগামীকাল জগদলপুরে কনজার্ভেটর সাহেবের সঙ্গে তাঁর মিটিং আছে। ভোরে ভোরে নারায়ণপুর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে তাঁকে। ভয়ের কিছু নেই। মানুষখেকো চিতাটা কোথায়, মানে, কোনদিকে আছে তা আমরা জানি। উনি যাবেন উলটোদিকে। তা ছাড়া হেডলাইট জ্বালানো জিপকে সব জানোয়ারই এড়িয়ে চলে, সে মানুষখেকো হোক আর যাই হোক। তা ছাড়া সঙ্গে তাঁর আর্মড বডিগার্ড থাকবে। ড্রাইভার তো থাকবেই। তবে এসব অঞ্চলে,

ভারতের অনেক বনাঞ্চলেরই মতো নানারকম আতঙ্কবাদীদের সন্ত্রাস আছে। তারা মানুষখেকো চিতার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। আর এইসব আতঙ্কবাদীদের লক্ষ্য সরকারি অফিসারেরাই, বনবিভাগের অফিসারেরা তো অবশ্যই।

শর্মাসাহেব খেয়ে-দেয়ে উঠে আরও দুগ্লাস সালফি খেয়ে 'দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা' গাইতে গাইতে ঋজুদার এবং আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গিয়ে জিপে উঠলেন।

ওঁর জিপ নারায়ণপুরের দিকে চলে গেলে, তিতির বলল, সব অত্যাচার সহ্য হয় কিন্তু যে মানুষের গলাতে সুর নেই তার গান শোনা অসহ্য।

ভটকাই বলল,—গান কী বলছ তিতির, বলো মেশিন গান। যে গানে অনন্ত গুলি, একটার-পর-একটা বেরিয়েই যাচ্ছে, শ্রোতারা যে গুলিতে, থুরি, গানে গানে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে, সেই বোধও নেই গায়কের। একটা দুটো বেসুরো গান তবু সহ্য হয়, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা এরকম বেসুরো গান সহ্য করা মহামানবের পক্ষে সম্ভব। আমাদের মতো সামান্য মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

ঋজুদা বলল, সবরকম বিপদই ফেস করতে হয়। আমি তো জানতাম যে মানুষখেকো চিতা মোকাবিলা করতে গিয়ে রুদ্র বেঁচে গেল, তোদের দুজনকে যে কী বিপদের মধ্যে ফেলে গেলাম সে আমি ভাল করেই জানতাম।

চলো, এবার শুয়ে পড়া যাক।

ঋজুদা বলল, আমি ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমের সোফাটিতে শুচ্ছি, খুব পছন্দ হয়েছে সোফাটা আমার। তোরা দুপাশের দুটো ঘরে শুয়ে পড়।

না, না, তা কী হয়! তুমি সোফাতে শোবে কী? আমরা, মানে আমি আর ভটকাই শুচ্ছি। তুমি ঘরে যাও।

তিতির বলল,—ঝামেলা করে কী হবে? আমিই বরং সোফাতে শুচ্ছি। ভটকাই আর রুদ্র একঘরে আর তুমি একঘরে শুয়ে পড়ো ঋজুকাকা।

ঋজুকাকা বলল, যা অর্ডার করছি তাই কর। বলেছি যে, দলে নেতা একজনই থাকে। নইলে সে-দল জগদ্দল হয়ে যায়। আমাকে তোরা শুধু একটা কম্বল আর বালিশ দিতে বল চৌকিদারকে।

কেন আমার ঘরেই তো আছে। ডাবল বেড খাট তো। তারপর বলল: তুমি তো আমার পাশেই শুতে পারতে ঋজুকাকা।

পারতাম। স্বচ্ছন্দেই পারতাম। কিন্তু তুই বড় হয়েছিস, খাটটাও ছোট, তোরই অসুবিধে হবে আর আমারও অস্বস্তি হবে। সারা পৃথিবী যে নিয়ম মানে সেই নিয়মই মানা ভাল।

কী নিয়ম?

অন্য অনেকরকম অনিয়মই তো সারা দিনরাত করছি আমরা, এই যেমন ভটকাই চন্দ্রর ডিনার। পুরির ছোট বোন লুচিতে যে পরিমাণ গাওয়া ঘি দিয়েছে ভটকাই আজ রাতেই না শর্মাশাহেবের হার্ট অ্যাটাক হয়।

ভটকাই বলল—পচরঙ্গ আচারটা কিন্তু জমে গেছিল। কীসের আচার ওটা।

জানিনা, বড়বাজারে পাওয়া যায়। খাদ্য অখাদ্য সব ফল, বিচি, আঁটি। মানে আমার ছোট পিসের ভাষাতে 'যা কিছুই ফ্যালানের জইন্য' তার সবকিছুই ওর মধ্যে দেওয়া হয়। আর তেল লঙ্কা? ইরিবাব্বা। ইক্কেরে ফাসকেলাস।

ঋজুদা বলল, নাও, শুয়ে পড়ো এবারে।

দাঁড়াও তোমাকে কম্বল আর বালিশটা এনে দিই।

তিতির বলল।

শুয়ে ঘুম আসছিল না। চিতাটা কী করছে এখন তাই ভাবছিলাম। খুবই কি কষ্ট হচ্ছে বেচারার? নাকি গুলিটা বেজায়গায় লেগেছে? গুলি কি মিস করেছি? নাঃ, তা বোধহয় নয়। গন্তব্যে না-পৌঁছুলে গুলির আওয়াজের রকম অন্য। তা ছাড়া ঋজুদাও যখন বলেছে যে লেগেছে, তখন অবশ্যই লেগেছে।

তারপরে ভাবছিলাম, তিতির আমাদের এত বন্ধু, হরিহর আত্মা, সে বড় হয়ে গেছে বলেই তার সঙ্গে শোওয়া যাবে না এ কেমন নিয়ম। অথচ এটাও ঠিক যে কেউই দিদি বা মা বা পিসিমা জেঠিমা ছাড়া কোনও অনাত্মীয়ার সঙ্গে একসঙ্গে শোয় না। শুতে দেখিনি কখনও।

কী জানি জঙ্গলের নিয়মকানুন তবু বুঝতে পারি। শহরের মনুষ্য সমাজের নিয়ম কানুনের মানে বুঝি না কোনও। তিতিরের সঙ্গে শুলে সারারাত পুটুর পুটুর করে কত গল্প করতে পারতাম আমরা। একদিন আমার মামাতো বোন মুমুর সঙ্গে শুতে চেয়েছিলাম ক্যুইজ নিয়ে আলোচনা করে রাত কাবার করব বলে, মা চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, না।

কেন না মা?

তর্ক কোরো না বড়দের মুখে মুখে। না বলছি, না।

আমাদের দেশে বড়রা বেশি বেশি বড়। বিদেশে, বিশেষ করে পশ্চিমি দেশে, মা-বাবা ছাড়া আর সব বড়দের সবাই নাম ধরে ডাকে, ডিক, হ্যারি, ন্যান্সি, জোয়ান, জুনিপার আর ছোটদের সকলেই বড়র মতোই ইম্পর্ট্যান্স দেয়। ছোট বলেই যে এলেবেলে, ফালতু এমন মনে করে না তারা, তারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে বয়সে ছোটদের থেকে যত বড়ই হোক-না কেন।

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান আছে না একটা, প্রতিবছর বৈশাখ এলেই সেই গানের কথা মনে পড়ে যায়। যদিও বৈশাখ আসেনি এখনও।

'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ/আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ/স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাৎ আসা ক্ষণে ক্ষণে আধো ঘুমের প্রান্ত ছোঁওয়া বকুলমালার গন্ধ'।...

আমরা বারান্দাতে বসে চা খাচ্ছি। ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে তিতিরকে বলল,—আরেক কাপ চা ঢাল তো তিতির। দারুণ ভাল চা তো! বস্তারের এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে এরকম দার্জিলিং লপচু চা-এর কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

তিতির বলল,— শর্মাসাহেবের স্ত্রী উষাদেবী দিল্লির মেয়ে। মিরান্ডা হাউসে পড়াশোনা করা খুব শৌখিন মহিলা, আমি মিশেই বুঝেছি। এসব ওরই জন্য।

ঋজুদা কাল রাতেই চৌকিদারদের বলে দিয়েছিল যে তাদের মধ্যে একজন সকালের আলো ফুটলেই ছোটিডোঙ্গরি গ্রামে গিয়ে খবর দিয়ে আসবে যে চিতাটার চোট হয়েছে এবং ওই শালবনেই পুটুস বা বেশরম ঝোপের মধ্যে কোনও ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় সে রাত কাটিয়েছে নিশ্চয়ই। সকালে প্রাতঃকৃত্য করতে-টরতে যারা যাবে তারা সকলেই ওই দিকটা যেন এড়িয়ে চলে। এও বলতে বলেছে যে, যদি হাঁকোয়া করা মনস্থ করেন সাহেবরা তবে তোমাদের জনা কুড়ি মানুষকে অন্তত হাঁকোয়াতে সামিল হতে হবে। হাঁকোয়া করা হবে কি না এবং হলে কখন তা করা হবে তা তোমরা জেনে যাবে। গাঁওবুড়া যেন বাংলোতে সকাল সকালই এসে দেখা করে যায়।

চৌকিদারেরা যে খবর দিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ আমাদের চা খাওয়া শেষ হবার আগেই গাঁওবুড়া এবং তার সঙ্গে ছেলেটির বাবা ও দাদা এসে হাজির।

ঋজুদা তাদের বলল, আজকে তোমরা দেহ পাবে। খুব সম্ভব চিতা কাল আর খায়নি কিছুই সেই মড়ি থেকে। তবে তোমরা ওখানে এখুনি যেয়ো না।

ওরা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, গুলির শব্দ শুনেছিল রাতে, তার কী হল?

কী হল তা তারা চৌকিদারের কাছ থেকে আগেই নিশ্চয়ই জেনেছিল। কিছুই যে হয়নি, মানে মানুষখেকো মারা যে পড়েনি সে খবর তারা পেয়ে গেছে। বাঘ যে আহত হয়েছে, সে খবরও এখন যাকে বলে ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ শুনতে চায় আর কী?

ঋজুদা আমাকে দেখিয়ে বলল—ঈ বাবুনেহি কাল রাতমে গোলি কিয়া থা। গোলি লাগাভি হ্যায় মগর চিতা মরা নেহি। আজ উসকি ইন্তেকাল হোগা।

ইন্তেকাল শব্দটা উর্দু। ওরা ঠিক বুঝল বলে মনে হল না।

ঋজুদা খোলসা করে বলল,—আজ উসকো খতম করেগা হামলোগোঁনে।

আপ খুদ যাইয়েগা তো সাহাব? আপ যানেসে উও দুশমন জরুর পিটা যায়গা।

ঋজুদা আমাদের ইমেজ বিল্ডিংয়ের জন্য ওদের কাছে বড়মুখ করে বলল, ঈ সাব লোগ ঔর মেমসাহেবভি বহত আচ্ছা শিকারি হ্যায়। উনলোক মুঝকো মদত দেতে হ্যায়।

বলল বটে, তবে গ্রামের লোকেদের আমাদের দেখে বিশেষ ভক্তি জাগল বলে মনে হল না।

তারপর ঋজুদা আমাদের দিকে ফিরে পাইপ থেকে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমি ভাবলাম, অন আ সেকেন্ড থট যে, বিটিং করানোর ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না। বিটারদের মধ্যে একাধিক মানুষের জখম হবার এমনকী মারা যাবারও আশঙ্কা আছে। একজন তো মরেইছে অন্যদেরও মরতে দেওয়াটা ঠিক

হবে না। আমরা চারজনই যথেষ্ট।

তারপর বলল, আরও ঠিক করেছি যে সকালেই ব্রেকফাস্ট করে যাব না আমরা।

ভটকাই-এর দিকে ফিরে বলল,—তুই ব্রেকফাস্ট কাম লাঞ্চ 'ব্রাঞ্চ' অর্গানাইজ কর কিচেনে গিয়ে। আমরা সাড়ে দশটা নাগাদ সারা দিনের মতো তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ব। যাতে প্রয়োজনে সূর্য ডোবা অবধি জঙ্গলে থাকতে পারি। চিতাটা কতদূর গেছে, তার চোট কতখানি মারাত্মক হয়েছে তা তো জানি না আমরা। তবে পয়েন্ট থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলের মার, শরীর এফোঁড় ওফোঁড় যদি হয়ে গিয়ে থাকে তবে মরবে সে নিশ্চয়ই। তবে কতক্ষণ পরে সেই হচ্ছে কথা। আমি চাই একটু দেরি করে যেতে যাতে আরও রক্তপাত হয়, আরও দুর্বল হয়ে পড়ে যাতে। সে যত দুর্বল হবে ততই আমাদের মঙ্গল এবং সুবিধা তাকে শেষ করার।

তিতির বলল, হাউ আনকাইন্ড না? কোথায় জানোয়ারকে তাড়াতাড়ি শেষ করে তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেব আমরা, না আমাদের সুবিধার জন্যে তার কষ্ট আরও বাড়াচ্ছি।

ঋজুদা বলল, কী করা যাবে। চিতাটা যে মানুষখেকো এবং ডেসপারেট। এ ব্যাপারে আমি কোনও রিস্ক নিতে চাই না। আজই এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নাটকের শেষ দেখতে চাই আমি। তবে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে জঙ্গলে এসে মানুষ-মারার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল আমাদের। মানুষখেকো চিতা মারতে কত সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকী বছরের পর বছরও লেগে যায়। মানুষখেকো বাঘ মারার চেয়ে চিতা মারা অনেক কঠিন। কারণ চিতারা গ্রামের আশেপাশে থাকায় মানুষের আদব-কায়দার সঙ্গে অনেকই বেশি পরিচিত থাকে। তাই তারা মানুষ ধরা আরম্ভ করলে প্রচণ্ড ধূর্ত হয়ে ওঠে। মানুষখেকো বাঘ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিকার ধরে দিনের বেলাতে আর মানুষখেকো চিতা রাতের বেলাতেই ধরে। তাই ওই নিশাচর মানুষখেকো মারা অনেক হ্যাপা।

জিম করবেটের 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' কে না পড়েছে?

তিতির বলল।

তারপর বলল,—তোমাকে ভুগিয়েছিল সবচেয়ে বেশি কোন চিতা। মানে কতদিন ভুগিয়েছিল?

পান্নার চিতা। সে প্রায় দেড় বছর। তবে আমি তো একসঙ্গে দেড় বছর সময় দিতে পারিনি। এসেছি, ফিরে গেছি, আবার এসেছি। তার দৌরাত্ম্য তো সমানেই ছিল। সে মানুষখেকো ঘোষিত হবার দেড় বছর পরে আমি তাকে মারার চেষ্টা আরম্ভ করি আর আরম্ভ করার দেড় বছর পরে তাকে মারতে পারি। তার মানে তিন-তিনটি বছর সে বহু গ্রামের মানুষদের সিঁটিয়ে রেখেছিল।

সেই গল্প বলবে একদিন আমাদের?

আমি বললাম।

ঋজুদা হেসে বলল,—সে গল্প তো একদিনে বলা যাবে না। দিনে দুঘণ্টা করে বললেও সাতদিন লাগবে কম করে।

তিতির বলল,—ঋজুদার কাছে শুনে পান্নার লেপার্ডির গল্পটা লিখে ফেলো রুদ্র। একটি আলাদা বই হয়ে যাবে, 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ'-এর মতো।

ঋজুদা সিটিং দিলে তো অতগুলো।

ঋজুদা হেসে ফেলে বলল, দেখা যাবে। তবে যা ভটকাই, তুই কিচেনে চলে যা। যার যেখানে জায়গা। এবার থেকে তোর নাম বদলে করে দেব 'ননা'।

ননা কেন? এত নাম থাকতে ননা কেন?

ওড়িশাতে সব খাবার দোকানের মালিকদেরই 'ননা' বলে। কেন বলে তা আমি জানি না। তুই তো আর শিকারি বা অ্যাডভেঞ্চারার নোস। এখন তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই তোর বেশি উৎসাহ দেখি। তাই তোর নাম ননা। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারলি। তবে ননা নামটা পছন্দ না-হলে তোকে 'কিচেন ম্যানেজার' এমনকী 'কোয়ার্টার মাস্টার' বলেও ডাকতে পারি। তোর যেমন খুশি।

ভটকাই উঠে পড়ে বলল, হায় কপাল। যাদের জন্যে চুরি করি তারাই বলে চোর।

তারপরে আমাদের দিকে ফিরে বলল, তোরা কী বলিস?

আমরাও ঘাড় নাড়লাম।

কাটার উপর নুনের ছিটে পড়ল।

ব্রেকফাস্ট-কাম-লাঞ্চ বা ব্রাঞ্চ খাবার পরে আমরা জিপে উঠে বসলাম। আমাদের জন্যে আলাদা জিপ ছিলই। শর্মাসাহেব তাঁর নিজের জিপ নিয়েই গেছিলেন নারায়ণপুরে ফিরে। জিপটা বড় রাস্তা ধরে যতদূর যেতে পারে গিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। ঋজুদা ড্রাইভারকে বলল, কোনও বড় গাছের ছায়াতে জিপটা লাগিয়ে তুমি জিপেই থাকো। গুলি খাওয়া চিতা তাড়া খেয়ে যে এদিকে আসবে না তার ঠিক কী? তাই জিপ থেকে নেমে বাইরে থাকার দরকার নেই।

ঋজুদার হাতে ঋজুদার ডাব্লু ডাব্লু গ্রিনারের পয়েন্ট বারো বোরের বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের দোনলা বন্দুক। ডাবল ইজেক্টর, ডাবল লক। চমৎকার মারে বন্দুকটা। ব্যারেল বত্রিশ ইঞ্চি হওয়াতে রেঞ্জও অনেক বেশি। ডাবল ব্যারেল বন্দুক ছাব্বিশ বা চব্বিশ ইঞ্চিরও হয়। সেসব যেমন দেখবার মতো, বত্রিশ ইঞ্চি বন্দুকও দেখবার মতো।

আমার হাতে ঋজুদার পয়েন্ট থার্টি-ও-সিক্স সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল। অস্ট্রিয়া থেকে জেঠুমনি ইমপোর্ট করিয়েছিলেন। তিতিরের হাতে ঋজুদার ইংলিশ পয়েন্ট

টু সেভেন্টি ফাইভ সিংগল ব্যারেল রাইফেল। আর ভটকাই-এর হাতে ঋজুদার নতুন কেনা ইন্ডিয়ান অর্ডিনান্স কোম্পানির পয়েন্ট থ্রি ফিফটিন রাইফেল।

এতগুলো অস্ত্র নিয়ে তো আর একসঙ্গে চিতাকে মারা হবে না। যে প্রথমে দেখতে পাবে, সেই গুলি করবে এমনই নির্দেশ ছিল ঋজুদা। তবে বারবার সাবধান করে দিল সবাইকেই, খুবই সাবধানে এগোবার জন্যে। আমি আর ঋজুদা রক্তের দাগ অনুসরণ করে পাশাপাশি যাব চার-পাঁচ হাত তফাতে। ওরা আসবে আমাদের পনেরো-কুড়ি হাত পেছনে পেছনে কিন্তু দুজনে থাকবে অন্যর তিরিশ হাত তফাতে। মানে, একজন থাকবে আমাদের বাঁদিকে, একজন ডানদিকে। গুলি প্রথমে করব আমি অথবা ঋজুদাই। যদি আমাদের গুলিতে চিতা না পড়ে এবং আমাদের টপকে পেছনে চলে যায় তবে ওরা গুলি করবে।

কাল রাতে যেখানে আমি গুলি করেছিলাম সেখানে পৌঁছে দেখলাম একটি শিশু গাছের গুঁড়িতে চিতার এক দলা মাংস লোমশুদ্ধ আটকে আছে।

ঋজুদা বলল,—কিমা বানিয়ে দিয়েছিস দেখছি। তোর গুলি চিতার শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে হয়তো। আবার হয়তো চামড়া ছুঁয়েও চলে যেতে পারে। চামড়া ছুঁয়ে চলে গেলে কপালে দুর্ভোগ আছে। তবে মনে হয় এফোঁড় ওফোঁড়ই করে গেছে। নইলে চিতাটা লাফাত না অতখানি। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই চৌকিদারেরা ছোটিডোঙ্গরি গাঁয়ের লোকেদের নিয়ে ছেলেটির শব নিতে এল।

ঋজুদার দিকে তাকাতে ঋজুদা বলল,—হায়েনা বা শেয়ালে খেয়ে থাকবে। ও চিতা ফিরে আসেনি যে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

সেই ভিড়ের মধ্যে ছেলেটির বাবা ও দাদাও ছিল। তারা নতুন কাপড়ে মুড়িয়ে শব উঠিয়ে নিল। শব-এ তখন দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। পরশু রাতে মেরেছে চিতাটা ছেলেটিকে—দুর্গন্ধ হবারই কথা। ফুলেও গেছে শব। তিতির ওডিকোলন মাখানো রুমালে নাক চেপে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল। উলঙ্গ বীভৎস ছেলেটির দিকে তার চাইতে হয়তো লজ্জাও করছিল। শত হলেও সে মেয়ে তো।

একটু এগোতেই রক্তর দাগ পাওয়া গেল। তবে সামান্য। তারও পরে রক্তের দাগ আর-একটু স্পষ্ট হল। ঘাসে, আশেপাশের ঝোপঝাড়ের পাতাতে লেগে আছে রক্তের ছিটে দাগ। ডানদিকে একটি টিলা মতো ছিল। দাগটা সেদিকেই গেছে।

ঋজুদা আমার দিকে তাকিয়ে সেদিকেই এগোতে বলল।

আমি ভাবছিলাম, গুলি খেয়ে চিতা যদি এই টিলাতে চড়তে পারে তা হলে তার চোট এমন কিছু মারাত্মক হয়নি মনে হয়। তার মানে সে ঝামেলা করবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে ও দুপাশে দেখতে দেখতে আমরা খুব আস্তে আস্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সামনে এগোচ্ছি। বনের মধ্যে তখন কোকিল ডেকে চলেছে। তবে মার্চেরর ভোরের হাওয়া এখন আর ঠান্ডা নেই। একটু একটু গরম হয়েছে সে হাওয়া। হাওয়াতে ফিসফিসানি তুলে কিছু শুকনো পাতা ঝরঝর শব্দ তুলে গড়িয়ে

যাচ্ছে রুখু পাথর শুকনো জমির উপরে। হাওয়াতে এখনও মহুয়ার গন্ধ আছে। সালফি গাছ তো পাম গাছের মতো, তাতে ফুল ফোটে কি না জানি না। ফুটলেও গন্ধ হয় কি না জানি না। বাতাসে আরও নানা ফুলের গন্ধ, পাতার গন্ধও আছে। দিনে-রাতের সবসময়েই বনের গায়ের একটা আলাদা গন্ধ থাকেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে নতুন নতুন সুগন্ধি মাখে।

কথাবার্তা বলা মানা। প্রতিটি পা হিসেব করে ফেলছি যাতে পায়ের নীচে শুকনো পাতা না গুঁড়িয়ে যায়, যাতে কোনওরকম শব্দ না হয়। ভাবছিলাম। কাছাকাছি কোথাও জল থাকলে চিতাটাকে তার কাছেপিঠে যাওয়া যাবে। আহত হলে সকলেরই পিপাসা জাগে।

জিপ থেকে নেমেছি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ছোট টিলা বা এখানকার ভাষাতে ডোঙ্গরির প্রায় মাথাতে উঠে এসেছি আমরা অনেকটা আন্দাজেই। রক্তের দাগ যে সবসময়ে পাচ্ছি এমন নয়। কিছুটা দূর-দূর পাচ্ছি। জানোয়ারের গায়ে গুলি লাগলে তাদের চামড়া কিছুক্ষণ বাদে সেই ক্ষতকে আবার ঢেকেও দেয়। কতখানি ঢাকতে পারে তা ক্ষতর রকমের উপরে নির্ভর করে।

টিলার উপরে পৌঁছে ঋজুদা ও আমি চারধারে ভাল করে চেয়ে এর পরে কী করা যায় তাই ভাবছিলাম। টিলাটার নীচে দেখলাম একটি অতি ক্ষীণ ধারায় বয়ে যাওয়া নালা আছে। তার জল অতি সামান্য। তবু তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে যথেষ্ট। তা ছাড়া নালার দুপাশে বড় গাছ তো আছেই ঝোপঝাড়ও বেশি। হয়তো জল যাবার জন্যেই। ওই জলের পাশের ছায়াচ্ছন্ন জমিতে চিতাটার লুকিয়ে থাকাটা আশ্চর্য নয়। রাতে অন্য কোথাও থাকলেও রোদের হাত থেকে বাঁচতে তার এখন এমনি জায়গারই দরকার।

ঋজুদা হাতছানি দিয়ে ভটকাই আর তিতিরকে ডাকল। ওরা আস্তে আস্তে আমাদের কাছে উঠে এলে ঋজুদা তার প্ল্যানটা বলল আমাদের। বলল, আমি আর রুদ্র যেখানে আছি, এই জায়গাতে তোরা জঙ্গলে দুটি গাছের আড়ালে বসে পড়। আমি আর রুদ্র টিলা থেকে কিছুটা নেমে ঘুরে ওই নালার ওপাশে চলে যাচ্ছি। আমার ধারণা চিতাটা ওই জলের কাছেই আছে। আমার ও রুদ্রর চোখে পড়লেই গুলি করব যে আগে দেখতে পাব। সে এই টিলা ধরেই উঠে আসবে। তখন তার পথ আগলে বসে থাকা তোরা গুলি করবি। কে মারল তা নিয়ে বাহাদুরি পরে করবি। দুজনে একসঙ্গে দেখতে পেলে একসঙ্গেই গুলি করবি এবং চিতাটাকে ওখানেই শুইয়ে দিবি। সে যেন আর ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করতে না পারে।

তারপর আমাদের সকলকেই বলল, ক্লিয়ার? বুঝেছ তো ঠিকমতো? এনি কোয়েশ্চেনস?

আমরা সবাই মাথা নেড়ে জানালাম, না কোনও প্রশ্ন নেই। তারপর আমি আর ঋজুদা দুজনে পাহাড়টার দুপাশে নেমে যেতে শুরু করলাম সাবধানে। ওপর বেয়ে নামাটা অনেক কঠিন, বিশেষ করে নিঃশব্দে যদি নামতে হয়।

আমরা ওখান থেকেই নামলাম, আরও এগিয়ে না-গিয়ে, যাতে চিতা জলের কাছে থাকলেও আমাদের দেখতে বা শুনতে না-পারে। আমরা দুপাশ দিয়ে জলটাও পেরিয়ে গিয়ে তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করব।

এখন জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে ছাতারে পাখিদের ছ্যাঃ ছ্যাঃ আর বুলবুলির শিস ছাড়া অন্য শব্দ বিশেষ নেই। তবে হাওয়ার শব্দ আছে। হাওয়াটা ধীরে ধীরে গরম আর জোর হচ্ছে। বস্তারের এই অঞ্চলে এপ্রিলের শুরু থেকেই লু-এর মতো হাওয়া বইতে শুরু করে। সূর্যটাও গরম হচ্ছে ক্রমশ। মাথার টুপিটা নামিয়ে নিলাম ডানদিকে কাত করে।

পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে এলাম। তারপর আরও দু-তিনশো গজ জঙ্গলে গিয়ে নদীটা পেরোলাম। উপর থেকে নদীটাকে যেন রুগণ মনে হয়েছিল, তা নয়। কোথাও কোথাও বেশ ভাল জল আছে। এই নালাটার নাম কী, তা কে জানে। কিন্তু এই নালাটাই চলে গেছে ছোটিডোঙ্গরি গ্রামের দিকে এঁকে বেঁকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। নালাটা পেরোতে গিয়ে আমার বাটা কোম্পানির হাঁটার জুতোজোড়া ভিজে গেল। জিনসের ট্রাউজারের নীচটাও ভিজল। তবে গরমের মধ্যে কাপড় আর রাবারের জুতো ও জিনস ভিজে যাওয়াতে আরামই লাগছিল। তা ছাড়া চলতে ফিরতে শব্দও কম হবে।

নদীটা পেরিয়ে আরও পঞ্চাশ গজ গিয়ে তারপরে ঘুরে নদীর দিকে আসতে লাগলাম। ঋজুদা কী করল জানি না। ঋজুদাকে দেখতে তো পাচ্ছিলাম না। সেও আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

নদীর দিকে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। এদিকেও শালবন। পায়ের কাছে শাল চারার জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে অন্য গাছও আছে বিজা, ধ, অর্জুন, খয়ের, মহুয়া ইত্যাদি। এবারে নদীর খুব কাছে চলে এসেছি। যত কম সময়ে কথাটা বলা গেল কাজটা তত কম সময়ে হল না। অতটুকু আসতে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট লাগল। নদীর খুব কাছে চলে এসেছি এমন সময় হঠাৎ একটা মাছরাঙা নদীর দিক থেকে এবং জঙ্গলের গভীর থেকে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে আমাকে একেবারে চমকে দিয়ে বাইরে এল। সঙ্গে সঙ্গে একদল ছাতারে, ইংরাজিতে যাদের বলে ব্যাবলার, সমস্বরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে ডেকে উঠল। মুহূর্তের জন্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়ে আবার খুব সাবধানে রাইফেল রেডি পজিশনে ধরে একপা একপা করে এগোতে লাগলাম নদীর দিকে, ছায়াচ্ছন্নতার দিকে।

নদীর বালি দেখা যাচ্ছে এখন। নদী মানে, পাহাড়ি জায়গায় যাকে বলে নালা। হিমালয়ে ঝোরা। আরও দশ পনেরো পা যাবার পরে নির্জন নদীর ছায়াচ্ছন্ন বালিতে যখন পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি তখন হঠাৎই চোখে পড়ল সামনের একটা বিজা গাছে। গাছটার গুঁড়িতে রক্তের দাগ। সেই দাগ অনুসরণ করে দেখি গাছটার মোটা কাণ্ডেও রক্তের দাগ। আমার মাথার উচ্চতারও উপরে। হতবাক হয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কী হতে পারে ভাবছি। মুখটা গাছের আরও ওপরে তুলতেই দেখি

চিতাটা দুটো মোটা ডালের সঙ্গমে শুয়ে আছে কোনাকুনি। তাকিয়ে আছে তার হলুদ কালো চোখে আমাদের দিকে। আমি রাইফেল তার দিকে তোলার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে। রিফ্লেক্স অ্যাকশানে আমিও গুলি করলাম সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাঘটা ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার গুলি তার উড়ন্ত শরীরের তলপেটে লাগল। ট্রিগার টানতে টানতেই আমি একঝটকাতে বাঁদিকে সরে গেছিলাম তবু তার দাঁত আমাকে না-পেয়ে তার ছড়ানো ডান থাবা আমার বাঁ-বাহুমূলে এসে পড়ল এবং সেই ধাক্কাতে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। বোল্ট টেনে গুলি রিলোড করতে যাওয়ার আগেই চিতাটা মাটিতে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, আমার থেকে হাত চারেক দূরে এবং পেছনের দুপায়ে ভর করে সে আমাকে চিবিয়ে শেষ করার জন্যে এবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপরে। মাটি থেকে উঠে পড়লেও রাইফেল রিলোড করার সময় আমি তখনও পাইনি। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে পরপর দুটো গুলি হল অদৃশ্য থেকে এবং চিতাটা কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হতভম্ব আমি রাইফেল রিলোড করে চিতার ঘাড়ে নিশানা নিয়ে ট্রিগার গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে রেখে দেখলাম, ঋজুদা একটা মোটা শাল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দাঁড়াল। ঋজুদা আমার প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ছিল। তার অব্যর্থ লক্ষে পরপর দুটি এল. জি. মারাতেই এ-যাত্রা আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম। তবে বাঁ-বাহুমূলের ক্ষতটা ঠিক কী ধরনের হয়েছে তা নারায়ণপুরের ছোট হাসপাতালে না গেলে বোঝা যাবে না। গরম পড়ে গেছে। বেশি দেরি করলে নখের ক্ষততে গ্যাংগ্রিন হয়ে যেতে পারে। তাহলে হাত কেটে বাদও দিতে হতে পারে।

ঋজুদা এগিয়ে আসছিল আমার দিকে। আমার বাঁ-হাতটা ভিজে গেল রক্তে। তারপর রক্ত বুকে ও পেটে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঋজুদা বলল, উঠে দাঁড়া। কী এমন হয়েছে কী? তুই যে গুলি করে কত যন্ত্রণা দিলি এত ঘণ্টা। তা সে কি তার প্রতিশোধ নেবে না?

আমি রাইফেলের বাটে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঋজুদা বলল, চল এবারে বড় রাস্তার দিকে। লেপার্ড এখানেই পড়ে থাক। যাদের ছেলেকে সে খেয়েছিল তারা দেখুক এসে। আমরা সোজা নারায়ণপুরে যাব তোকে নিয়ে। মালপত্র সব ছোটিডোঙ্গরি বাংলোতে থাকুক এখন। শর্মাসাহেবের জিপ এসে চিতাকে আর সব মালপত্র নিয়ে যাবেখন। চিতাটাকে নারায়ণপুরে পি. ডাব্লু. ডি. বাংলোর হাতাতে স্কিন করব। ভাল করে দেখতে হবে, এত বড় লেপার্ডটা মানুষখেকো হয়ে গেল কেন?

লেপার্ডটা বিরাট বড়।

আমি বললাম।

নিশ্চয়ই। প্রায় টাইগারের মতো। তা ছাড়া বয়সেও যে খুব বুড়ো, এমন তো মনে হয় না দেখে।

ইতিমধ্যে হড়বড় খরবর শব্দ করে সাবধানতা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বেহিসাবের পতাকা উড়িয়ে তিতির আর ভটকাই লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে নেমে এল টিলার উপর থেকে।

ঈসস! কী রক্ত!

তিতির উদ্বিগ্ন গলায় বলল।

আমি দেখলাম, ঋজুদা ওকে চোখ মেরে বলল, কিসসু হয়নি। চিতাটা একটু আদর করে দিয়েছে রুদ্রকে।

আমি বুঝলাম যে, পাছে আমি ঘাবড়ে যাই তাই ঋজুদার এই হরকত। ভটকাই বলল, উরিঃ সাব্বাস! কী বড় চিতাবাঘ রে! ড্যাডি অফ অল গ্রান্ডড্যাডিজ।

ঋজুদা ভটকাই-এর হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে নিল, বলল, তুই রুদ্রর রাইফেলটা নে ওর হাত থেকে আর ওকে সাহায্য কর একটু। যত তাড়াতাড়ি আমরা বড় রাস্তাতে পৌঁছতে পারি ততই ভাল।

ভটকাই এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

বলল, কনগ্রাটস।

আমি বললাম, কীসের জন্যে?

লেপার্ডটা মারার জন্যে।

আমি কোথায় মারলাম? মারল তো ঋজুদা। এই লেপার্ড ঋজুদারই। ঋজুদা ঠিক সময়ে আমাকে না-বাঁচালে এতক্ষণে মুর্দা বনে যেতাম।

তিতির বলল পাকাবুড়ির মতো, মরা-বাঁচা যাঁর হাতে, তিনিই মারেন তিনিই বাঁচান। তিনিই চিতাটাকে মারলেন আর তোমাকে বাঁচালেন।

ঋজুদা বলল, তোদের এত করে শেখাই তবু তোরা শিকারের নিয়মকানুন এখনও শিখলি না। শিকারে নিয়ম হল, যে প্রথম রক্তপাত ঘটাবে বাঘই হোক কি চিতাই হোক তা সেই শিকারির তা সে যদি লেজের ডগায় গুলি করে রক্তপাত ঘটায় বা শুধু একটা কানের পাতা ফুটো করে দেয়, তাহলেও এই লেপার্ড রুদ্রর।

আমরা টিলাটার উপরে উঠে আসতেই দেখলাম ছোটিডোঙ্গরি গ্রামের বহু মানুষ জমায়েত হয়েছে এসে বড় রাস্তাতে জিপটার পাশে।

ঋজুদা পকেট থেকে রুমালটা বের করে পতাকার মতো নাড়তে নাড়তে তাদের এদিকে আসতে বলল। সেই সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে এল আমাদের দিকে। তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হল টিলা থেকে নামার পরেই। ঋজুদা তাদের ডিরেকশান দিয়ে দিল। বলল, চিতার গোঁফ-টোফ সব যেন লোপাট না হয়। তোমরা বাংলোতে নিয়ে গিয়ে চিতাটাকে রাখো, গ্রামের সবাইকে বলো ওখানে এসেই দেখে যাবে। তারপর ডি. এফ. ও. সাহেবের জিপে এলে তাতে তুলে দিও নারায়ণপুরে নিয়ে যাবার জন্যে। ওখানেই চামড়া ছাড়াব।

আমাদের জিপটা ছোটিডোঙ্গরি বাংলোর সামনে দাঁড়াল এক মিনিট। তিতির বলল, আমি এক মিনিট আসছি ঋজুকাকা।

এক মিনিটই কিন্তু।

আমার খুবই রক্তপাত হচ্ছিল। দুর্বল লাগছিল খুব। এতক্ষণ তেমন ব্যথা বোধ করিনি, এখন ক্রমশই ব্যথাটা বাড়ছে।

তিতির দৌড়ে ফিরে এল ওর ক্যামেরাটা নিয়ে।

ঋজুদা অর্ডার দিল, যত জোরে পার চালাও ড্রাইভার সাহেব। তাড়াতাড়ি নারায়ণপুরের হাসপাতালে পৌঁছতে হবে। সেখানে থেকে ফোন করে দেব শর্মাসাহেবকে।

শর্মাসাহেবের সঙ্গে আমাদের পথেই দেখা হয়ে যাবে স্যার। ওঁর ড্রাইভার কাল বলেছিল যে উনি দুপুরে ভাত খেয়েই এখানে আসবেন এতক্ষণে নিশ্চয়ই রওয়ানা দিয়ে দিয়েছেন নারায়ণপুর থেকে।

চলো তো। পথে দেখা হলে তো ভালই।

ভটকাই আর আমি পিছনে বসেছি। বলতে গেলে ভটকাই-এর গায়ে হেলান দিয়েই বসেছি আমি। ঋজুদা আর তিতির সামনে। বেচারি ভটকাই-এর জামাকাপড় সব আমার রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ভটকাই বলল, যাকগে। লোকের আমার উপর সহানুভূতি হবে। বলবে, ঈসস এত রক্ত। নিশ্চয়ই খুব লেগেছে আমারও।

ওই যন্ত্রণার মধ্যেও ওর ফিচলেমি দেখে হেসে ফেললাম।

তারপর ভটকাই হঠাৎই সাহেব হয়ে গিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল আমাকে, হাউ আর উ্য ফিলিং মিস্টার রুদ্র রায়?

সাহেবরা ব্যথা লাগলেও কাঁদুনি গায় না। ওদের কাছ থেকে শেখার আছে অনেককিছু। সহানুভূতি চায় না ওরা কথায় কথায়। তাই ভটকাই-এর ইংরেজি প্রশ্নের জবাবে আমিও ইংরেজ বনে বললাম,—ফাইন। থ্যাঙ্ক উ্য।

হঠাৎই আমার মনে হল মাথাটা যেন হালকা হয়ে আসছে। আমার জ্ঞান চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ভটকাই বলল, কী হল রে, রুদ্র?

আমি জবাবে কিছু বলতে পারলাম না। চোখ বুজে এল আমার, খুব পিপাসা পেতে লাগল কিন্তু সে কথাও বলতে পারলাম না কারোকেই।

# কেশকাল-এর বাঘিনী

চৈত্রের শেষ। এখনও কালবৈশাখীর সময় আসেনি তবু দুপুর থেকেই মেঘলা করেছিল। বিকেলের দিকে সেই মেঘের কালোতে সিঁদুরের ছোঁয়া লাগল আর শুরু হল তাণ্ডব।

হাওয়ার এক দমকে বহুবর্ণ শুকনো পাতারা বৃন্তচ্যুত হয়ে একঝাঁক বহুবর্ণ পাখির মতো একই সঙ্গে যেন ডাল ছেড়ে উড়ে গেল দিগ্বিদিকে।

আমি, ভটকাই আর ঋজুদা কেশকাল বাংলোর বারান্দাতে চেয়ারে বসেছিলাম। গতকালই রাতে এখানে এসেছি নাগপুর থেকে প্রদীপ কাকাদের সঙ্গে। ওঁদেরই বন্দোবস্ত, ইন্তেজাম। একটা এয়ারকন্ডিশানড টাটা সুমো আর একটা এয়ারকন্ডিশানড টোয়াটা কালিস-এ এসেছি আমরা। দলও তো ছোট নয়। ওঁরা গেছেন কেশকাল-এর ডি. এফ. ও.-র কাছে। ওখানে থেকে নারায়ণপুরে ফোনও করবেন অবুঝমারে যাওয়ার পারমিশনের জন্যে। অন্য প্রদীপ কাকা, উনি প্রদীপ মৈত্র, প্রথমজন প্রদীপ গাঙ্গুলি, বলেছিলেন যে, পারমিশন নারায়ণপুর থেকে হবে না, বস্তার ডিস্ট্রিক্টের হেড কোয়ার্টার্স জগদলপুর থেকেই নিতে হবে। সঞ্জীব কাকা আর তাপস কাকা, সঞ্জীব গাঙ্গুলি আর তাপস সাহা, বলছিলেন এখান থেকে ফোন-টোন করার ঝামেলা না করে একেবারে সশরীরে জগদলপুরে কাল পৌঁছেই এ ব্যাপারে তত্ত্বতল্লাস করা যাবে।

অবুঝমারে বাইসন-হর্ন মারিয়াদের বাস। তাদের মেয়েরা এখনও ঊর্ধ্বাঙ্গে কাপড় রাখে না। তারা মারিয়াদের মধ্যে এক বিশেষ প্রজাতি; যারা নিজেদের রীতিনীতি, সহবত, নিজেদের মূল্যবোধ সব চারদিকের এই ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও আওয়াজের মধ্যে অটুট রেখেছে। রেখেছে যে শুধু তাই নয়, তারা রাখতে পারার জন্যে অশেষ গর্বিত। এখনও কেরোসিনের কুপির আলোয় হিংস্র জন্তু-ভরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাদের কুটিরে বসে তাদের ছেলেমেয়েরা ঠাকুরদা-ঠাকুমা, দাদু-দিদিমার কাছে তাদের নানা রূপকথা শোনে। বাইরে থেকে মাদল ধামসা আর

বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসে। তখন হয়তো কোনও ঘোটুল-এ নাচ-গান হয়।

ভাবলে ভাল লাগে। আমাদের রাজ্যের শিশুদের জগৎ থেকে তো টিভি, ইন্টারনেট, রেডিয়ো ইত্যাদির কারণে ওইসব সুখবিলাস এখন শুধুমাত্র কল্পনার।

ঋজুদা বলছিল, এই ঘোটুল ব্যাপারটা শুধু বাইসন-হর্ন মারিয়াই নয়, অন্য নানা আদিবাসীর মধ্যেই এখনও চালু আছে। ঘোটুল হল গ্রামের সীমানার বাইরে অথচ সীমানা থেকে খুব দূরে নয় এমন জায়গায় একটি বড় ঘর। তার সামনে মস্ত উঠোন থাকে। উঠোনের মধ্যে একমানুষ মতো উঁচু একটি স্তম্ভমতো থাকে। সেই স্তম্ভর উপরে পেট্রলের হ্যাজাক জ্বেলে রাখা হয় পুরো উঠোন আলোকিত করার জন্য—আর সেই আলোকিত উঠোনে ছেলে ও মেয়েরা নাচে, গান গায় গভীর রাত অবধি। বিহারে যেমন মহুল ফুলের রস খায় আদিবাসীরা, এখানেও খায়, তবে এখানকার বিখ্যাত হচ্ছে সালফি।

ওড়িশাতে আমরা ঋজুদার সঙ্গে শিকারে গিয়ে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি যে ওখানে সল্বপ বলে একরকমের বড় গাছ হয় জঙ্গলে, ডেট-পাম-এর মতো, সেই গাছে হাঁড়ি বসিয়ে, যেমন করে তাল-খেজুরের রস আমাদের রাজ্যে সংগ্রহ করে মানুষে তেমন করেই সংগ্রহ করে। তার পরে খেজুর বা তাল রস বেলা বাড়লেই যেমন গেঁজে গিয়ে নেশার সামগ্রী হয়ে যায়, ওই সল্বপ রসের বেলাও তাই-ই হয়। ওড়িশার 'সল্বপ রস'কেই মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলাতে বলে সালফি।

বস্তার কিছুদিন আগেও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এখন ছত্তিশগড়ের অন্তর্গত হয়ে গেছে। বিহার, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের আরও নানা অঞ্চলেরই মতো।

এই ঘোটুল-এ অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা কৈশোর পেরোনোর পরে যৌবনে পা দেওয়ার কিছু পরেই সারাদিন নিজের নিজের কাজ করার পর ঘোটুল-এ এসে রাতে থাকে। বিয়ের আগে তারা তাদের জীবনসাথীকে এইরকমই একসঙ্গে থেকে নির্বাচন করে। এই সাথী নির্বাচনের আবার দুটি রকম আছে। প্রথমটিকে বলে 'জোড়িদার'—মানে যাদের জুড়ি ঠিক হয়ে গেছে। মানে, যারা জোড় লেগেছে। অন্যরা, যারা মনস্থির করতে পারেনি তখনও তারা বিভিন্ন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে মিশে তার জীবনসাথী নির্বাচন করে। এই দ্বিতীয় দলের ছেলেমেয়েরা 'অদল বদল' প্রথার অন্তর্ভুক্ত।

শুনে, ভটকাই বলেছিল—দারুণ প্রথা তো। এমন প্রথা আমাদের দেশের সব রাজ্যেই চালু হওয়া উচিত।

ঋজুদা বলেছিল ওরা আদিবাসী, জামাকাপড় বিশেষ পরে না, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে না, অনেক টাকা রোজগারকেই জীবনের একমাত্র গন্তব্য বলে বিশ্বাস করে না অথচ ওরা কত আধুনিক ওদের চিন্তাতে। অত্যন্ত উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজে যে প্রথা আছে—যদিও অলিখিত—যে প্রথা আছে অধিকাংশ পশ্চিমি এবং জাগতিকার্থে উন্নত দেশে বাইসন-হর্ন মারিয়ারা

ঠিক সেই প্রথাকেই সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

পশ্চিমি দেশে যখন এই প্রথা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আছে, ওরা তখন তার জনগণায়ন করেছে।

বাংলাতে পণ্ডিত মিস্টার ভটকাই বলেছিল।

'জনগণায়ন'। বেশ তো শব্দটা। অভিধানে কি আছে?

ভটকাই বলল, অভিধান যাঁরা লেখেন, তাঁরা তো বৈয়াকরণ।

সেটা আবার কী বস্তু?

ঋজুদা আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল ভটকাইকে।

বৈয়াকরণ মানেও জান না? বৈয়াকরণ বলে তাঁদের, যাঁরা ব্যাকরণে পণ্ডিত। তাঁরাই তো অভিধান লেখেন। তাঁরা ওই ঘটকের সম্বন্ধ করা বিয়ের দিনেই পড়ে আছেন, ঘোটুলে এসে পৌঁছতে পারেননি। ভাষাও যদি নিয়ত নবীকৃত না হয়, তাহলে সে ভাষাও কেওড়াতলাতেই গেছে বলতে হবে।

নবীকৃত মানেটা কী? সেটা বল।

তোমাকে নিয়ে তো ভারি মুশকিল হল ঋজুদা। তুমি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানে পণ্ডিত অথচ নিজের মাতৃভাষাটাই ভাল করে শিখলে না।

আমি মাতৃভাষাতে পণ্ডিত হলে তো সব ঋজুদা-কাহিনি আমিই লিখতাম, রুদ্রর কি ঋজুদা-কাহিনি লিখে এত নামডাক হত?

সে কথা অবশ্য ঠিক।

অত্যন্ত উদার মানুষের মতো বলেছিল ভটকাই।

তারপরে বলেছিল, ওর ঋজুদা-কাহিনিও যদি না থাকত তবে তো রুদ্রর প্রচণ্ড আইডেনটিটি ক্রাইসিস হত।

ঋজুদা হো-হো করে হেসে উঠেছিল ভটকাইয়ের কথা শুনে। আমিও।

আমি নিজেকে ডিফেন্ড করে বলেছিলাম, বৈয়াকরণ হওয়া সোজা, অভিধান লেখা সোজা, পণ্ডিতিও সোজা কিন্তু লেখক হওয়া সোজা নয়। সবাই-ই যদি লিখতে পারত তবে লেখকের, রুদ্র রায়ের এত সম্মান থাকত না।

ভটকাই বলল, বাঁশবনে শেয়াল রাজা। বাংলা সাহিত্যে কজন লেখক আছেন রে আজকে, যাঁরা থাকবেন? অধিকাংশই পদ্মপাতার জল। টলটল করছেন, বিজ্ঞাপনের সূর্যর আলো লেগে জ্বলজ্বল করছেন কিন্তু কখন গড়িয়ে গিয়ে ভূতলশায়ী হবেন তা খোদাই জানেন।

নবীকৃত শব্দটার মানে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঋজুদা বলল।

নবীকৃত এসেছে নবীকরণ থেকে। বুঝলে। নবী এসেছে নব থেকে। অর্থাৎ পুরনোকে নতুন করাকেই বলে নবীকরণ। নবীকরণ হয়ে গেলেই নবীকৃত।

বুঝলাম।

ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, তুই ঘোটুলের গল্পটাই মাটি করলি।

ঋজুদা বলল, আমি তো পালাচ্ছি না। বলব পরে। বাইসন-হর্ন মারিয়ারা রং খুব ভালবাসে। তাদের আনুষ্ঠানিক পোশাকে তাদের দেখলে অবাক হয়ে যাবি। রঙের দাঙ্গা লাগিয়ে দেয় একেবারে। আর ওরা আবার রণপায়ে চড়েও নাচে। কেউ কেউ বাইসন সাজে। একজন না দুজনে। একজন রঙিন কাপড়ের মাথার দিকে থাকে, অন্যজন পেছন দিকে, চিনেরা যেমন ড্রাগন নৃত্য করে না, অনেকটা সেইরকম। আর একরকমের লাঠি ওরা নাচের সময়ে ব্যবহার করে, যে লাঠি শূন্যে নাড়লেই তা থেকে বাঁশির মতো আওয়াজ বেরয়।

দারুণ তো! আমাদেরও দেখাবে তো!

আগে তো অবুঝমারেই যাওয়া হোক। অবশ্য অবুঝমারে না যেতে পারলেও নারায়ণপুর আর ছোটিডোঙ্গরির মাঝে একটু ঘোটুল আছে। সেখানে নারায়ণপুরের ডি. এফ. ও. শর্মাসাহেবকে বলে নাচের বন্দোবস্ত করা যাবে।

তুমি চিনলে কী করে?

আরে এ কি আজকের কথা! আমি যখন কেশকাল-এর কুখ্যাত নরখাদক বাঘ মারতে এই কেশকাল-এ এসে ক্যাম্প করি, তখন শর্মা তার এক কাকার সঙ্গে কেশকাল-এ এসেছিল। তখন দিল্লির কলেজে পড়ে। তার কাকা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস জয়েন করে মধ্যপ্রদেশে বিখ্যাত সব জঙ্গল থাকাতে মধ্যপ্রদেশ ক্যাডার বেছে নেন। তিনিও শর্মাই ছিলেন। তিনি তখন কনজার্ভেটর। জগদলপুরে হেডকোয়ার্টার্স। চিফ কনজার্ভেটর সাহেবের নির্দেশানুসারে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না দেখতে জগদলপুর থেকে জিপ নিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে দিল্লি থেকে বেড়াতে-আসা ভাইপোকেও নিয়ে এসেছিলেন। তাই এই এখনকার নারায়ণপুরের ডি. এফ. ও. শর্মা যখন জানতে পারলেন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রদীপ মৈত্রর কাছ থেকে যে আমি বেড়াতে আসছি এ অঞ্চলে তখনই প্রদীপকে বলে রেখেছিলেন যে নারায়ণপুরে যেন অবশ্যই যাই।

কেশকাল-এর নরখাদক বাঘ মারতে তুমি কবে এসেছিলে?

তোদের জন্মের অনেকই আগে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। তখন বস্তারের চেহারা অন্যরকম ছিল। ভয় করার মতো জায়গা ছিল। এ তল্লাটের খুব অল্প জায়গাতেই পিচের রাস্তা ছিল। কোনও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ছিল না বলতে গেলে।

এখনও তো দেখছি শুনশানই। কটা বাস বা প্রাইভেট গাড়ি-ই বা যাওয়া-আসা করছে। ট্রাক যাওয়া-আসা করছে কিছু।

ট্রাক যে মাল বয়ে আনে মাল নিয়ে যায়—ট্রাকেরাই তো সারা ভারতের লাইফ-লাইন চালু রাখে।

কেন? রেল?

রেলেও মাল যাওয়া-আসা করে তবে দেরি হয়, চুরি হয়, হাজারো

ঝক্কি-ঝামেলা। রেল যদি বেসরকারি হত তবে হয়তো অনেক বেশি মাল যাওয়া-আসা করত। আমাদের এখানে, যদিও এটা খুবই দুঃখের বিষয়, সরকার যাহাই স্পর্শ করে তাহাই...। সে সরকার কেন্দ্রীয়ই হোক—কী রাজ্য।

ভটকাই বলল, তা আমরা তোমার সঙ্গে কেশকাল-এ এলাম আর কেশকাল-এর নরখাদক বাঘের ইন্তেকাল-এর গল্পটা শুনব না!

ঋজুদা বলল, আরেক কাপ করে কফি বল তো।

বলেই বলল, সেই সময়ে এই বাংলোটা কি এইরকম ছিল। এই বাংলো দেখে, ঘরে ঘরে রুম কুলার—কার্পেট, তখনকার বাংলোর ধারণাই করতে পারবি না। তখনকার দিনে ভারতের সব রাজ্যেই ব্রিটিশদের বানানো বনবিভাগের বাংলোগুলোতে এমন বাহার ছিল না কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল। দুটি বেডরুম, সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ, মধ্যে ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং রুম। সি পি টিক-এর ফার্নিচার, কাটলারি-ক্রকারি সাধারণ ছিল কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদার মাত্রই ভাল রাঁধুনি হত। সাহেবি রান্নাও তারা ভাল রাঁধতে পারত। আর তাদের ব্যবহার এবং সার্ভিসের তুলনা ছিল না।

তারপর বলল, আমি এই বাংলোতে থাকাকালীনই বাঘ চৌকিদারের বউকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে-ই অবশ্য তার শেষ কিল। এই কেশকাল বাংলোর নীচেই তাকে চৌকিদারের বউয়ের ডেডবডির ওপরে মারি। তখন সবে ভোর হচ্ছে।

বলো না, বলো না গল্পটা ঋজুদা।

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, প্রদীপকাকুরাও শুনবে বলেছিল, তোমার কাছ থেকে গাড়িতে এ তথ্য জেনেই। ওঁরা রাগ করবেন। ওঁদের ফিরে আসারও সময় তো হয়েই গেল।

ভটকাই বলল, তা হলে কফিটা কি এখনই বলব, না ওরা এলেই হবে?

তা হলে তাই হোক। ওরা এলেই হবে। পাইপের টোব্যাকো ফুরিয়ে গেছে। আমার ঘর থেকে গোল্ড ব্লক টোব্যাকোর একটা টিন নিয়ে আয় তো।

তুমি কলকাতায় বসে এই ইংলিশ গোল্ড টোব্যাকের অবিরত সাপ্লাই পাও কোথা থেকে?

'সকল পদারথ হ্যায় জগমাহী
কর্মহীন নর পাওয়াত নেহি।' বুঝলে!

এটা কার দোঁহা, সন্ত কবীরের?

না, সন্ত তুলসীদাসের।

তা গোল্ড ব্লক কী করে পাও তা তো বললে না।

আমার বন্ধু ডেভিড ম্যাকফার্সন পাঠায়। যার হাত দিয়ে পারে তার হাত দিয়েই পাঠায়। তবে আর কতদিন পাঠাতে পারবে জানি না।

কেন?

পশ্চিমে তো এখন স্মোক করা আর গোহত্যা সমান অপরাধের ব্যাপার। আর

কতদিন টোব্যাকো বানাবে তাই বা কে জানে?

স্বাস্থ্যর কারণে... আমি বললাম।

সে ওদের দেশে হতে পারে। কলকাতায় কি নিউ দিল্লি বা বম্বেতে, অন্য সব শহরের কথা ছেড়েই দিলাম, পলিউশন যা ভয়াবহ তাতে গড়িয়াহাট বা ধর্মতলায় বা শ্যামবাজারের মোড়ে পনেরো মিনিট দাঁড়ালে যা ক্ষতি তা পাঁচ টিন গোল্ডব্লক টোব্যাকো পাইপে ভরে খেলেও হয় না। এটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের এই পলিউশন কন্ট্রোলের কিছুমাত্র করতে না পেরেও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করার কোনও মানেই আমি দেখি না।

সে কথা ঠিক। ভটকাই বলল।

আমি বললাম, আমিও অনেক মানুষকে জানি যাঁরা কোনওরকম নেশাই করেন না অথচ ক্যানসারে মারা গেলেন, আবার কেউ কেউ সবরকম নেশা করেও আশি-পঁচাশি বছর পর্যন্ত দিব্যি বহাল তবিয়তে আছেন।

ভটকাই বলল, আসলে কী থেকে যে কী হয় তা বলা মুশকিল।

ঋজুদা বলল, আর জীবনের অনেকখানি তো কাটিয়ে দিলাম। তা ছাড়া আমার ক্যানসারই হোক, কি হার্ট অ্যাটাক—সরকার তো আমার চিকিৎসা করবে না, কোনও দায়িত্বও নেবে না। নিজেদেরই যার যেমন সামর্থ্য সেইমতো সর্বস্বান্ত হতে হবে। তবে আবার এত জ্ঞান দেওয়া কেন?

ভটকাই একটু চুপ করে থেকে বলল, তা ছাড়া জীবনের দৈর্ঘ্যটাই বড় কথা নয়, কোয়ালিটি অফ লাইফটাই আসল।

ঋজুদা বলল, বাঃ বাঃ। এ ছোঁড়া বলে কী রে রুদ্র। এ যে দেখছি জ্ঞানতাপস হয়ে গেছে।

ভটকাই ঋজুদার মন্তব্যকে পাত্তা না দিয়ে বলল, সত্যি, তোমার মতো জীবনকে এমন পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ আর কে করেছে? তুমি মরে গেলে তোমার চেলাদের খুব দুঃখ হবে, তোমাকে তারা খুব মিস করবে কিন্তু। তুমি নিজে তো ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে—উইথ নো রিগ্রেটস।

বটে!

ঋজুদা বলল।

ভটকাই বলল, তবে আমার একটা রিগ্রেট থেকে গেল।

সেটা কী?

তোমার জীবন আরও পূর্ণতর হত যদি স্যেশেলসের সেই কোটিপতি মেমসাহেবকে তুমি বিয়েটা করতে। আমরা, তোমার চেলারাও তো মৌজ করে নিতাম। কী যে ভূত চাপে তোমার ঘাড়ে।

'ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে' যাঁরা না পড়েছেন তাঁরা তো সেই মেমসাহেবের কথা জানবেনও না।

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, কেন, মণিপুরের সেই কন্যে? তিনিও কি কম?

যা বলেছিস। ভটকাই বলল।

বহুদিন পরে রুদ্র আমাকে কনট্রাডিক্ট না করে আমার সঙ্গে একমত হল।

ঋজুদা চুপ করে রইল।

আমরা সমস্বরে বললাম, কী হল? তুমি কিছু বলবে না?

ঋজুদা বলল, বলব। এক নম্বর কথা হল। তোরা বড় ডেঁপো হয়েছিস।

ভটকাই বলল, আর দু নম্বর কথাটা?

ঋজুদা বলল, 'সকল পদারথ হ্যায় জগমাহী, কর্মহীন নর পাওয়াত নাহি।'

আমি ভাবছিলাম, ভটকাই জানে না, ও তো দুদিনের সন্ন্যাসী, আর কতদিন আর কাছে এসেছে ঋজুদার? সেই যে 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে' লিখেছিলাম আমি, ঋজুদাকে নিয়ে লেখা আমার প্রথম বই, তাতে ওড়িশার মহানদীর পারের টিকড়পারার বাংলোতে নয়না মাসিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে কেসটা গড়বড়। আর ঋজুদা স্বীকার করুক আর নাই করুক আমার মনে হয় নয়না মাসির ওপরে ঋজুদার ভীষণই দুর্বলতা ছিল। কিন্তু...। এই কিন্তুটাই সকলেরই জীবনে মস্ত এক বাধা।

যাকগে। আমি চুপ করেই রইলাম।

ঋজুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার জীবনানন্দের লাইন মনে পড়ে গেল। 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে হায়, বেদনা জাগাতে চায়।'

আমরা কথাবার্তাতে এমনই মগ্ন ছিলাম যে কেশকালের অপরূপ প্রকৃতির মধ্যে কালবৈশাখীটাকে পুরোপুরি উপভোগই করা হল না। ঝড় থেমে গেছে অনেকক্ষণ। বৃষ্টিও থেমে গেছে তখন। চৈত্রর বৃষ্টির পরে নানা মিশ্র বনগন্ধকে মুখে করে বৃষ্টিশেষের স্নিগ্ধ অশান্ত হাওয়া ল্যাব্রাডর গান-ডগের মতো এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে।

বড় সুন্দর এই সময়টা, বড় স্নিগ্ধ, পূর্ণ। ভাল কোনও সাহিত্য পড়ে ওঠার পরে বা কোনও ভাল গান শোনার পরে মন যেমন শান্ত, সমাহিত হয়ে যায় সেই অভিঘাতে, আমাদের প্রত্যেকেরই তেমনই অবস্থা।

আকাশে কালো মেঘ কালো কেশভারের মতো পরতে পরতে জমে আছে কেশকালের পাহাড়, বনের ওপরে। মাঝে মাঝে শব্দহীন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝরা ফুল, মরা পাতা সেই আলোতে যেন বেঁচে উঠছে।

আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ঋজুদার অর্ডারে গেয়েছিলাম—

'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে,
ওগো পথিক তুমি এসে বসবে বারে বারে।
আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে,
মেঘ জমেছে ওই গগনের দুই নয়নের কোণে।'

ঋজুদা বলেছিল, খুব ভাল গেয়েছিস। রবীন্দ্রনাথ না থাকলে আমাদের যে কী হত।

ভাবছিলাম, সত্যিই তাই।

মুগ্ধ চোখে আমরা বাইরের প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছি। এই চোখ আমাদের দিয়েছে ঋজুদাই। যাকে বলে চক্ষুদান করা, তাই। আক্ষরিক অর্থে নয়, কিন্তু অর্থটা তার চেয়েও অনেক বেশি তাৎপর্যময়। দুটি চোখ কত কোটি কোটি মানুষই তো জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বয়ে বেড়ায়। কিন্তু দেখার চোখ যাকে বলে, তা থাকে কজনের? ঋজুদার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ঋজুদা আমাদের চোখ দিয়েছে, কান দিয়েছে, নাক দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মন দিয়েছে এই নাক-কান-চোখের সম্মিলন ঘটিয়ে। এর চেয়ে বড় উত্তরাধিকার কোটিপতিও তার ছেলেদের দিয়ে যেতে পারে না। ঋজুদা আমাদের প্রত্যেকেরই বাবারই মতন। আমাদের সকলের মা-ই এই কথাতে রাগ না করে খুশিই হবেন।

ঋজুদা 'কোয়েলের কাছে' বলে একটা বই পড়তে দিয়েছিল আমাকে আমার চেলাগিরির প্রথম পর্বে। তার পরেও অনেক ভাল ভাল বই পড়িয়েছে আমাদের সকলকেই। সর্বশেষ বই পড়িয়েছে নৃ-তত্ত্ববিদ রামচন্দ্র গুহর লেখা Savaging The Civilized।

'কোয়েলের কাছে'র মুখবন্ধে একটি ইংরেজি চৌপদী আছে।

'I had an inheritance from my father
It was the Moon and the Sun
I can spend it throughout the World now
And the spending of it is never done.'

পরে ঋজুদার কাছে শুনেছি যে, এই চৌপদী কী একটি স্প্যানিশ কবিতার। স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের সময়ে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিলেন। এক শীতের শেষরাতে হেমিংওয়ে কটি তরুণ যোদ্ধাকে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে গিটার বাজিয়ে এই গানটি গাইতে শুনেছিলেন। এই তথ্য আছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জীবনীতে—যে জীবনীটি প্রফেসর কার্লোস বেকারের লেখা। হেমিংওয়ের নাকি আরও জীবনী আছে। ঋজুদা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের খুব ভক্ত। জীবনের নানা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ঋজুদার মিলও আছে, আবার অনেক ব্যাপারে বৈপরীত্যও আছে যে এটাও ঠিক।

কেশকালের এই কনবাংলোটি উঁচু একটি পাহাড়ের ওপরে। কনবাংলোর লাগোয়া একটি টিলার মাথায় বসবার জায়গা, গোল করে বেঞ্চ পাতা মাথার ওপর ছাউনি দেওয়া। মধ্যপ্রদেশের বহু কনবাংলোতেই এরকম আলাদা বসার জায়গা ও

view-point আছে। অমরকন্টকের পথের লামনির বাংলোতেও আছে। অচানকমারে তো একটি আলাদা, পুরোপুরি কাঠ দিয়ে তৈরি আশ্চর্য ছোট বাংলো ও চওড়া বারান্দা আছে। সামনে ও পেছনে অত্যন্ত চওড়া সে বারান্দা। অবশ্য ওড়িশার সিমলিপাল অভয়ারণ্যেও আছে জোরান্ডা বাংলোতে, যেখানে বসে জোরান্ডার গিরিখাদ দেখা যায় ও প্রপাতের শব্দ শোনা যায়।

আমরা বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে বাংলো-সংলগ্ন সেই টিলাটার ওপরে গিয়ে ঢাকা জায়গাটিতে বসলাম। ভিজে সপসপ করছে। চৌকিদারের একজন চেলা ঝাড়ন হাতে দৌড়ে এসে বেঞ্চগুলো মুছে দিল।

চমৎকার দেখায় এখান থেকে চারদিকের পাহাড়ময় অরণ্যানী। অনেক নীচ দিয়ে চলে গেছে পিচ রাস্তা আঁকাবাঁকা বন আর পাহাড়কে পাক দিয়ে দিয়ে। বৃষ্টিভেজা পিচ রাস্তায় ট্রাক ও বাসের টায়ারের পিচপিচ শব্দ ভেসে আসছে অস্পষ্ট, দূর থেকে। চৈত্র মাসের অরণ্য যে কত রঙা পোশাক পরে থাকে তা বলার নয়। আর তিন দিন বাদেই দোলপূর্ণিমা। চাঁদ উঠলে রাতে এই বনের রূপ আলাদা হয়ে যাবে, অপরূপা, রহস্যময়ী। এখন গন্ধ উড়ছে। মনে হচ্ছে আতরভরতি একটি ট্রাক বুঝি উলটে গেছে বনের মধ্যে আর খসস, ফিরদৌস, হিণ্বা, রাত-কি-রানি, খীল, গুলাব এবং আরও কতরকম আতরের সুবাস ভাসছে বাতাসে।

ঝড়-বৃষ্টি যতক্ষণ হচ্ছিল পাখিরা চুপ করে ছিল। এখন ডাকাডাকি আরম্ভ করেছে। সবচেয়ে বেশি মুখর ক্রো-ফেজেন্ট, তিতির, কপারস্মিথ, পিউ কাঁহা আর কোকিল। পিউ কাঁহার ডাক মাথার মধ্যে ছুরি চালিয়ে দেয়। তাই বোধহয় সাহেবরা এর নাম দিয়েছিল ব্রেইন-ফিভার। যে ডাকে সেও ব্রেইন-ফিভারের রোগী আর যারা তার ডাক শোনে তারাও সেই জ্বরে আক্রান্ত হয়। প্রতি বনেই একটি করে পাগলা কোকিল থাকবেই। কবি যেমন বলেছিলেন, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'—তেমনই বসন্ত আসুক আর নাই আসুক পাগলা কোকিল সবসময় কুহু কুহু করে ডেকে বুকের মধ্যে উহু উহু ভাব চারিয়ে দেয়। প্রকৃতির এসব লীলাখেলা বোঝে বা বোঝায় এমন সাধ্য কার।

ভটকাই কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ঋজুদা বলল, চুপ করে থাক, বড় বেশি কথা বলিস তুই। বনের কী বলার আছে চুপ করে শোন। নিজেই যদি এত কথা বলবি তো বনের কথা শুনবি কখন?

ভটকাই লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

শুধু পাখির ডাকই নয়, বৃষ্টিতে বনের নিচু জায়গাতে যে স্বল্পমেয়াদি ধারার সৃষ্টি হয় তাদের কুলকুলানি, বাতাসের উসখুসানি, পাতাদের নাচানাচি। যে কোনও গাছের পাতাই হাওয়া লেগে উলটে গেলে তার ভিতর দিকটা বেরিয়ে পড়ে—সাদা দেখায়। শাড়িতে বা অন্য পোশাকে সবসময়েই ঢাকা থাকে বলে যে কোনও মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের মুখের রঙের চেয়ে ঢাকা জায়গার রং অনেক ফরসা ও উজ্জ্বল হয়। তেমন পাতাদের পিঠেই রোদ পড়ে, তাই তাদের নীচের রং

সাদাটে ও ফ্যাকাশে হয়। তখন নড়াচড়া করা পাতাদের দেখতে ভারী ভাল লাগে।

আমরা তিনজনে কাছাকাছি বসে ছিলাম। একবার ঋজুদার পাইপ ধরানোর জন্যে লাইটারের খুট করে আওয়াজ হওয়া ছাড়া আমাদের দিক থেকে আর কোনও শব্দ ছিল না। চারদিকের শব্দ আর গন্ধ মঞ্জুরীর মধ্যে আমরা পুরোপুরি সমাহিত হয়ে বসে ছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে ঋজুদা কথা বলল। বলল, কেশকালের ম্যানইটার যখন মারতে এসেছিলাম তখন বস্তারের জঙ্গল অনেক বেশি গভীর ছিল। কেশকালের চারদিকের জঙ্গল তো ছিলই। অনেক রহস্যময় ছিল এই সব বন তখন। গাছ অনেকই কাটা হয়েছে, বন পাতলা হয়ে গেছে চুল উঠে যাওয়া মানুষের মাথার মতো। তোরা প্রথমবার দেখছিস, তাই মনে হচ্ছে কী গভীর বন। আসলে আমি অনেক বছর আগে দেখেছি বলেই বুঝতে পারছি পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতি আমাদের মা। মাকে দেখেশুনে না রাখতে পারলে সন্তানেরা বাঁচবে কী করে—তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে যে, এই কথাটাই অশিক্ষিত মানুষে বোঝে না।

আমি বললাম, শিক্ষিত মানুষেও বোঝে না ঋজুদা। চোরাই কাঠ কিনে রান্না করে, চানের জল গরম করে যেসব শিক্ষিত ভদ্রলোক, নানা রাজ্য সরকারের আমলা, স্কুলের মাস্টারমশাইরা—তারাই আবার জ্বালাময়ী ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের কাছে 'অরণ্য সংরক্ষণের' বিষয়ে ভাবিত হয়ে চিঠি লেখে। এটা ডাবল-স্টান্ডার্ড নয়?

অবশ্যই। ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, পড়তে-লিখতে পারলে, ইংরেজি কপচালেই মানুষ কিছু শিক্ষিত হয় না। শিক্ষাটা অন্য জিনিস, ভিতরের জিনিস। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপককে আমি জানি যাঁদের অশিক্ষিত বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।

তারপর বলল, কানাডাতে একটি গাছ কাটলে দশ বছর জেল হয়। আমাদের দেশেও তেমনই আইন করা উচিত।

ভটকাই বলল, আইন তো শুধু করলেই হল না, সে আইনকে তো মান্য করাতে হবে। সংসদে বা বিধানসভায় চেঁচামেচি করে টেবিল বাজিয়ে দেশপ্রেম দেখিয়ে আইন পাস করলেই কিছু হয় না, সেই সব আইন যাতে দেশের মানুষে মানে তা না দেখলে আইন একটা তামাশাই হয়ে দাঁড়ায়।

ঋজুদা বলল, আমাদের দেশের সব আইন তো তামাশাই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। তা শুধু আজকে নয়, আগেও ছিল। নিজে তখনকার দিনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তর দপ্তরে লেখেননি কি? 'আইন! সে তো তামাশামাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচা করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।' যে আইন মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার কেউই নেই, তখন সে আইন করাটাই অর্থহীন।

ওই যে প্রদীপদারা আসছেন।

ভটকাই বলল।

কী করে জানলি?

সাদারঙা কালিস গাড়িটার এক ঝলক দেখতে পেলাম।

ও, ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, এবারে ভটকাইচন্দ্রর কী ব্যাপার বল তো রুদ্র। খাওয়া-দাওয়াতে মন নেই। কিচেনে মোটে যাচ্ছেই না।

ভটকাই বলল, সকলের জন্যে করে মরি আর তোমাদেরই ঠাট্টা তামাশার পাত্র হই। আইন করারই মতো তোমাদের জন্যে কিছু করাটাও তামাশা যখন, তখন না করাই ভাল।

আমি আর ঋজুদা হেসে উঠলাম ভটকাইয়ের কথাতে।

ঋজুদা বলল, এবারে কফি বল। প্রদীপ গাঙ্গুলি আর প্রদীপ মৈত্র, সঞ্জীব গাঙ্গুলি আর তাপস সাহারা এসে গেল। আর ভটকাই তুই কিচেনেই যখন যাচ্ছিস, তোর কর্তব্যটাও করে আসিস।

ফ্রি হ্যান্ড দিচ্ছ তো?

অ্যাবসুলটলি। তোর দয়াতেই তো আমরা সব জায়গায় খেয়ে বাঁচি, আর কী সব খাওয়া!

ভটকাই খুশি হয়ে বলল, যাই তাহলে।

যা। প্লিজ।

তারপর বলল, নাগপুরের ওরা সবাই আমাদের জন্যে কত কী করছে বল?

সত্যি।

সুদীপ্ত কাকু আসতে পারলেন না বলে মন খারাপ লাগছে।

কী যেন পদবি সুদীপ্তর।

ভট্টাচার্যি।

খুব নলেজেবল ছেলে।

ঋজুদা বলল।

সাদা টয়োটা-কালিস গাড়িটা পাহাড় উঠে আসছে কেশকাল বাংলোর দিকে। ওঁরা এলে, কফি খাওয়া হলে, ঋজুদাকে চেপে ধরতে হবে কেশকাল-এর মানুষখেকো মারার গল্পটার জন্যে। ওইরকম রোমহর্ষক গল্প শোনার জন্যে কেশকাল-এরই ওই টিলার ওপরের ছাউনির চেয়ে ভাল সেটিং আর কী হতে পারে! ঋজুদা আর আমাদের নিয়ে প্রদীপ কাকুরা জগদলপুর, নারায়ণপুর, ইন্দ্রাবতী নদী এবং সম্ভব হলে অবুঝমারেও যাবে। ঋজুদা তো বলেইছে যে অবুঝমারে যেতে পারলে নারায়ণপুর আর ছোটিডোঙ্গরির মধ্যে একটি পরিত্যক্ত ঘোটুলে আমাদের বাইসন-হর্ন মারিয়াদের নাচও দেখাবে।

আমরা টঙে বসে আছি দেখে ওঁরাই সবাই উঠে চলে এলেন। চৌকিদারের

একজন চেলা কয়েকটা চেয়ার নিয়ে এল।

ঋজুদা বলল, কী হল?

এখনও বোঝা যাচ্ছে না। নারায়ণপুরে গেলে বোঝা যাবে। কতগুলো ফর্মালিটি আছে। দিনকয় আগে নাকি কয়েকজন ট্যুরিস্ট পারমিশন নিয়ে অবুঝমারে কী সব অসভ্যতা করেছে মেয়েদের সঙ্গে। তাদের মারও লাগিয়েছে বাইসন-হর্ন মারিয়ারা। আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত হয়ে আছে। তাই ওরা দিকুদের আর কেশ কিছুদিন ঢুকতে দেবে না বলেছে। তা নইলে আপনি গভর্নর সিনহাসাহেবের অতিথি, আপনাকে এবং সঙ্গে আমাদেরও না ঢুকতে দেওয়ার কোনও কারণই ছিল না।

ঋজুদা বলল, বাইসন-হর্ন মারিয়ারা খুবই অনুভূতিপ্রবণ। ছেড়ে দাও। পরে আবার কখনও যাওয়া যাবে। আমাদের অসভ্যতা-অভব্যতার কারণেই ওরা বিরূপ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এখন তো বস্তার ছত্তিশগড়ে। ছত্তিশগড় সরকার এসব অসভ্যতা আদৌ বরদাস্ত করবে না। করা উচিতও নয়। আমাদের ব্যবহারই ওদের তিক্ত করে দেয়। পূর্ব আফ্রিকাতেও দেখেছি, মাসাইরা শহরে অনাদিবাসী মানুষদের ওপরে এতটাই বীতশ্রদ্ধ যে কেউ ফটো তুলতে ক্যামেরা বাগালেই ওরা হাতের বর্শা ছুড়ে মারে। রুদ্র একবার খুব বেঁচে গিয়েছিল গোরাংগোরোর মৃত আগ্নেয়গিরির বলয়ের ওপরে একজন মাসাই-এর ছবি তুলতে গিয়ে। নেহাত বর্শাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। জিপের বনেটের ওপরে এসে পড়ে বনেট ফুটো করে দিয়েছিল। রুদ্রবাবু তিনদিন নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে কাহিল হয়েছিলেন। বাবুকে জিজ্ঞেস করো না।

সকলেই সমস্বরে বললেন—তাই? রুদ্র?

আমি বললাম, শুনলেনই তো। আর কী বলব। সত্যিই আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছিল। মাসাইরা সিংহের চেয়েও সিংহ-বিক্রম।

শুনেছি, মাসাই মেয়েরা নাকি এমন ছেলেকে বিয়েই করে না যে পায়ে হেঁটে বর্শা দিয়ে একটা সিংহ না মেরেছে। সত্যি?

প্রদীপ মৈত্র কাকু বললেন।

এখন অনেক বদলে যাচ্ছে ওরা। তথাকথিত সভ্যতার চাপে। তবে এখনও এ প্রথা অনেক জায়গাতেই আছে।

আমি বললাম, বাংলাতে একটা বই আছে, 'ইলমোরানদের দেশে'—মাসাইদের নিয়ে লেখা। লেখাটি পড়লে সব জানতে পারবেন।

তোমার লেখা?

সতীশ কাকু জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, না, না, আমার লেখা নয়।

ঋজুদা বলল, বুদ্ধদেব গুহর লেখা।

ইলমোরান মানে কী?

মাসাই যুবক যোদ্ধাদের ইলমোরান বলে।

ওরা গার্হস্থ্য জীবনে ঢোকার আগে জঙ্গলের মধ্যে আলাদা একটি ক্যাম্পে থাকে—শুধুই ইলমোরানরা। সেখানে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তারপর সিংহ শিকার করে বিয়ে করে সংসারী হয়।

ততক্ষণে কফি এসে গেছে। পেছন পেছন ভটকাইও।

ঋজুদা বলল, কী সমাচার মিস্টার ভটকাই?

রাতের খাওয়াটা সিম্পলই করলাম। কাল তো আমরা নারায়ণপুরেই পৌঁছে যাব। প্রদীপকাকু বলেছেন জগদলপুরেও এয়ারকন্ডিশানড ভাল হোটেলে থাকব আমরা। সে হোটেলে মোগলাই, চাইনিজ এবং পাঞ্জাবি খাবারও পাওয়া যায়। সেখানে তো ভাল চোব্য-চোষ্য হবেই, তাই।

তা মেনুটা কী করলি তাই বল না।

আমি বললাম।

সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডা পড়ে গেছে পাহাড়ে। তাই মুগের ডালের খিচুড়ি, মধ্যে কিশমিশ আর নারকোল কুচি দিয়ে, মুসুরির ডালের বড়া, ফিনফিনে করে কাটা আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, শুকনো লঙ্কা ভাজা আর সুইট ডিশ তো প্রদীপ কাকুরা নিয়েই এসেছেন শহর থেকে।

প্রদীপ গাঙ্গুলি কাকু লজ্জা পেয়ে বললেন, শহর কোথায়! যেখানে গেছিলাম সেটা কি শহর। লাড্ডু-মাড্ডু ছিল কিছু তাও মনে হল বাসি। তোমার রাবড়ি তো পেলাম না।

ভটকাই বলল, নো প্রবলেম। একটা অল্টারনেটিভ মেক-শিফট বন্দোবস্ত করে আসছি। পাঁচ মিনিট।

বলেই ভটকাই টঙ থেকে নেমে গেল।

কফিটা খেয়ে যা।

ঋজুদা বলল।

এসেই খাচ্ছি। ঠান্ডা কফি খেলে গায়ের রং ফরসা হয়।

সঞ্জীব কাকু বললেন, তুমি আরও ফরসা হয়ে গেলে তো তোমার মা-বাবা ঝামেলাতে পড়বেন। লোকে ভাবতে পারে তুমি সাহেবের বাচ্চা।

সে তাদের প্রবলেম। আমি ফিরে আসার আগে যেন গল্পটা শুরু কোরো না ঋজুদা।

ভটকাই নেমে যেতেই ওঁরা সবাই কফি খেতে খেতে ঋজুদাকে চেপে ধরলেন, বললেন, কেশকাল-এ বসে কেশকাল-এর বাঘের গল্পটা না শুনলে আর কোথায় শুনব বলুন? কফি খেয়ে পাইপটা ফিল করে নিয়ে এবারে শুরু করতে হবে কিন্তু ঋজুদা।

হবে।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, ভটকাই ফিরুক। নইলে ও কেটে ফেলবে।

ভটকাই যেমন বলেছিল তেমনই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল।

আমি বললাম, কী করলি? অল্টারনেটিভ?

বলল, যা করলাম তা কেউই খায়নি আগে।

কী করলি তাই বল না।

এর নাম দিলাম হানি-পোটাটো।

মানে?

টোম্যাটোর মিষ্টি চাটনির ড্রেসিং দিয়ে আস্ত আলুসেদ্ধর মধ্যেটা ফুটো করে তার মধ্যে বস্তারের মধু ভরে মুখটা আবার আলুসেদ্ধ দিয়ে সিল করে দেবে। আলুতে কামড় দিবি আর গলগল করে মধু ঢুকবে মুখে।

কী ফুলের মধু?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

গুন্দরী ফুলের। বস্তার স্পেশ্যাল। দেখো না, জমে যাবে।

নামটা বানালি, না?

আমি বললাম।

ভটকাই হেসে ফেলে বলল, না-হয় বানালামই। বানাতে কি সকলে পারে! ভাইবাভোস-এর জন্যে রিহার্সাল দিচ্ছি। ফটাফট উত্তর দেওয়াটাই আসল। ইন্টারভিউ বোর্ডে তো থাকে যত পাঁঠা। তাদের জব্দ করতে হলে এমনই ফটাফট উত্তর দিতে হয়।

কীসের ভাইভা?

প্রদীপ কাকু বললেন।

এখনও কিছু ঠিক নেই। তবে একদিন না একদিন তো বসতে হবেই। এখন থেকে মহড়া দিয়ে রাখছি।

প্রদীপ মৈত্র কাকু বললেন, দুটি চেলা তৈরি করেছেন বটে ঋজুদা।

আমি আর কী তৈরি করব, তারাই আমাকে তৈরি করছে। আমাকে এরা এক হাটে কিনে অন্য হাটে যে কোনওদিন বেচে দিয়ে আসবে।

কফি খাওয়া শেষ, এবারে গল্প শুরু হোক।

এই কো-ইনসিডেন্সটা যদিও কাকতালীয় কিন্তু এমনই এক কালবৈশাখী ওঠা চৈত্র দিনে আমি নাগপুর থেকে জিপে করে এসে কেশকাল-এ পৌঁছেছিলাম। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গিয়েছিল, আমাদের যেমন হল। তবে তখন রাস্তা রায়পুর শহর থেকে বেরোনোর পরেই পুরো কাঁচা ছিল। পথে রাতে এমনিতেই লোকজন যাবে না জঙ্গুলে জায়গায়, তার ওপরে ম্যানইটারের অঘোষিত কার্ফু। ইতিমধ্যেই বাঘটা চৌত্রিশজন মানুষ খেয়েছিল পঞ্চাশ বর্গমাইল, মাইল, কিমি নয়, এলাকাতে।

মাইল কেন?

তখন মাইলই ছিল। কিলোমিটার আসেনি এ-দেশে। টাকা আনা পাইও ছিল। ষোলো আনাতে এক টাকা।

তারপর?

পথে কোনও গাড়ি বা বাসও দেখলাম না। রাতের বেলা জীবন এ অঞ্চলে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেত।

নাগপুরে, রায়পুরে এত ভাল ভাল শিকারি থাকতে আপনাকেই কলকাতা থেকে তলব করলেন কেন কর্তৃপক্ষ?

জানি না। তাঁদের হয়তো মতিভ্রম হয়েছিল। আসলে ব্যাপারটা কী জান? যশ একটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার। যশস্বী হওয়ার জন্যে, সে কারণেই জীবনের সব ক্ষেত্রেই গান, সাহিত্য, খেলাধুলো যে ক্ষেত্রেই বল, মানুষের কেমন আকুতি দেখতে পাও না? তবে গান বা খেলাধুলোর ক্ষেত্রে ফল ফ্লুকে পাওয়া যায় না। গেয়ে দেখাতে হয়, খেলে দেখাতে হয় কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে ছাইভস্ম লিখেও তুমি স্ট্রিং-পুলিং করে প্রাইজের পর প্রাইজ বাগিয়ে মস্ত লেখক বলে প্রতিপন্ন করতে পার নিজেকে। জীবদ্দশায় তুমি ক্যান্টার করে বেরিয়ে যেতে পার কিন্তু মৃত্যুর পরে তুমি যে মাকাল ফল এটা পাঠক-পাঠিকারা হৃদয়ঙ্গম করে পোটকা মাছের মতো তোমাকে ফুটপাথে ফেলে দেবে। মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই তুমি বিস্মৃত হয়ে যাবে। সত্যিই এমন হয় যশ যেখানে চালাকি করে পাওয়া হয়।

শিকারি আপনার বেলাতে কী হয়েছিল?

আসলে অনেকগুলো মাথামোটা আর ব্যর্থ প্রেমিক নরখাদক বাঘ ও চিতা আমার হাতে মরে আমাকে শিকারি হিসেবে দারুণ যশস্বী করে দিয়েছিল। কৃতিত্বটা আমার একটুও নয়, সেসব সেই গুলিখোর নরখাদকের। তা ছাড়া, কথাতেই বলে না nothing succeeds like success! fluke-এও আমার মতো অনেকে যশস্বী হয়ে যায়, আর সেই যশের চক্করে মধ্যপ্রদেশের কর্তৃপক্ষও পড়লেন। এখানের নানা সংবাদপত্রে চিঠি বেরোতে লাগল কলকাতা থেকে ঋজু বোসকে আনানো হচ্ছে না কেন? আর কত মানুষকে বাঘ দিয়ে খাওয়ানো হবে? মধ্যপ্রদেশ বিধানসভাতেও কোনও কোনও বিধায়ক এ নিয়ে চেঁচামেচি করলেন। তারপরই ওঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তোমরা যে কথা বলছ আমিও ঠিক সেই কথাই বললাম, বললাম নাগপুর, রায়পুরে এত ভাল শিকারি থাকতে আমাকে ডাকা কেন? তা ওঁরা বললেন, এই হতচ্ছাড়া বাঘে তিনজন শিকারিকেও খেয়ে ফেলেছে। কেন আপনাকে ডাকছি তা নিয়ে আলোচনা করবেন না প্লিজ, ওপর থেকে চাপ আছে আমাদের ওপরে, দয়া করে চলে আসুন নেক্সট ফ্লাইটে।

অতএব আসতে হল।

ভটকাই বলল, এসব আজেবাজে কথা আমরা শুনতে চাই না। স্ট্রেইট জঙ্গলে চলে এসো। বাঘের সঙ্গে এনকাউন্টারে।

সকলেই বললেন, ঠিক বলেছে ভটকাই। ডিনারের আগে তো গল্প শেষ করতে

হবে। আজ তাড়াতাড়ি খেতে হবে। এখান থেকে নারায়ণপুর অনেকখানি পথ। নিন শুরু করুন।

সেদিন রাতে এসে তো শুয়ে পড়লাম।

কী কী ওয়েপন এনেছিলে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

রাইফেলের মধ্যে ফোর-ফিফটি ফোর হানড্রেড ডাবল ব্যারেল জেফরি নাম্বার টু। খুব ভাল মারত রাইফেলটা আর ম্যানুভার করতেও খুব সুবিধা ছিল। একেবারে হাতের রাইফেল। আর থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার শুনার—লাইট রাইফেল। এক্কেবারে আকুরেট। আর বন্দুকের মধ্যে একটা টুয়েলভ বোর ওভার-আন্ডার ডাবল ব্যারেল।

ওভার আন্ডার হলে তো ডবল ব্যারেলই হবে।

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, ঠিক বলেছিস। আমার বোকামি হয়েছে।

সঞ্জীব কাকু বললেন, এসব রাইফেল-বন্দুকের ব্যাপার আমরা বুঝি না। আসল গল্পে আসুন।

ঋজুদা বলল, সকলেই তো আমার মতো খালি গলার গায়ক নন! যাঁরা সত্যিকারের ভাল গায়ক, তাঁদের গানে বসার আগে তানপুরা, এসরাজ অথবা বেহালা, তবলা সব বেঁধে নিতে হয়। পিচ-পাইপ দিয়ে সুর বের করে প্রত্যেক যন্ত্রী ও বাজিয়ে নিজের নিজের বাজনা ঠিক স্কেলে বেঁধে নেওয়ার পরই গায়ক আলাপ আরম্ভ করেন। শিকারিও যদি তাঁর যন্ত্র সব ঠিকঠাক না বেছে নেন আগেভাগে তখন আসল সময়ে সব গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে, যায়ও।

তারপর বলো।

ভটকাই বলল।

পরদিন সকালে আশপাশের বহু গাঁয়ের মুখিয়ারা এল। এসে তাদের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা জানাল। তারা দুজন জংলি শিকারিকেও নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। তাদের একজনের নাম প্রেমা, অন্যজনের নাম ভীমা। প্রেমা লোকটি একটু বেশি কথা বলে। সে একটা আসন গাছের ডালে বসে মওকা পেয়ে তার একনলা গাদাবন্দুক দিয়ে এই বাঘকে নাকি গুলিও করেছিল।

তারপর ঋজুদা বলল, গুলি করেছিল যখন তখন বাঘকে মারা উচিত ছিল। এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন শিকারিরা বাঘকে যত্রতত্র গুলি করাতেই বাঘ মানুষখেকো হয়ে ওঠে। লোকটা নিজেকে বাহাদুর মনে করে। তদুপরি বাঘটা মারতে হলে আমাকে কী কী করতে হবে তাও বাতলাচ্ছিল, অবশ্য যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই। লোকটাকে আমার পছন্দ হল না। অগণ্য জংলি শিকারিকে ভারতের এবং আফ্রিকারও জঙ্গলে আমি দেখেছি। যারা প্রকৃতই ভাল শিকারি তারা কথা কম বলে এবং এমন ভাব দেখায় যে তারা শিকারের কিছুই জানে না। খুবই বিনয়ী হয়।

ওর চেয়ে ভীমা লোকটিকে আমার ভাল লাগল। লোকটির পায়ে একটু অসুবিধে আছে। বাঁ পায়ে। সামান্য খুঁড়িয়ে চলে। শুয়োরে তার উরু চিরে দিয়েছিল, তখনই কোনও নার্ভ-টার্ভ ছিঁড়ে গিয়েছিল হয়তো, সে সময়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপরে দাঁত চালিয়েছিল শুয়োর।

আমি রেঞ্জারকে তেমনই বললাম। রেঞ্জার ওরা আসার পরেই তাঁর সাইকেলে করে এসে পৌঁছেছিলেন। ভীমাই আমাকে সাহায্য করবে। সে বড় গরিব। তার নিজের বন্দুক নেই। গাদাবন্দুকও নয়। এ গ্রাম সে গ্রামের বড়লোকেরা তাদের বন্দুক আর কার্তুজ দিয়ে ভীমাকে দিয়ে শুয়োরটা হরিণটা মারাত। জঙ্গলে যে মুরগি মারার জন্যেও ঘোরে তারও বাঘের সম্বন্ধে ধারণা থাকে। মুরগি মারতে গিয়েও বাঘের সামনে তাকে বহুবার পড়তে হয়। বাঘ ও চিতাও সে মেরেছে। তবে নানা গাঁয়ের বড়লোক আর বড়লোক শহুরে শিকারিদের জন্যে। গাঁয়ের বড়লোকেরা বাঘছালের ওপরে বসে পুজো করছে আর শহুরে শিকারিরা শহরে ফিরে বউ, শালি আর শাশুড়ির কাছে হিরো বনেছেন।

আজকে পাদরিকে বলারই মতো সকলেই সত্যি কথা বলছে। আমাকে ওরা কনফেশানাল করেছে। সব বে-আইনি কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছে রেঞ্জারের সামনেই। আজকে কেউই তাদের অপরাধ নেবে না, কারণ এখন নরখাদক বাঘ মারাটাই আশুকর্তব্য। সেই বড় কাজে সামিল হয়ে ছোটখাটো অপরাধের কথা আর কেউই মনে রাখতে চায় না।

রেঞ্জার সূরযপ্রসাদ ওয়াভালকারও দেখলাম যথেষ্ট টেনশনে আছেন। তাঁর চোখমুখ শুকিয়ে গেছে টেনশনে। তা ছাড়া তাঁকে ওই নরখাদক বাঘের জঙ্গলে এখন পনেরো মাইল সাইকেল চালিয়ে ফিরে যেতে হবে। বাঘটা ইতিপূর্বে দুপুরবেলাতেও মানুষ মেরেছে তার মধ্যে দুজন সাইকেল আরোহীও ছিল। তাঁর ভয়টা অমূলকও নয়।

সকলের সঙ্গে আলোচনা করে যা বোঝা গেল তাতে জানা গেল যে সেটা বাঘিনী এবং চেহারাতে খুব বড়সড়ও নয়। তার মানে বেশি বয়স নয়। তবে তার বিয়ে হয়েছে। কারণ মানুষখেকো হয়ে যাওয়ার আগে জঙ্গলের মানুষ আর জংলি শিকারিরা তাকে অন্য বাঘের সঙ্গে দেখেছিল। তার তিনটি বাচ্চাও হয়েছিল। তবে একটি বাচ্চাও বড় হওয়া অবধি বাঁচেনি। বাঘে দু-একটি খেয়েও ফেলতে পারে এবং বাচ্চারা হয়তো বা শিকারির গুলিতে মরে গিয়েও থাকতে পারে। বাচ্চাদের কী হয়েছিল তা জানে না কেউই।

এই বাঘিনীর ওপরে অনেক শিকারি গুলি চালিয়েছিল। সামনের বাঁ পা-টি খোঁড়া আছে সামান্য। সেও ভীমার মতো খুঁড়িয়ে হাঁটে। এর চেয়ে বেশি তথ্য আপাতত পাওয়া গেল না।

রেঞ্জার সাহেবকে বলে ভীমার কেশকাল বাংলোতেই থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। আমাকে সে যে মদত দিচ্ছে সেটা রেঞ্জ অফিসের রেকর্ডেও নথিভুক্ত

করে নিতে বললাম।

তারপর?

সঞ্জীব কাকু বললেন।

তারপর বেলা এগারোটা নাগাদ রেঞ্জার সাহেব এবং ওরা সকলেই চলে গেল। আমি চৌকিদারকে বললাম, বারোটার সময়ে ভীমাকে খাবার দিয়ে দেবে এবং আমাকেও। আধ ঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে আমরা জঙ্গলে বেরোব প্রাথমিক তদন্তে। বাঘের রাহান-সাহানের খোঁজ যদি কিছু মেলে সেই জন্যে আমরা বাঘকে ভয় করছি না। বাঘেরই উচিত হবে আমাদের ভয় করা। বাঘ যদি আমাদের ধরতে আসে, তাহলে তো আমাদের কার্যসিদ্ধিই হয়ে যাবে। মানুষখেকো বাঘ, যে বাঘ তিনজন শিকারিকে ইতিমধ্যেই খেয়েছে, তার হয়তো শিকারির মাংস খেতে ভাল লাগে। আমার যেমন বাঘের মাংস খেতে একটুও ভাল লাগে না। ওড়িশাতে একবার চেখে দেখার জন্যে বাঘের মাংস খেয়েছিলাম। মুখে দিয়েই ফেলে দিয়েছিলাম। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এসেছিল। তাই বাঘের মাংস খাওয়ার কোনও ইচ্ছাই আমার নেই।

ভীমাকে আমার ওভার-আন্ডার বন্দুকটা দিয়েছি। কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও দেখিয়ে দিয়েছি। আমার নির্বাচন ভুল হয়নি। ওই মিতবাক মানুষটি খুবই বুদ্ধিমান। ও এসেছিল একটা লালরঙা জামা ও ধুতি পরে। জামাটার বগলের কাছটা ছেঁড়া, ধুতিটাও নানা জায়গাতে ছেঁড়া। ওকে যখন বললাম, তোমার আর অন্য জামা নেই? ও বলল বাড়িতে আর একটা আছে সেটা নীল রঙের। ধুতি আরেকটাই আছে মাত্র।

তারপর ঋজুদা বলল, প্রদীপ গাঙ্গুলি কাকুকে, শহরে তোমরা যেমন নাইকে বা লেভি'স বা অন্যান্য ব্র্যান্ডের শার্ট কেনো বহু দাম দিয়ে, তখন ভীমাদের ওয়াড্রোব বলতে মাত্র দুটি ছেঁড়া ধুতি ও ছেঁড়া শার্ট। চৌকিদারকে বললাম, ওদের কারও একটা খাকি জামা আর খাকি প্যান্ট ভীমাকে দিতে, আমি রেঞ্জার সাহেবকে বলে দেব ওদের নতুন ইউনিফর্ম দিতে। ভীমার জন্যেও দু সেট ইউনিফর্ম লাগবে নতুন, ভীমা এখন বনবিভাগেরই কর্মী। আমি অলিভ-গ্রিন রঙা বুশ শার্ট আর ট্রাইজার পরেছিলাম।

একটি কাঁধে-ঝোলানো থলিতে একটি পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আমেরিকান বন্ড কোম্পানির, একটি দু ব্যাটারির টর্চ, আমার জলের বোতল ওপরে ফ্ল্যানেল দেওয়া, একগাছি সিল্কের দড়ি—বেশ অনেকখানি লম্বা, প্রয়োজনে মাচানবাঁধা বা গান ট্র্যাপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে আর একটি রেমিংটনের ছুরি।

থলেটা ভীমাই নিয়েছে কাঁধে। ভীমা আমার সামনে সামনে চলেছে। নারকোলের দড়ি দিয়ে বেল্ট করেছে ঢোলা প্যান্টকে শাসন করার জন্যে।

প্যান্টটার মধ্যে আমি শার্টটা গুঁজে নিতে বলেছি। বন্দুকটা ডান কাঁধে নিয়ে থলেটা বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে আমার পথপ্রদর্শক, সঙ্গী গাইড বড় গরিব ভীমা, আমার ভারতীয় ভাই, খালি পায়ে নিঃশব্দে কাঁটা এড়িয়ে শুকনো পাতা এড়িয়ে বাঘেরই মতো সাবধানী পা ফেলে ফেলে চলেছে। বৃষ্টিতে মাটি নরম, মাটিতে পড়ে থাকা কোনও পাতাই এখন শুকনো নয়, পা পড়লেও শব্দ হবে না, কিন্তু সাবধানে এবং নিঃশব্দে চলা অভ্যাস হয়ে গেছে বলেই অমনি করে চলেছে ভীমা। আমার পায়ে হালকা রাবার সোলের জুতো। আমারও সাবধানে চলা বহু বছরের অভ্যেস। ভীমার পেছন পেছন ফোর-ফিফটি ফোর হানড্রেড রাইফেলটা নিয়ে আমি চলেছি। রাইফেলটা খুব না হলেও ভারী। কিন্তু ফিরতে রাত হতে পারে, এমনকী রাতে ফেরা না-ও হতে পারে বলেই এই রাইফেলটা নিয়েছি। অন্ধকারেও ওর মার কাজে আসবে।

আমরা কথা বলতে বলতে চলেছি। বাঘ যদি আমাদের উপস্থিতি টের পায়, তবে সে-ই আমাদের খোঁজে আসবে। জানি না, এ বাঘ শিকারি চেনে কিনা, চিনতেও পারে, তিন-তিনজন শিকারিকে সে খেয়েছে, কিন্তু তবু শিকারিও তো মানুষ। মানুষ খেয়েই যখন সে বাঁচছে তখন, শিকারিকে ভয় না পেয়ে মানুষ বিচার করেও সে আসতে পারে কাছে।

এই ওভার-আন্ডার ব্যাপারটা কী।

ভেল-এর ইঞ্জিনিয়ার তাপস কাকু প্রশ্ন করলেন।

ঋজুদা বলল, দোনলা বন্দুকের সচরাচর নল দুটি পাশাপাশি থাকে, আর ওভার-আন্ডারে নল দুটি ওপর-নীচে থাকে।

তাতে লাভ কী হয়?

লাভ কিছু বিশেষ হয় এমন নয়। দোনলা বন্দুকে একনলা বন্দুকের চেয়ে যে বেশি লাভ হয়, তাই হয়। তবে অনেক শিকারি মনে করেন, ওভার-আন্ডারের ম্যানুভারেবিলিটি পাশপাশি নলের বন্দুকের চেয়ে বেশি। তাড়াতাড়ি নিশানাও নেওয়া যায় এতে।

আপনিও মনে করেন তাই?

আরে ব্যাটসম্যানের যেমন অনেক ব্যাট থাকে, লেখকের যেমন অনেক কলম থাকে, শিকারিরও তেমন অনেক বন্দুক থাকে। শখের জন্যেই সকলেই সংগ্রহ করেন। কাজ তো হয়তো একটি রাইফেল ও একটি বন্দুকেই চলে যেতে পারে। কিন্তু বহু বন্দুক ও রাইফেল রাখেন শৌখিন শিকারিরা। যতটা শখের জন্যে; ততটা প্রয়োজনের জন্যে নয়।

তারপর? ভটকাই বলল।

ভীমা আগে আগে চলছিল, কারণ সে নাকি একটা পাহাড়কে জানে, যেখানে অনেকগুলো গুহা আছে। ওর ধারণা, এই বাঘিনীর আসল আস্তানা ওই পাহাড়েরই কোনও গুহা। যোগ্য হাতিয়ার এবং যোগ্য সঙ্গীর অভাবে সে কোনওদিন সেই

গুহার সন্ধানে যেতে পারেনি। আজ আমার মদতে সে সেইখানেই চলেছে।

তোমার বাড়িতে কে কে আছে? আমি ভীমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

বউ, এক ছেলে আর মা। বাবা মারা গেছে গাছ চাপা পড়ে, গাছ কাটতে গিয়ে অনেকদিন আগে।

তোমাদের খেতি-জমিন আছে?

তা থাকলে তো দুঃখই ছিল না। একটা মস্ত তেঁতুল গাছতলাতে বসতবাড়িটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের।

সংসার চলে কী করে?

চলে না হুজৌর। সে চলাকে চলা বলে না।

তুমি কিছুই কর না?

ওই। কেউ কিছু মেরে দিতে বললে মেরে দিই। এক টাকা, দু টাকা দেয়। কেউ পাঁচ দশ টাকাও দেয়। শহরের বড়লোক শিকারিরা এলে বেশি দেয়। তবে সে তো ন মাসে ছ মাসে। তবে হরিণ, শুয়োর মারলে একটু মাংসের ভাগ পাই, মানে শিকার। তাই খেয়ে বড়লোকি করি এক-দুদিন।

তারপর ঋজুদা বলল, তোমরা সব ফিগার-কনসাস ক্যালরি, হার্ট, ক্লোরোস্ট্রোল কনসাস স্বচ্ছন্দ মানুষেরা যখন ফ্যাট-ফ্রি দুধ, lean meat, পোলট্রি চিকেন খাও, ডি-ক্যাফিনেটেড কফি ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন একজন জঙ্গুলে সাধারণ ভারতীয় একটু প্রোটিনের জন্যে হা-পিত্যেশ করে মরে। মেনকা গান্ধীরা সব জানেন না। এদের কাছে মাংসের আরেক নাম শিকার। মাংসকেই এরা শিকার বলে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশাতেও। কালে-ভদ্রে বছরে চার-পাঁচবার একটু প্রোটিন ওরা খেতে পায় ওই শিকার করা মাংসেরই মাধ্যমে। ওদের কারওরই পাঁঠা, হ্যাম বা বেকন বা চিকেন বা বিফও কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সমান গরিব। আসল ভারতবর্ষ যে তিমিরে ছিল ব্রিটিশরাজের অধীনে সেই তিমিরেই আছে স্বরাজ পেয়েও। ব্রিটিশদের আমলে তবু আইনশৃঙ্খলার বাঁধনটা ছিল। দেশ স্বাধীন হয়ে সে বালাইও গেছে। আফগানিস্তানে বা অন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট্ট দেশে স্বাধীনতার যে প্রকার, আমাদের দেশেও তাই। এ দেশীয় মিডিয়া এবং নেতারা দেশের কোনও খবর রাখেন না। দেশ চলেছে নৈরাজ্যের দিকে আর নেতাদের বক্তৃতার ফুলঝুরি আরও জোর হচ্ছে—মিডিয়া বিজ্ঞাপনের লোভে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। কনজ্যুমারিজমের রমরমা। আরও টাকা আরও ক্ষমতার প্রতিযোগিতাতে সামিল হয়েছে তারা সবাই। দেশের কথা কে ভাবে।

এই ভীমা সিং-রাই গড়পড়তা ভারতীয়দের প্রতিভূ। শহুরে সচ্ছল ভারতীয়দের হিসেবে নিয়েও Mean, Median, Mode কষে দেখলে তার নিট ফল হবে ভীমা সিং। ভারতবর্ষ ভীমা সিংদের অবস্থাতেই আটকে আছে। কিছু কেতাবি আর খেতাব-পাওয়া অর্থনীতিবিদ তাঁদের থিওরেটিকাল কপচানি দিয়ে দেশকে আরও

বড় সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এই সব অর্থনীতিবিদ দেশকেই জানেন না, বছরে তিনদিন দেশে এসে বক্তৃতা করেন দেশ সম্বন্ধে। হাস্যকর ব্যাপার-স্যাপার। আর এদেরই মাথায় চড়িয়ে লাফালাফি করি আমরা।

আমি বললাম, হচ্ছিল মানুষখেকো বাঘ মারার গল্প, তুমি দেখছি ইকনমিস্ট মারার গল্পে চলে গেলে।

ঋজুদা হেসে বলল, ইচ্ছে করে ঐইসব ইকনমিস্টকে ধরে ধরে বাঘ দিয়ে খাইয়ে দিই। কিন্তু আমার ইচ্ছার দাম আর কে দেবে?

ভটকাই বলল, গাড়ি ডিরেইলড হয়ে যাচ্ছে। ট্র্যাকে ফের।

শিকার আর বছরে কতদিন কর। অন্য সময়ে কী কর। আমি ভীমাকে শুধোলাম।

শিকার মাসে তিন-চারদিন করি গড়ে। অন্য সময়ে যে কাজ পাই তাই করি। কখনও জঙ্গলে ক্যুপ কাটি, কখনও ট্রাকে মাল লাদাই করি, বললামই তো হুজৌর যে যা করতে বলে তাই করি।

বলেই ঋজুদা বলল, ভীমা সিং যে চুরি-ডাকাতি করে না, না খেয়ে থেকেও যে সৎ আছে, এ-ও এক ভারতীয় শিক্ষা। শহরের লেখাপড়া জানা সচ্ছল বামুন, কায়েত, শিডিউল্ড কাস্ট, শিডিউল্ড ট্রাইব—সকলে মিলে হাতে হাতে মিলিয়ে যখন লুট-মার চালাচ্ছে তখন ভীমা সিংরা না খেয়ে রয়েছে। এর পরও যদি তারা নকশাল হয়ে যায়, এম সি সি-তে যোগ দেয়, তাহলে কি ওদের দোষ দেওয়া যায়?

আমি এবারে বললাম, গল্পে ফেরো ঋজুদা। মাঝে মাঝেই দেশ তোমাকে ছারপোকার মতো কামড়ায়।

ঋজুদা গম্ভীর হয়ে বলল, কী করব! আমার দেশকে যে আমি ভালবাসি, আমার দেশের বিভিন্ন রাজ্যের দীনদরিদ্র মানুষদের যে আমি কাছ থেকে দেখেছি। তাদের জন্যে আমার সত্যিই যে দরদ আছে। তাদের কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

প্রদীপ গাঙ্গুলি কাকু বললেন, আপনার কথা রুদ্রর কলমে আমরা বহুদিন হল পড়ে আসছি। আপনাকে রুদ্রর ঋজুদা কাহিনিগুলির মাধ্যমে স্পষ্টই চেনা যায়। আমরা চিনতে ভুল করিনি। আপনি তো আমাদের মতো অনেক মানুষের মধ্যে এই দেশপ্রেম জাগিয়ে দিয়েছেন। এইটুকুই বা কম কী?

আমি জাগাইনি, রুদ্র রায় জাগিয়েছে। সব কৃতিত্ব তারই।

ওই হল। আপনার কথাই তো সে লিখেছে।

ভটকাই বলল, এ কী পারস্পরিক পিঠ চুলকানি শুরু হল রে বাবা। বাঘের গল্প আর হবে না। আমি যাচ্ছি চান করতে। খিচুড়িটা এনজয় করতে হবে।

ঋজুদা বলল, বোস বোস। এবারে কথা দিচ্ছি একেবারে কেশকাল-এর মানুষখেকো ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে যাবই না।

বলে, ঋজুদা আবার শুরু করল।

আকাশে ঘন কালো মেঘ। বেরুবার আগে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি থামাতে পাখিরা সব সরব হয়েছে। বৃষ্টির সময়ে পাতার নীচে মাথা বাঁচিয়ে নিশ্চুপ ছিল। তাদের এ ডাল থেকে এ ডালে, এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যাওয়ার সময়ে ডাল কাঁপছে, টুপ টুপ করে জল ঝরছে। সারা বন যেন কী দুঃখে ঝরঝর করে কাঁদছে। প্রত্যেক গাছ ও পাতায় জল টসটস করছে। আশ্চর্য এক সুন্দর গন্ধ উঠছে। বৃষ্টিভেজা মাটি থেকে, বৃষ্টিভেজা গাছেদের গা থেকে, পাখিদের গায়ের ভিজে পালক থেকে। এ গন্ধ যারা না চিনেছে তারা বড় অভাগা।

কেশকাল বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক গিয়ে জঙ্গলটা হঠাৎই পাতলা হয়ে গেছে। ভীমা সিং সেখানে দাঁড়িয়ে দেখাল পাহাড়টাকে।

বললাম, ও পাহাড় তো কম করে মাইল পাঁচেক দূরে হবে। পৌঁছতে পৌঁছতেই তো বিকেল হয়ে যাবে।

হবে। ও বলল। কিন্তু আমরা তো যে কোনও মুহূর্তেই বাঘিনীর দেখা পেতে পারি। তা ছাড়া ডেরাটা যদি সত্যিই ওই পাহাড়ের কোনও গুহাতেই থেকে থাকে তাহলে তো আমাদের পক্ষে তাকে কবজা করা সহজ হবে। সব সময়ে ওই ডেরাতে না থাকলেও মাঝে মাঝে সে তো আসবেই। এই বাঘিনী কখনও তার মারা মানুষের মড়িতে ফিরে আসে না। যখন মারে, সে দিনে কি রাতেই হোক কিছুটা টেনে নিয়ে গিয়ে আড়াল দেখে বসে যতখানি পারে খায়। কেউ বিরক্ত না করলে তার পুরো খিদে মিটিয়ে নেয়। আর গ্রামের মানুষেরা গাদা বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে কাঁসর ঘণ্টা ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে যদি তার কাছাকাছি আসে তখন তাদের দিকে তেড়ে আসে। তারা ফিরে গেলে আবার খায়। কখনও বা বিরক্ত হয়ে লাশ ফেলে রেখে চলে যায়। যেদিন তার পেট পুরো ভরে না সেদিনের দু-একদিন পরেই আবার মানুষ মারে। পেট পুরো ভরলে দিন তিনেক মারে না।

তারপর ভীমা বলল, কী করবেন? যাবেন?

তুমি কী বল?

আমি বলি চলুন। রাতে আমরা ফিরেও আসতে পারি বাংলোতে, না হলে ওই গুহাটা খুঁজে পেলে তার কাছাকাছি কোনও গাছে বসে থাকতেও পারি। বাঘ যদি গুহাতে ফেরে বা যদি গুহাতেই থেকে থাকে তাহলে সন্ধের মুখে গুহা থেকে বেরোলে তার সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়ে যাবে। তারপর ঋজুদা বলল, এই মানুষখেকো বাঘ যখন পুরো অঞ্চলে এমন আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে যে মানুষ দিনে রাতে সমান ভয়ে কাঁটা হয়ে কাটাচ্ছে তখন ভীমার এই কথায়, ভীমা যে ভাল শিকারি শুধু তাই-ই নয়, তার যে ভয়ডর বলে কোনও ব্যাপারই নেই এ কথা প্রাঞ্জল হল। এমন স্থানীয় সঙ্গী পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। এতে আমার কাজ সোজা হয়ে যাবে, গুরুভার লাঘব হবে।

আমরা ওই পাহাড়টার দিকে চলতে লাগলাম। জিজ্ঞেস করলাম, পাহাড়টার নাম কী?

ঝিরিয়া।

ভীমা বলল।

আরেকটু গিয়ে একটা মস্ত পিপ্পল গাছ দেখিয়ে বলল, এই গাছেই এক শিকারিকে ধরেছিল বাঘে এবং গাছতলাতে বসে তার আধখানা খেয়েছিল।

বড় বাঘ গাছে চড়ে এবং তাও এত উঁচু গাছে এমন তো কখনও শুনিনি।

ভীমা বলল, কাছে চলুন। কারণটা বুঝতে পারবেন।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম, গাছটার পেছনে কতগুলো বিরাট বিরাট কালো পাথরের জটলা।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, অনেকটা আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির কোপির মতো, বুঝলি রুদ্র।

কোপিটা কী বস্তু?

তাপস কাকু বললেন।

কোপি মানে KOPJE। বড় বড় কালো পাথরের জটলাকে সোয়াহিলি ভাষাতে KOPJE বলে, উচ্চারণ কোপি। এদের ওপরটাতে অনেক সময়েই একটি সমান চ্যাটালো পাথর থাকে। সিংহ এর ওপরে বসে অবজারভেশন টাওয়ার হিসেবে কোপিকে ব্যবহার করে। কোথায় কোন জন্তু চরছে, কীভাবে তাদের কাছে যাওয়া যায়—এইসব প্ল্যান পয়জার করে।

বলেই বলল, সিংহদের শিকার একটা সাদামাঠা ব্যাপার। ওরা তো ওদের শিকারের লক্ষ্যর পেছনে ধাওয়া করে গিয়ে ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারে তাদের। একেবারে gross ব্যাপার। আর বাঘের শিকার ধরাটা একটা উঁচুদরের আর্ট-এর পর্যায়ে পড়ে। আলো-ছায়ায় খেলা, দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অশেষ ধৈর্য এবং চাতুরি দিয়ে বাঘের শিকারের ভিত গড়া।

তা ওই পাথরগুলোর সঙ্গে বাঘের গাছে চড়ার কী সম্পর্ক?

ভটকাই বলল।

একজন শিকারি কী করে এরকম মূর্খামি করলেন জানি না। ওই পিপ্পল গাছটা ওই পাথরগুলোর একেবারে গা-ঘেঁষা ছিল। শিকারির মাচাটা ছিল পনেরো ফিট মতো উঁচু। পিপ্পলের একটা মোটা ডালের ওপরে বাঁধা ছিল সে মাচা।

মড়ি কোথায় ছিল? মানে মানুষের লাশ?

আরে ভীমা যা বলল তাতে জানা গেল যে কোনও মড়ির ওপরে বসেনি শিকারি। বাঘ ঘোড়া খেতে খুব ভালবাসে—এ কথা সকলেই জানে, আর চিতা কুকুর। পাঁচ মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে একটা বেতো টাট্টু ঘোড়া জোগাড় করে সেই ঘোড়া নীচে বেঁধে—বাঘ সেই ঘোড়া মারবে এই আশায় তিনি বসেছিলেন। ভদ্রলোক নাগপুরের আবগারি ইনস্পেক্টর। এর আগে একটি বাঘ ও চিতা নাকি

মেরেছেন তাড়োবার এবং বস্তারের জঙ্গলে।

তুমি এতসব জানলে কী করে?

আমি ভীমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

আমাকে প্রেমা সিং বলেছে। সে-ই সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল শিকারিকে। প্রেমা সিংও সেই মাচাতে ছিল। বাঘ তাকে না ধরে সেই শিকারিকেই ধরেছিল।

তা প্রেমা বাঘকে মারল না কেন?

প্রেমা বলে, গুলি করলে শিকারির গায়ে লেগে যায় যদি, ওই ভয়ে করেনি। আবগারি ইনস্পেক্টরকে গুলি করে মেরে সে গরিব লোক কি জেলে যাবে। তা ছাড়া বাঘ যে সেই পাথরগুলোর ওপর উঠে বেড়াল যেমন করে ইঁদুর ধরে, তেমনি এক ঝটকাতে শিকারিকে তুলে নিয়ে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হবে, তা তার কল্পনার বাইরে ছিল।

ওরা নাকি আন্দাজও করেছিল যে, বাঘ ওই পাথরের ওপর দিয়ে তাদের দিকে আসতে পারে। এলে তারা বাঘকে মারার সুযোগ পাবে, কারণ ওপরের পাথরটা মস্ত বড়, চ্যাটালো এবং সমান ছিল।

রাতও ছিল পূর্ণিমার। বাঘ যদি ওই পাথরের ওপর দিয়েই আসে, তবে দুজন শিকারির চোখে ধুলো দিয়ে আসতে পারবে না যে, এমন বিশ্বাস তাদের ছিল। ঘোড়াটা বাঘের কথা টের পেয়েছিল এবং পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। প্রেমারা ভেবেছিল, বাঘ ঘোড়ার কাছে আছে। হয়তো ছিলও। ওরা দুজনেই ঘোড়ার গতিবিধি দেখে বাঘ কোথায় আছে তো বোঝার চেষ্টা করেছিল। পূর্ণিমা রাতে সুবিধে যেমন হয় শিকারের, অসুবিধেও হয়। গাছপালা, ঘাসপাতা পাথর-মাথর সবকিছুরই ছায়াগুলো বড় হয়ে যায়। তাতে চোখে বিভ্রম হয়। যাই হোক, ভীমা বলল, যখন প্রেমা সিং আর শিকারি নীচে ঘোড়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, বাঘ নিঃশব্দে এসে শিকারিকে তুলে নিয়েছে নিমেষের মধ্যে।

শিকারিকে তার সামনে খেল আর প্রেমা সিং বসে বসে দেখল।

আমি বললাম ভীমাকে।

প্রেমা দেখতে পায়নি। বাঘ পাথরের আড়ালেই তাকে নিয়ে খেয়েছিল। তার হাড়গোড় ভাঙার কটাং কটাং আওয়াজ এবং মাংস খাওয়ার চপ চপ আওয়াজ সে শুনতে পেয়েছিল।

সে তো পাথরের ওপর দিয়ে গিয়ে তখনও বাঘকে গুলি করতে পারত। শিকারিকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টাই সে করল না?

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, বাঘ যে মানুষকে ঘাড় কামড়ে নিয়ে যায়, তার মৃত্যু তো সঙ্গে সঙ্গেই হয়। বাঘের দুটো ক্যানাইন দাঁত তো ঘাড় এবং কণ্ঠনালি ফুটো করে দেয়। প্রেমা তা জানত বলেই শিকারিকে বাঁচাতে না চেয়ে নিজে বাঁচতে চেয়েছিল। তা

ছাড়া, ভীমা বলল, ভয়ে তার হাত-পা পাথর হয়ে গিয়েছিল। ওই ঘটনার পরে এক মাস সে ঘুমোতে পারেনি। জগদলপুরে কবিরাজ দেখিয়ে ওষুধপত্র করে তারপর তার ঘুম আসে নাকি।

ঋজুদা বলল, আমি প্রেমা সিংকে না নিয়ে তো দেখছি ভাল করেছি। তুমি হলে ওই সময়ে কী করতে?

আমি এক দৌড়ে পাথর বেয়ে গিয়ে বাঘকে গুলি করতাম। শিকারি যে বাঁচত না তা তো জানাই, কিন্তু আমি থাকলে সেদিন বাঘও বাঁচত না। তা ছাড়া, ওরা মস্ত ভুল করেছিল ঘোড়া বেঁধে। বাঘ কখনও-সখনও গ্রামের ঘোড়া ধরে অবশ্য কিন্তু গ্রাম থেকে অতদূরে একটা ঘোড়াকে বাঁধা অবস্থাতে দেখে এ যে কোনও শিকারিরই চক্কর, তা সে বুঝতেই পেরেছিল। বাঘও তো কিছু কম বড় শিকারি নয়। সেও তো মস্ত সেয়ানা। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি হতে পারত। কিন্তু তার বদলে যমের সঙ্গে কোলাকুলি হল।

ঋজুদা বলল, আমি ভীমাকে বললাম, অন্য দুজন শিকারি কী করে বাঘের খাদ্য হল?

ভীমা বলল, তা আমি জানি না। সেই ঘটনা অনেক দূরে ঘটেছিল। আমার কোনও ধারণা নেই।

তোমাদের গ্রামের নাম কী?

সূর্যাটোলি, বিজা ডোংরির নীচে। আমাদের বস্তি একটি ছোট পাহাড়ের পায়ের কাছে।

তোমাদের গ্রাম থেকে কোনও মানুষ নিয়েছে বাঘ?

নিয়েছে। তবে গ্রাম থেকে নেয়নি। গানু মারিয়া বলে একজন লোক দুপুরবেলা পাকদণ্ডি দিয়ে সূর্যাটোলি থেকে কেশকাল-এ আসছিল পায়ে হেঁটে। বাঘ সেই পাকদণ্ডিতেই তাকে ধরে খেয়েছিল। আরও একজনকে ধরেছিল, একটি মেয়ে, ঘাস কাটতে গিয়েছিল দুপুরে। বাঘ তাকে জঙ্গলে ধরে আধখানা খেয়ে দেয়। তবে সে ঘটনা বছর তিনেক আগে ঘটে, যখন বাঘ সবে মানুষ ধরা আরম্ভ করে। তারপর বলতে নেই, আমাদের গ্রাম থেকে আর কারওকে ধরেনি।

আমরা চলেছি দুজনে। চোখ ও কান সজাগ রেখে। আধ মাইলটাক চলে যাওয়ার পরে একটা নালা পড়ল পথে। বৃষ্টিতে জলের তোড় বেড়েছে। পেরোনো যাবে কি না ভাবছি, এমন সময় ভীমা বলল, কিছুটা বাঁদিকে চলুন, নদীর ওপরে অনেক পাথর আছে বড় বড়। পাথরে পাথরে পা রেখে রেখে পার হয়ে যাব। আপনার প্যান্টও ভিজবে না আর আমি তো হাফ-পেন্টুলুন পরে আছি। খালি পা।

তারপর বলল, এই নদী পেরুবার পরে কিন্তু আর কথাবার্তা বলব না আমরা।

কেন?

না, বাঘের ডেরার কাছে চলে এসেছি আমরা, যদি বাঘ ডেরাতে থেকে থাকে।

কিছুটা বাঁদিকে গিয়ে দেখলাম সত্যিই নদীর বুকময় বড় বড় পাথর। সহজেই

ট্রাউজার না-ভিজিয়ে নদী পেরোনো যাবে। কেশকাল বাংলো থেকে প্রায় মাইল তিনেক এসেছি। কোনও পাথরে বসে একটু জল খেয়ে একটু পাইপ খেয়ে নিলে হত।

ভীমাকে বললাম সে কথা। ভীমা বলল, তারও তেষ্টা পেয়েছে। খাওয়ার পরে এসেছে তো। শীতকাল হলে এই ঝোরার জলই খাওয়া যেত এখন বৃষ্টির জন্য জল ঘোলা হয়ে গেছে। তবে অসময়ের বৃষ্টি। কদিন পরেই জল আবার খাওয়ার মতো হয়ে যাবে।

একটা পাথরে বসে ওয়াটার বটল থেকে জল খেয়ে ভীমার দিকে সেটা এগিয়ে দিলাম। ভীমা বলল, আমি কিন্তু ছোট জাত হুজৌর।

আমি হেসে বললাম, আমি বজ্জাত।

সেটা কী জাত হুজৌর, কখনও তো শুনিনি।

শোনারও তো কথা নয়। এই জাত শুধু বড় বড় শহরেই দেখা যায়। আমি তোমার চেয়েও ছোট জাত। নির্ভাবনায় জল খাও।

জল খেয়ে আমি পাইপটা ধরিয়েছি। পাইপটাতে টোব্যাকো ভরাই ছিল। বুশ শার্টের বাঁদিকের বুক পকেটে রাখা ছিল পাইপটা। ভীমা জল খেয়ে ওয়াটার বটলের ছিপি আটকে আবার থলির মধ্যে ভরে নিল। তারপরে উঠে, যেন আমাকে দেখানোর জন্য যে কোন কোন পাথরে পা দিয়ে গেলে ট্রাউজার ভিজবে না, এগিয়ে গেল। আমি পাইপ খেতে খেতে ওর দিকে চেয়েছিলাম। চোখের ১৮০ ডিগ্রি দৃষ্টি অবশ্য ছড়ানো ছিল। শিকারি আর আমাদের দেশের মোটরগাড়ির চালকদের এই দৃষ্টি খুব জরুরি। সচেতনভাবে চেষ্টা করলেই এটি আয়ত্ত করা যায়। আমি অবশ্য ছেলেবেলাতেই আয়ত্ত করেছিলাম জেঠুমণির ট্রেনিংয়ে। দেখলাম ভীমা পাথরের ওপর পা রেখে রেখে ওপারে পৌঁছে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই নালাটার নাম কী?

ও বলল তিননদীয়া। কিন্তু ও যখন নামটা বলছে তখনই ওর মুখের চেহারা যেন পালটে গেল। ঝট করে ও গুলিভরা ওভার-আন্ডারটার কুঁদোটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বগলের নীচে করল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ভীমা ততক্ষণে আমার দিকে পেছন ফিরে তিননদীয়ার ওপারের জঙ্গলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আমি রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ডান হাতে নিয়ে নালাটা পেরোলাম। কথা না বলে ওর কাছে গিয়ে চোখ দিয়ে ওকে শুধোলাম, কী?

ও আঙুল দিয়ে নালাটার পাড়ের লাল বৃষ্টিভেজা মাটি দেখাল।

আমি দেখলাম, বাঘের পায়ের টাটকা দাগ। সেও আমাদের আগে নালাটা পেরিয়েছে। সে কোন দিক থেকে এসেছে জানা গেল না। সে আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে কি না তাও জানা গেল না। ভীমা কথা বলতে মানা করা সত্ত্বেও

আমার নালার নাম জিজ্ঞেস করা আর ভীমার জবাব দেওয়াটা কাছাকাছি থাকা বাঘ হয়তো শুনে থাকবে। বনের মধ্যে ক্ষীণতম শব্দও বহুদূর যায়। তা ছাড়া বৃষ্টির পরে বনের শব্দপ্রেরণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। বাঘ ঠিক কতক্ষণ আগে নালাটা পেরিয়েছে তা বোঝা গেল না। পাড়ের জমি শুকনো হলে তার থাবার দাগের আর্দ্রতা দেখে তার একটা আন্দাজ করা যেত কিন্তু বৃষ্টি হওয়াতে সমস্ত দিকই ভিজে রয়েছে। ভেজা জমিতে তার জলসিক্ত থাবার দাগ দেখে ঠিক বোঝা গেল না। পাথরের ওপর দিয়ে গেলেও দেখলাম ও প্রান্তে পাথর না থাকায় জুতো ভিজিয়ে পার হতে হল। বাঘও থাবা ভিজিয়েই পেরিয়েছে। বাঘ না বাঘিনী তা নিয়েও ধন্দ হল আমার।

আমরা দুজনে দুজনের চোখে তাকিয়ে নীরবে বললাম, এখন কিং কর্তব্যম্?

এই অবধি বলেই ঋজুদা বলল, একটু রিসেস। একটু পাইপ খেয়েনি। তোমরাও সিগারেট খেয়ে নিতে পারো। যারা খাও। যদি খাও।

ভটকাই বলল, এবারে বাপারটা জমেছে।

তাপস কাকু বললেন, আমার কিন্তু ভয় করছে।

ভয় করছে সকলেরই।

প্রদীপ মৈত্র কাকু বললেন।

ঋজুদা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ভয় তখন আমারও করছিল। কিন্তু ভয় গিলে ফেলতে হয়েছিল। তখন কী আর করার। এগোলেও নির্বংশ, পেছলেও নির্বংশ। যেসব শিকারি বলেন যে, তাঁদের ভয়ডর নেই, আমি তাঁদের মতো অতিমানব নই। তবে হ্যাঁ, ভয়ের বহিঃপ্রকাশ থাকে না। ভয়ের বহিঃপ্রকাশ থাকলে ভয় আরও গলা টিপে ধরে।

ঋজুদা বলল, আমরা মানে, আমি আর ভীমা যখন দাঁড়িয়ে পড়ে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছি, ঠিক সেই সময়ে আমাদের সামনে থেকে একটা কোটরা হরিণ হিস্টিরিয়া রোগীর মতো বারবার ডাকতে লাগল ব্বাক্! ব্বাক্! ব্বাক্ করে। সেই ছোট হরিণের বড় ডাক বৃষ্টিভেজা বনময় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আর তারই সঙ্গে একটা ময়ূর তীব্র কেকাধ্বনি করে উঠল। বৃষ্টি পড়ায় তার আনন্দ হয়েছিল, বাঘ দেখে তার উত্তেজনা হল। জঙ্গলের এ দিকটাতে সম্ভবত বাঁদর নেই, থাকলে তারাও বাঘ দেখে ডাকাডাকি করে মাথা গরম করে দিত।

আমি ফিস ফিস করে বললাম, এখান থেকে একসঙ্গে গেলে হবে না। চলো, আমরা দুজনে দুদিকে ছড়িয়ে যাই। একে অন্যকে দেখা যায় এমন দূরত্ব বজায় রেখে দুজনেই এগোব পাহাড়ের দিকে, কিন্তু একা একা।

ও মাথা নেড়ে আমার প্রস্তাব যে অভিজ্ঞ শিকারির, এমন একটা ভাব নীরবে প্রকাশ করে, তার সমর্থন জানাল। এবং ঠিক সেই সময়ে ও আমাকে ওইখানেই

দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে নালার দিকে ফিরে গেল। ওর খুঁড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিটা দেখে আমার আর্নেস্ট হেমিংওয়ের Blue Hills of Africa বইতে তাঁর কালো ট্র্যাকার Droopy-র কথা মনে পড়ে গেল। Droopy খুঁড়িয়ে হাঁটত না কিন্তু ওর চলার গতিতে একটা ঝাঁকুনি ছিল।

ভাবছিলাম, ভীমা কেন গেল নদীর দিকে? ভাবনা শেষ হতে না হতেই ভীমা সিং ফিরে এসে ফিসফিস করে বলল, এটা মানুষখেকো বাঘিনীর পায়ের দাগ নয়।

তবে?

এটা বাঘিনীর পায়ের দাগই নয়। একটা বাঘের দাগ।

বড় বাঘ?

হ্যাঁ।

চলো তো দেখি। একই জঙ্গলে অন্য বাঘ আসবে কী করে? জুড়ি লাগার সময় ছাড়া।

তাই তো।

ভীমা বলল।

আমি ও ভীমা ফিরে গিয়ে আবার ভাল করে পায়ের থাবার দাগটি দেখলাম। ঠিকই তাই। মনে হচ্ছে একটা বাঘেরই দাগ। মাটি ভেজা এবং বাঘ জল থেকে একলাফে ভিজে মাটিতে উঠেছে বলে পায়ের ছাপটা ধেবড়ে গেছে। যাই হোক, আমার মন বলল, মানুষখেকোর রাজত্বে তার থাকাটাই স্বাভাবিক। ভীমা তো ভুলও করতে পারে। আমাদের সাবধানতাতে এতটুকু ঢিলে দিলে চলবে না।

ফিরে গিয়ে দুজন দুদিকে গিয়ে আমরা ঝিরিয়া পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলাম. যথাসম্ভব সাবধান হয়ে সামনে এবং দুপাশে নজর রেখে এবং মাঝে মাঝে পেছনেও দেখতে লাগলাম।

চৈত্রশেষের বন বৃষ্টি পেয়ে কী আশ্চর্য স্নিগ্ধ আর সুগন্ধি হয়েছে তা কী বলব। নানা পাখির ডাক আর ওড়াউড়িতে মনে হচ্ছে এই বুঝি স্বর্গের নন্দনকানন। এখানে বসে কবিতা লিখতে হয়, কি ছবি আঁকতে। রাইফেল হাতে মানুষখেকো বাঘিনীর সন্ধানে ঘুরে মরতে ভাল লাগে না।

আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। হলেই ভাল। কারণ আমাদের কেশকাল-এর ওই বনবাংলোতে ফিরে আসতে আসতে রাত অবশ্যই হবে। কত রাত তা এখনই বলা যাচ্ছে না। পূর্ণিমার আর তিনদিন বাকি। এই দোল পূর্ণিমা। হোলি। জঙ্গলের মানুষে সেই সময়ে একটু অসতর্ক থাকবে, মহুয়া খাবে, সালফি খাবে, নাচবে, গাইবে, আর বাঘিনীর কবলে পড়বে সহজে। যা হওয়ার তা হবে। হোলির আগেই যদি ঈশ্বরের কৃপাতে বাঘিনীর একটা হেস্তনেস্ত করা যায়, তা হলে তো চমৎকার হয়। কিন্তু আমি চাইলেই কি আর চমৎকার ঘটনা ঘটবে?

এদিকে শালের জঙ্গল বেশি। আসন, বিজা, গামহার ওরা এখানে বলে গামারি,

পলাশ, শিমুল, সেগুনও আছে। তবে সেগুন কম। এই জঙ্গলে বাঘ ছাড়াও আছে নানা জাতের হরিণ, কোটরা, চিতল, শম্বর। বারাশিঙা এদিকে নেই। বারাশিঙা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পছন্দ করে। নীলগাই, গাউর বা ভারতীয় বাইসন, শুয়োর, শজারু, বুনো কুকুর—এইসব আছে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের কথা দু-একটা বড় শুয়োরের পায়ের দাগ ছাড়া আর কোনও জানোয়ারেরই পায়ের দাগ দেখা গেল না এতখানি এসেও। কোটরা হরিণটা নিজে ডেকে তার অস্তিত্ব জানান না দিলে সেও যে আছে তা জানা যেত না। এমনও হতে পারে যে সব জানোয়ারের পায়ের দাগ বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। অসম্ভব নয়। যাই হোক, জানোয়ারের এমন অনুপস্থিতির কারণ ভীমার কাছে এবং ফরেস্ট গার্ডদের জিজ্ঞেস করতে হবে। বাঘের স্বাভাবিক খাদ্যের এমন অভাবই কি এই বাঘিনীকে মানুষখেকো করে তুলল। কেন যে সে মানুষ খাচ্ছে, এ কথা তাকে মারার পর তার শরীরকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেই জানা যাবে। সে হয়তো হরিণ, শম্বর, শুয়োর ধরতে অপারগ। কোনও ক্ষত বা ক্ষতি হয়তো সে বয়ে বেড়াচ্ছে। তাই প্রাণধারণের জন্যেই সে মানুষ মারছে। যাই হোক, সে কেন মানুষ মারছে, তা নিয়ে গবেষণা না করে তাকে মারাটা আগে জরুরি। সেই অপকর্ম করতেই আমার আসা এখানে।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছনোর আগে একদল নীলগাই, বিহারে যাদের বলে ঘোড়ফরাস দুড়দাড় করে দৌড়ে যেতে দেখলাম। বেশ কিছুদিন হল এ বনে মানুষ ঢোকে না বাঘিনীর ভয়ে, তাই এই বিকেলে হঠাৎ দুজন উটকো মানুষ দেখে তারা আমাদের যত না চমকে দিয়েছিল, নিজেরা তার চেয়ে বেশি চমকাল। আর দেখলাম, পাঁচটি শম্বর। একটি শিঙাল ও চারটি মেয়ে শম্বর। শিঙাল তার বিরাট শিংটিকে পিঠের ওপর শুইয়ে দিয়ে, যাতে লতাপাতায় বা ডালে তা আটকে না যায়, এক দৌড়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়ে উধাও হল। এই শম্বরেরা ডাকে কম। উত্তেজিত হলে ডাকে। তাদের ডাক ঢ্যাংক্ ঢ্যাংক্ ঢ্যাংক্। লাউড স্পিকারের মাউথপিসের সামনে যদি শ্যাম্পেন বা ওয়াইনের বোতলের ছিপি খোলা হয়, তাহলে যেমন আওয়াজ হয়, ওদের ডাকটাও তেমনি।

বাইসনের পায়ের দাগও দেখলাম না, অথচ দেখাটা উচিত ছিল। বাইসন-হর্ন মারিয়াদের দেশ বস্তারেই যদি বাইসন না দেখা যায়, তবে কোথায় দেখা যাবে! তবে বাইসন আর হাতি বাঁশবন খুব পছন্দ করে। অমরকণ্টকের পথে অচানকমার লামনি ইত্যাদি জায়গায় বাইসন আছে অনেক। নারায়ণপুর রেঞ্জেও নিশ্চয় আছে। ইন্দ্রাবতী নদীর বুকের নরম মাটিতে নতুন গজানো কচি ঘাস খেতে খেতে আমি এমন একটি বাইসনের বড় দল দেখেছিলাম যা পালামৌ বা মহীশূরের বন্দীপুরেও দেখিনি। এই বাইসনেরা আহত হলে অথবা উত্তেজিত হলে বোঁয়াও করে ডাকে। আসলে ওরাও তো গবাদি পশু। জংলি মোষ এবং বাইসনেরাও আমাদের গোরু, মোষের স্বজাতি।

এখানে হাতি নেই?

প্রদীপ মৈত্র কাকু ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলেন।

না, আশ্চর্য। পুরো মধ্যপ্রদেশেই সম্ভবত কোথাওই হাতি নেই। কানহা বান্ধবগড় বল, অচানকমার বল, কি সিংগরাউলির কাছের অত্যন্ত দুর্গম ব্যায়রান অঞ্চল কোথাও হাতি নেই। আমার মনে হয়, জলাভাবের জন্যেই হাতি নেই। হাতির প্রচুর জলের দরকার। অবগাহন চানের জন্যে, খাওয়ার জন্যে, গরমে ডুবে বসে থাকার জন্যে। তাই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক ইত্যাদি জায়গাতে হাতিকে দেখা যায়। জানি না, এটা আমার আন্দাজ। এসব প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিত প্রাণীতত্ত্ববিদেরাই দিতে পারবেন। আমি তো আনপড়।

ভটকাই বলল, আবার গল্পে ফেরো।

প্রদীপ গাঙ্গুলি কাকু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। পাহাড়ে পৌঁছলেন? তারপর কী হল বলুন।

হ্যাঁ। পাহাড়ে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় চারটে বাজে। আসলে পাঁচ মাইল পথটা আদৌ দূরত্বের নয়। কিন্তু আমরা তো জোরে হাঁটতে পারিনি।

বাঘিনীর কথা মনে রেখে অতি সাবধানে এগোতে হয়েছে আস্তে আস্তে তাতেই দেরি।

পৌঁছে দেখি, ভীমা সিং ঠিকই বলেছিল। অনেকগুলো গুহা আছে এ পাহাড়ে। আমরা পাহাড়ে উঠে এক এক করে তিনটি গুহামুখের সামনেই পায়ের চিহ্ন খুঁজলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বৃষ্টিটাই সব মাটি করেছে। নইলে গুহার সামনে চৈত্র মাসের ঝুরো মাটিতে বাঘ বা ভাল্লুক—যে-ই গুহার মালিক হোক না কেন, তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। চতুর্থটির সামনে যেই পৌঁছেছি, অমনি গুহার ভেতর থেকে একটি প্রকাণ্ড ভাল্লুক প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে বলল, কী চাই? এখানে ইয়ার্কি মারতে আসা হয়েছে?

ভারতের যত জানোয়ার আছে, তার মধ্যে ভাল্লুকের মতো পাজি, আনপ্রেডিক্টেবল জানোয়ার আর দুটি নেই। সম্পূর্ণ বিনা কারণে নিরপরাধ মানুষকে তারা তাড়া করে এসে নাক-মুখ খুবলে তুলে নেয়। যদি খাওয়ার জন্যেও নিত, তাহলেও না-হয় বোঝা যেত, নাক গলা চোখ বা ঠোঁট খেতে ভালবাসে তাই ছিঁড়ছে। ভাল্লুক তো তৃণভোজী জানোয়ার, (হিমালয়ের আর মেরু অঞ্চলের ভাল্লুকরা ছাড়া অবশ্য) তবু তারা কেন মানুষের নাক কান চোখ ঠোঁট খুবলে নেয়, তা তারাই জানে। ভাল্লুক আলিঙ্গন করলে সে মানুষের বাঁচার আর কোনও উপায়ই থাকে না। ছত্রপতি শিবাজি যেমন বাঘনখ পরে আফজল খাঁকে মেরেছিলেন, তেমনই অবস্থা হয়।

তারপর?

আমাদের ভাল্লুকমশায় সাইজেও বিরাট। তবে তার ত্যাড়াইম্যাড়াই আমি কিংবা ভীমা জায়গামতো একটি গুলিতেই ঠান্ডা করে দিতে পারতাম কিন্তু আমরা এখানে বাঘিনীর খোঁজে এসেছি। তা ছাড়া, এই বনে রাইফেলের বা বন্দুকের আওয়াজ হলে পাহাড়ে যা প্রতিধ্বনি উঠত, তাতে পাঁচ বর্গমাইল এলাকাতেই সেই বজ্রনির্ঘোষ পৌঁছত। আর পৌঁছলেই চতুর বাঘিনী, যদি এ অঞ্চলে সে থেকে থাকে, তাহলে এ তল্লাট ছেড়ে পালাত। তাই আমরাই কাপুরুষের মতো রণে ভঙ্গ দিলাম। প্রাণপণে দৌড় লাগিয়ে প্রাণ বাঁচালাম। ভাল্লুকটা কিছুটা তাড়া করে এসে আমরা যে খুবই ভয় পেয়েছি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে আবার তার গুহাতে ফিরে গেল।

দুজনে একসঙ্গে হওয়ার পর আমি ভীমাকে বললাম, তোমার বাঘিনী এই সব গুহাতে সম্ভবত থাকে না। আমার মনে হয়, তার কোনও পাকাপাকি আবাস এখন আর নেই। যেখানে মানুষ ধরে তারই কাছাকাছি সুবিধে মতো জায়গা দেখে থেকে যায়, তারপর আবার স্থান পরিবর্তন করে।

ভীমা বলল, আমারও তাই মনে হয়। তা ছাড়া পাশের গুহাতে এতবড় ভাল্লুক থাকলে বাঘ গুহাতে থাকবে না। বাঘে আর ভাল্লুকে পটে না।

হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা। তবে এ গুহাগুলোতে থাকে কে?

চিতা-টিতা থাকতে পারে। তবে দুর্গন্ধ পেলেন না সব গুহামুখ থেকেই? যারা থাকে তারা বহু সংখ্যাতেই থাকে।

আমি বললাম, বাদুড়?

হ্যাঁ।

ভীমা বলল।

তারপর বলল, আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম এতখানি হাঁটিয়ে। আমি বললাম, না এলে জানতামই বা কী করে! তা ছাড়া এই বনে জঙ্গলে কিছুই মিছিমিছি নয়। সব মিছিমিছিরই মূল্য আছে। জীবনে কোনও অভিজ্ঞতাই ফেলা যায় না।

তারপর বললাম, চলো, এবারে ফিরি। কিন্তু নালার পাড়ে যে পায়ের দাগ দেখলে সেটা বাঘিনীর যে নয়, সে সম্বন্ধে তুমি কি নিশ্চিত?

না। নিশ্চিত যে, সে কথা বলতে পারি না। তাই তো চিন্তা হচ্ছে। ফেরার সময়ে রাতও হয়ে যাবে। আমাদের খুব সাবধানে ফিরতে হবে।

আমি হেসে বললাম, আমরা তো তাকেই খুঁজছি। তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাক, তাই তো আমরা চাই। সে থাকুক সাবধানে সাধের গায়ের চামড়াটি বাঁচিয়ে।

ভাল্লুকের গুহা থেকে দৌড়ে নেমে এসে আমরা একটা বড় কালো পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। আকাশ ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে। পশ্চিমাকাশে লাল সূর্য ডুবছে আর পুবাকাশে ভরা চাঁদ উঠছে একটা হলদেটে থালার মতো।

পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারাটাও উঠেছে. জ্বলজ্বল করছে নীলাভ দ্যুতিতে। বৃষ্টি, পরিবেশের ধুলো-ময়লা যতটুকু ছিল, সব নিকিয়ে নিয়েছে। সূর্য এবং চাঁদের যে কী স্নিগ্ধ অমলিন রূপ তা কী বলব! মনে মনে বলাম, মানুষখেকো বাঘিনী মারতে পারি আর নাই পারি, এই মুহূর্তে যে দৃশ্যর সম্মুখীন হলাম এই কেশকাল-এর বনে তাতেই এ যাত্রা এখানে আসা আমার সার্থক হয়ে গেল। সত্যি! আমাদের চারপাশে প্রকৃতি যে কত দৃশ্য শব্দ গন্ধ ছড়িয়ে রেখেছেন আমাদের জন্যে! দু-হাত ভরে, শরতের শিউলিতলির শিউলির মতো তা কুড়িয়ে নিতে হয়। বুক ভরে ওঠে সুগন্ধে, সুদৃশ্যে ও মধুস্বরে।

তাপস কাকু বললেন, সকলেই কি-সব পারে ঋজুদা? যে পারে সে এমনি পারে। এবার থেকে আমরাও চোখ কান নাক খুলে রাখব। গন্তব্যে তো পৌঁছতে হয়ই কিন্তু যাওয়ার পথের দুপাশে যা আছে তা যদি আমরা সকলেই কুড়িয়ে নিতে পারতাম!

পারবে পারবে। একটু সচেতন হও। হলেই পারবে।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই বলল, আরেক রাউন্ড কফি হবে নাকি?

প্রদীপ গাঙ্গুলি কাকু বললেন, হয়ে যাক।

ভটকাই বলল, আমি না আসা অবধি আরম্ভ করবে না।

ঠিক আছে। আয় তুই।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই কফির অর্ডার দিয়ে ফিরে এলে আবার শুরু করল ঋজুদা।

তিনদিন হল এসেছি। ইতিমধ্যে কোনও কিল করেনি। রেঞ্জার সাহেব এবং এস.ডি.পি.ও. সাহেব সবাইকে বলে রেখেছেন যে কিল হলেই ওঁদের খবর দিতে। খবর পেলেই জিপে করে খবর যারা আনবে, তাদের কেশকাল-এ আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভীমা যা বলেছিল তা যদি সত্যি হয়, আজ বাঘিনীর মানুষ মারার দিন। তিনদিন হয়ে গেছে কিল হয়নি কোনও। আজ হোলিও।

বাসন্তী পূর্ণিমার চাঁদ কেশকাল-এর চারদিকের বনকে রুপোঝুরি করে তুলেছে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন ওই ডুংরির ওপরে বসার টোংরিটি বানানো হয়নি। আমি আর ভীমা চন্দ্রালোকিত বন পাহাড়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে বাংলোর বারান্দাতে বসে আছি। আমি দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে। ভীমা আমার পায়ের কাছে বসেছে মাটিতে, উলটোদিকে। অনেক বলা সত্ত্বেও সে চেয়ারে বসেনি। বহু পুরুষের সংস্কার। আমি বজ্জাত 'ছোট জাত' ভীমাকে বোঝাতে পারিনি যে আমাতে আর ভীমাতে কোনও তফাত নেই। আমার সামনের টেবিলের ওপরে গুলি ভরা থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটা রাখা আছে। এটা একনলি রাইফেল। ব্যারেলে একটি এবং চেম্বারে পাঁচটি গুলি নেয়। খুব অ্যাকুরেট রাইফেল।

হালকাও। বহু দূর থেকে নির্ভুল নিশানাতে মারা যায়।

ভীমা পুটুর-পুটুর করে বাঘিনীর নানা রেকর্ড-এর কথা বলে যাচ্ছে। সেসব শুনলে রক্ত হিম হয়ে আসে। আমার মন বলছে যে কোনও সময়েই একটা খবর আসবে আজকে। আজকে শুলেও ঘুম আসবে না। কিল না হলে বাঘিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা মুশকিল। এই পঞ্চাশ বর্গমাইল বনে বাঘিনীকে খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদাতে সূঁচ খুজে বের করা একই ব্যাপার।

আজ হোলি, তাই ফরেস্ট গার্ড আর চৌকিদারেরাও একটু মহুয়া-টহুয়া খেয়ে বাংলোর হাতাতে মাদল আর ধামসা বাজিয়ে হোলির গান গাইছে। তারা ঘরের বাইরে এসেছে আমাদেরই ভরসাতে। ওদের গান শুরু হতেই আমি আমি ভীমাকে বললাম বন্দুকটা নিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসতে। যে বাঘিনী বাঘ-মারা দু-জন শিকারির মধ্যে থেকে এমনই পূর্ণিমার দিনে একজনকে তুলে নিয়ে যায়, তাকে বিশ্বাস নেই। এ বাঘিনীর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

আধ ঘণ্টাও হয়নি ভীমা গেছে ওদের মধ্যে, এমন সময় একটা জিপকে লো-গিয়ারে খুব জোরে পাহাড় চড়ে কেশকাল বাংলোর দিকে হেডলাইট জ্বেলে আসতে দেখা ও শোনা গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ভীমাও উঠে দাঁড়াল। চৌকিদার ও গার্ডদের গান বাজনা সব বন্ধ হয়ে গেল। কী সংবাদ এনেছে জিপ কে জানে।

জিপ থেকে লাফিয়ে নামল যে লোকটা, তাকে চাঁদের আলোতে চিনতে পারিনি। সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার পায়ে এসে পড়ল। ভীমা বলল, কী হয়েছে প্রেমা ভাই?

লোকটা শিকারি প্রেমা সিং।

প্রেমার সঙ্গে আরও দুজন লোক ছিল। প্রেমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, তাদের গ্রামের মুখিয়ার বাড়ির উঠোনে প্রায় শ'খানেক লোক জমায়েত হয়ে হোলির নাচগান করছিল প্রেমার সতেরো বছরের ছেলে ধামসা বাজাচ্ছিল। একপ্রস্থ নাচ-গান শেষ হলে বুক থেকে ধামসা নামিয়ে রেখে সে গ্রামের মধ্যেই একটু ঝোপ দেখে হিসি করতে গেছিল, আর বাঘিনী তাকে সেই সময়ে ধরে।

ভীমা বলে, তুই কাঁদছিস কোন লজ্জায়। তোর বন্দুক নিয়ে বাঘের পেছনে গেলি না কেন? তুই কেমন বাবা?

আমি পারিনি ভীমা। ওটা বাঘিনী নয়, কোনও প্রেতাত্মা। ওকে মারা কোনও মানুষের কর্ম নয়।

আমার জন্যে বনবিভাগ যে জিপটা দিয়েছিল, তাতে প্রেমাকে তুলে নিয়ে আমি আর ভীমা উঠে বসলাম। আগে আগে অন্য জিপটা চলতে লাগল। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেছিলাম আমি। পায়ে বাথরুম স্লিপার। তাই পরেই বেরিয়ে গেলাম। চৌকিদার আর গার্ডদের ক্ষণিক আনন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল এই দুঃসংবাদে।

মিনিট কুড়ি লাগল আমাদের খুব জোরে জিপ ছুটিয়ে প্রেমাদের গ্রামে পৌঁছতে। গ্রামের নাম মিরপুর। গিয়ে শুনলাম, গ্রামের প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক বর্শা, তির-ধনুক আর গাদা বন্দুক নিয়ে বাঘিনীর পেছনে গেছে প্রেমার ছেলেকে উদ্ধার করতে।

শুনে, কথাটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর শোনালেও, মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রেমার ছেলেকে তো আর জীবিত পাবে না ওরা। কিন্তু বাঘিনী যদি লাশ ফেলে চলে যায় তাকে মারার নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, বাঘ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (যদি ভীমার কথা সত্যি হয়!) আবার অন্য কোনও মানুষ ধরবে।

তাড়াতাড়ি জিপ থেকে নেমে গ্রামের দুজন লোকের সঙ্গে আমি আর ভীমা অকুস্থলের দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু আমরা কিছুটা যেতেই অনেক মানুষের শোরগাল শুনতে পেলাম। ওরা ফিরে আসছে । আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওরা যখন কাছে এল, ভীমা জিজ্ঞেস করল কী হল? ওরা সবাই একই সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কী যে হল তা বোঝে কার সাধ্যি! যাই হোক, প্রেমা সিংয়ের ছেলের লাশ তারা প্রেমার বাড়ির দিকে বয়ে নিয়ে গেল। বুক আর পেছন থেকে বেশ কিছুটা খেয়েছে বাঘিনী। যারা রইল, তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে, বাঘের গায়ে বেশ কটা তির বিঁধেছে এবং গাদা বন্দুকের দুটি গুলি। অবশ্য দূর থেকে মারা। বাঘিনীর কাছে যাওয়ার সাহস হয়নি ওদের। হইচই, তির এবং গুলির প্রকোপে প্রেমা সিংয়ের ছেলেকে ছেড়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছে।

কোন দিকে গেছে?

ভীমা শুধোল।

দৌড়েছিল তো পুবদিকে, এখন পরে কোনদিকে যাবে কী করে জানব। কেশকাল গ্রামের পশ্চিমদিকে। কেশকালের দিকে গেলেও না-হয় হত। এখন আবার হা-পিত্যেশ করে কদিন বসে থাকতে হবে কে জানে। তবে যা শোনা গেল, তাতে বাঘ সামান্যই খেতে পেরেছে। অতএব তার ক্ষুণ্নিবৃত্তি হয়নি। শিগগির মানুষ মারবে আবার ও।

আমি বললাম, একবার জায়গাটা দেখে আসি চলো ভীমা।

ভীমা বলল, চলুন।

টর্চের দরকার ছিল না। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। গ্রামের একটি লোককে সঙ্গে নিয়েছিলাম আমরা। লোকটা সাহসী। সেও বলছিল, আমাদের গ্রামে প্রেমা সিংয়ের মতো এত বড় শিকারি থাকতে তার ছেলেকেই যখন বাঘে নিল সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল বন্দুক নিয়ে বাঘের পেছনে না গিয়ে।

ভীমা বলল, এসব কথা তোমরা বুঝবে না। এক শিকারির পাশ থেকে অন্য শিকারিকে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়ে কড়মড় করে হাড় মুড়মুড়িয়ে খেলে সে মানুষ আর মানুষ থাকে না, বনেজঙ্গলে এমন এমন ঘটনা ঘটে যখন তাবড় তাবড় শিকারিও শিশুর মতো ভয় পায়। ওই বাঘ প্রেমার শিকারি জীবনকে শেষ করে

দিয়েছে। ঋজু সাহেব যদি ওকে সঙ্গে নিত তবে হয়তো ওর হারানো বিশ্বাস ফিরে আসতেও পারত। তা তো হল না। সাহেব আমাকেই বাছলেন।

জায়গাটাতে পৌঁছে আমরা লোকটির হাতে যে দু ব্যাটারির টর্চ ছিল তা দিয়ে বাঘিনীর পায়ের দাগ দেখলাম ভাল করে। আমি তো সেই দাগের সঙ্গে তিননদীয়া নালার পারে যে দাগ দেখেছিলাম তার কোনও তফাত বুঝতে পারলাম না। ভীমাকে বললাম, ভাল করে দেখতে। ভীমাও দেখে একটু অবাকই হল। বাঘিনী কেশকাল বাংলোর অত কাছে ছিল কাল। আমাদের নিশ্চয়ই নজর করেছে ভাল করে। কে জানে। চাঁদের আলোর আর ছায়ার বুটিকাটা বনে সে হয়তো আমাদের পিছু পিছু এসে দেখেও গেছে যে আমরা কেশকালের বাংলোতে উঠেছি। তাই হয়তো বাংলোর কাছ থেকে সরে গেছে।

গ্রামের লোকটা বলল যে, বাঘিনী আজ রাতেই এ গ্রাম থেকেই আর কাউকে ধরবে। এখানে কারও বাড়িতেই বাথরুম নেই। রাতে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্যে দরজা খুলে কেউ দুমিনিটের জন্যে বের হলেই বাঘিনী তাকে ধরবে। এরকম করে অনেক গ্রাম থেকে রাতে মানুষ নিয়েছে বাঘিনী। সে বলল, হুজৌর, আপনি আর ভীমা সিং এ রাতটা ওই গ্রামেই কারও ঘরে থেকে গেলে আমরা নিশ্চিন্ত হই, আর আপনারাও বাঘ মারার একটা সুযোগ পান।

আমার মনে অন্য চিন্তা ছিল। চিন্তার সূত্রটা কমজোরি। কিন্তু মনে কু ডাক দিচ্ছিল। আমি ভীমাকে বললাম, বন্দুকটা আমাকে দাও এবং রাইফেলটা তুমি রাখো। তুমি এ গ্রামে থাকো। কাল সকালে ওই জিপে করে কেশকালে ফিরে এসো। ও যখন এত করে বলছে তখন রাতটা থেকেই যাও। ওদেরও ভরসা হবে এবং তোমারও একটা সুযোগ এলেও আসতে পারে।

ভীমা বলল, থাকতে পারি। তবে কোনও ঘরে থাকব না। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকলে লাভ হবে না। আমি রাইফেল হাতে টহল দিয়ে বেড়াব গ্রামে।

লোকটি বলল, আত্মহত্যা করতে চাইলে তো আমাদের গ্রামে মস্ত তেঁতুল গাছ আছে। কুয়োর দড়ি গলায় দিয়ে তা থেকে ঝুলে গেলেই তো হয়। বাঘিনীর দাঁতে-নখে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আত্মহত্যা করার দরকার কী?

ভীমা বলল, সে আমি বুঝে নেব।

ফিরে আসার আগ থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটার বোল্ট কী করে খুলে গুলি রিচার্জ করতে হয় তা ওকে দেখিয়ে দিলাম। ম্যাগাজিনটাও বোল্ট খুলে দেখালাম। ভীমা আগে রাইফেল ব্যবহার করেছে। কী করে ফ্রন্টসাইট আর ব্যাকসাইট মিলিয়ে নিয়ে নিশানা নিতে হয় তা ও জানে।

জিপে যখন কেশকালে ফিরে আসছিলাম তখন ঠান্ডা লাগছিল হাওয়ায়। এই আজকে যেমন ঠান্ডা, বৃষ্টির পরে। চলন্ত দুপাশ খোলা জিপে ঠান্ডা বেশি লাগেও। সে তো আর তোমাদের মতো টয়োটা-কালিস আর টাটা সুমো নয়, এয়ারকন্ডিশানড। তখন দেশে কারওরই এয়ারকন্ডিশানড গাড়ি ছিল না।

রাজা-মহারাজার ইমপোর্টেড গাড়ি ছাড়া।

এমন সময়ে চৌকিদার এসে বলে গেল, খানা বন গিয়া হুজৌর। লাগা দুঁ ক্যা?

ভটকাই বলল, নেহি নেহি। হাম ইনস্পেকশন করেগা। উসকি বাদই লাগানা খানা। ওর আভভি তো ইকদমই নেহি। আভি ম্যান-ইটিং টাইগ্রেস ফলো কর রহা হ্যায় হামলোগোকো।

বাক্যবন্ধর শেষাংশ বুঝতে পারল না চৌকিদার। তার দরকারও ছিল না। খাবার তখন লাগবে না এই কথাটা সে প্রাঞ্জলভাবে বুঝল।

ভটকাই হিন্দি একেবারেই বলতে পারত না। নাঃ, ছোঁড়ার অধ্যবসায় আছে। ও যে এই কবছরে কত উন্নতি করল কত ব্যাপারে চোখের সামনে, তা দেখেও ভাল লাগে। ভটকাই আমার কম্পিটিটর নয়, আমার কমপ্লিমেন্ট।

ভটকাই বলল, বলো ঋজুদা, বাঘিনীর দফা রফা হলে তার পরেই আজ খাওয়া হবে।

প্রদীপ কাকুরাও সমস্বরে বললেন, সেটা ঠিকই বলেছে ভটকাই। বাঘিনী যতক্ষণ না মরছে ততক্ষণ খেতে বসা ইমপসিবল।

ঋজুদা বলল, ভীমাটার খাওয়াই হল না আজ রাতে। জানি না গ্রামের কেউ ওকে খাইয়ে দেবে কিনা। চৌকিদারকে বললাম, ভীমার খাবার তুলে রাখতে, সকালে এসে খাবে।

ওরা সকলেই জিজ্ঞেস করল, প্রেমা সিংয়ের ছেলের কী হল? সব বললাম, ওদের। এও বললাম যে তোমরাও একটু সাবধানে থেকো। বাইরে বেশি রাত অবধি থেকো না। বাঘিনী যদিও কোনও কনবাংলো থেকেই কারওকে নেয়নি কিন্তু বাঘিনী তো আর বনবিভাগে কাজ করে না। বনবিভাগকে ভয় করার ধার সে ধারে না।

সামান্য খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না। আসবার কথাও না। বাইরে পিউ-কাঁহা আর কোকিল পাগলের মতো চাঁদভাসি বনে উথালপাথাল পূর্ণিমার রাতে ডেকে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি, এই কেশকালের মতো জায়গাতে একটা ঘোর তৈরি করে দেয়। তখন কাজকর্ম, মানুষখেকো বাঘিনী ইত্যাদি কোনও কথাই আর মনে থাকে না। নিজের মনে নিজে বুঁদ হয়ে গিয়ে চুপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়।

ঘুম কখন এল জানি না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তাও নয়। রাত তখন কত তাও জানি না। হঠাৎ ঘরের দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম, বাইরে একটা শোরগোল হচ্ছে। বালিশের তলাতে রাখা হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখলাম, রেডিয়াম দেওয়া তাতালে সাড়ে চারটে দেখাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই দেখি ওরা পাঁচ-ছজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চৌকিদার আমার পায়ে পড়ে গিয়ে বলল, আমার বউকে বাঘে নিয়ে গেল

হুজৌর। তাকে ফিরিয়ে আনুন। আপনি এই বাংলোতে থাকতে এমন ঘটতে পারে এ কি বিশ্বাস করার।

বড় ছোট লাগল নিজেকে। মানুষখেকো বাঘ বা বাঘিনী যে মানুষকে মুখে করে একবার নিয়ে যায় তাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনার মতো ক্ষমতা জিম করবেটেরও ছিল না আমি তো কোন ছার!

শুনলাম, ব্যাপারটা ঘটেছে মিনিট কুড়ি আগে। ওদের কোয়ার্টার্স থেকে বাথরুমটা সামান্যই দূরে। বড় বড় ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে বনবাংলোর হাতায়, চৌহদ্দিতে। শেষরাতে বাথরুমে গিয়েছিল তার বউ। একটু পরে ঘোরের মধ্যে চৌকিদারের হুঁশ হয়েছে যে সে আসছে না কেন? যখন সে দরজা খুলে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেছে, মাঝপথে দেখে আলোর মধ্যে চকচক করছে তার বউয়ের ভাঙা কাচের চুড়ি আর গলার ছিঁড়ে যাওয়া পুঁতির মালা। দেখেই সে চিৎকার করে উঠেছে। ফরেস্ট গার্ড এবং তার চেলারাও সবাই বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। আমার ঘরের দরজাতে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাবে কি না তা ভাবতে ভাবতে দশ-পনেরো মিনিট কেটে গেছে ওদের। কী আর বলব!

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা লোডেড ওভার-আন্ডার বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলির বাক্স থেকে আরও দুটি রোটাক্স বল পাঞ্জাবির পকেটে পুরেই আমি ঘরের বাইরে এলাম। তারপর বাথরুমের সামনে, যেখানে চৌকিদারদের বউকে বাঘিনী ধরেছিল, সেখান থেকে মাটিতে বাঘিনীর পায়ের দাগ দেখে দেখে এগোলাম। বাংলোটা যেহেতু ডুংরির ওপরে, তার সামনে খাড়া নেমে গেছে খাদ। তবে শ'খানেক ফিট মাত্র। তার পরে কয়েকটা ধাপে ধাপে উৎরাই নেমে গেছে প্রায় তিনশো ফিটের মতো। বাঘ সেখান দিয়েই নেমেছে নীচে চৌকিদারের বউকে ঘাড় কামড়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে। সামান্য দূর গিয়েই তার শাড়ি ছিঁড়ে গেছে পুটুস-এর কাঁটা লেগে। তারপর শাড়ি খুলে গেছে।

আমি প্রায় স্লিপ করে নামার মতো করে নামতে লাগলাম নীচে। সময় নষ্ট করার সময় নেই। আমারও পেছন ছড়ে গেল। পাজামা ছিঁড়ে গেল। পশ্চাৎদেশের অবস্থাও অতীব শোচনীয় যে সেটা পরে বুঝতে পারি। বন্দুকটাকে শুধু সামলে রাখলাম যেন ঠোক্কর না খায় কোথাও। টর্চের দরকার ছিল না কোনও, এত আলো ছিল চাঁদের। খাদের একেবারে নীচে নেমেই বাঘ বাঁদিকে ঘুরেছে। ছ্যাঁচড়ানোর দাগ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল। এইখানে চৌকিদারের বউয়ের লালরঙা সায়াটাকে দাঁত দিয়ে খুলে নিয়েছিল বাঘ। লাল সায়াটা চাঁদের আলোয় কালো দেখাচ্ছিল। আসবার সময়ে একজন সাহসী ফরেস্ট গার্ড জিজ্ঞেস করেছিল আমার সঙ্গে যাবে কিনা। আমি বারণ করেছিলাম। যেখানে নিজের জীবনের দায়িত্ব নেওয়াই কঠিন, সেখানে নিরস্ত্র অন্য কারও জীবনের দায়িত্ব নেওয়াটা মূর্খামি। আজকে হয় বাঘিনী

মরবে, নয় আমি। ইসপার উসপার হবে। বাঁদিকে অনেকখানি জায়গাতে শাল চারার জঙ্গল। চারাগুলো হাঁটু সমান হয়েছে। তার মধ্যে ঝড়ে পড়ে যাওয়া একটা মস্ত শিমূল গাছ শিকড়-বাকড় বের করে পড়ে আছে। গাছটা পড়েছে মনে হয় বহু বছর আগে। প্রচণ্ড ঝড় হয়ে থাকবে, নইলে শিমূল গাছকে সহজে উপড়ানো যায় না। তার শিকড়ের জোর এমনই। তবে মাটিও এখানে আলগা। জায়গাটা ভিজে ভিজে। একটা ছোট্ট নালা বয়ে গেছে একটু দূর দিয়েই।

তিরতির করে জল যাওয়ার শব্দ আসছে। আমার তাড়া নেই কোনও। চৌকিদারের বউকে বাঁচানোর কথা ওঠেই না। সে এতক্ষণে শান্তির দুনিয়াতে চলে গেছে। তাকে বাঁচানো নয়, বাঘিনীকে মারাই তখন একমাত্র কাজ। আমি একটা পাথর দেখে তার ওপরে পা দুদিকে ছড়িয়ে বসলাম বন্দুকটা দুউরুর ওপরে শুইয়ে। কান খাড়া করে নিজে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে কিছু শুনতে পাই কিনা তার অপেক্ষায় থাকলাম। প্রেমা সিংয়ের ছেলেকে মেরেও সে খেতে পারেনি। বাঘিনী অত্যন্তই ক্ষুধার্ত। তাকে এখুনি খেতেই হবে। এবং বাঘ খেলে শব্দ হয়ই। এইটুকুই ভরসা।

মিনিট পাঁচ-সাত সেই পাথরের ওপরে বসে থাকার পরে চপ চপ করে মাংস ছেঁড়ার এবং চিবোবার আওয়াজ শোনা গেল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। বাংলো থেকে নেমে আসার পরে মিনিট পঁচিশেক কেটে গেছে। ঠিক করলাম যে, বাঘ যখন নির্বিঘ্ন হয়েছে ভেবে খাওয়াতে মন দেবে, তখনই আমি গিয়ে চড়াও হব তার ওপরে কোনওরকম লুকোচাপা না করে। যা হবে তা হবে।

চাঁদের আলো তখনও আছে কিন্তু আর সামান্যক্ষণই থাকবে। সূর্য ওঠা আর চাঁদ ডোবার সন্ধিক্ষণে একটু অন্ধকার হবে। তার পরেই দিনের আলো পরিষ্কার হবে। আমি আরও দশ মিনিট বাঘকে খেতে দিয়ে পুবের আকাশ সাদাটে হতেই আস্তে আস্তে খুবই সাবধানে পা ফেলে ফেলে ওই শিমূল গাছটার দিকেই এগোতে লাগলাম। শিমূল গাছটার আড়ালেই বাঘ চৌকিদারের বউয়ের মৃতদেহ রেখে খাচ্ছে। শিমূল গাছটা থেকে হাত কুড়ি দূরে পৌঁছে গেছি, এমন সময়ে একটা শালচারা পাজামার মধ্যে ঢুকে যেতেই একটু শব্দ হল। শব্দ হওয়ামাত্রই বাঘ শিমূল গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে আমার দিকে তাকাল। তখন সবে ভোর হচ্ছে। সেই আবছা আলোতে দেখা বাঘিনীর সেই বীভৎস মুখ এ জীবনে কখনও ভুলব না। তার মাথা-মুখ-চিবুক-গোঁফ—সব মানুষের রক্তে লাল। বাঘিনী মাথা তুলে আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুক তুলে আমি লেথাল বল ভরা ব্যারেলের ট্রিগার টানলাম বাঘের মাথা লক্ষ করে। চার চোখের মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে যে আমাকে গুলি করার আগেই ধরে ফেলতে পারল না তা ঈশ্বরের দয়া, আমার কোনও কৃতিত্বই নেই তার পিছনে।

বড় শিকারিরা বলেন যে, কখনও সামনা-সামনি বাঘকে গুলি করতে নেই।

কারণ, বাঘের মাথার খুলিটা oval shape-এর। গুলি স্কিড করে বেরিয়ে যায়। অনেক সময়েই মস্তিষ্কে ঢোকে না। কিন্তু আমার উপায় ছিল না কোনও। শুধুমাত্র বাঘের মাথাটিই দেখা যাচ্ছিল।

ফোটা কার্তুজটা ইজেক্ট করে পকেট থেকে একটি গুলি তড়িৎগতিতে বের করে ফাঁকা ব্যারেলে ভরেই আমি দৌড়ে গেলাম শিমূল গাছের দিকে আর কোনওরকম লুকোচাপা না করে। বাঘ ধরলে ধরবে আমাকে, এই স্থির করে। শিমূল গাছের ডালের ওপরে পা দিয়ে উঠতেই দেখি বাঘিনী চৌকিদারের সুন্দরী স্ত্রীর শরীরের ওপরে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। বাঘের শরীরটা চৌকিদারের বউয়ের শরীরের বাইরে আছে। শুধু মাথাটা আছে বুকের ওপরে। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে আমি তার হার্ট লক্ষ করে আরেকটি গুলি করলাম। তাতে বাঘিনীর কোনও ভাবান্তর ঘটল না। বুঝলাম একটু আগে সে চৌকিদারের বউকে যে শান্তির রাজ্যে পাঠিয়েছিল, নিজেও তখন সেই শান্তির রাজ্যে পৌঁছে গেছে।

যখন বুঝলাম যে বাঘিনী মরেছে তখন আমার দরদর করে ঘাম ছুটল। পা যেন কাঁপতে লাগল। টেনশন হঠাৎ কেটে গেলে হয় এরকম।

কেশকাল বাংলোর সকলে যাতে বুঝতে পারে যে বাঘিনী মরেছে, তাই ব্যারেলের একটি গুলি আর পকেট থেকেও অন্য গুলিটি বের করে অন্য ব্যারেলে পুরে পরপর দুবার শূন্যে গুলি করলাম। তারপর নিজের আদ্দির পাঞ্জাবিটা খুলে চৌকিদারের সুন্দরী বউয়ের রক্তাক্ত, দগদগে শরীরটাকে ঢেকে দিয়ে শিমূলের ভূপতিত গুঁড়িতে এসে বসলাম। পাঞ্জাবি খোলার আগে বাঁ পকেট থেকে পাইপ আর লাইটারটা বের করে নিয়েছিলাম। পাইপটা ধরালাম। আঃ, পাইপ খেয়ে বহুদিন এত আরাম পাইনি।

চৌকিদারের বউয়ের কথা ভেবে মনটা ভারি খারাপ লাগছিল। কিন্তু বাঘিনীর কথা ভেবে মনটা খুব ভালও লাগছিল। বউকে বাঁচানো আমার হাতে ছিল না। আমি এখানে পৌঁছবার অনেক আগেই সে মরে গিয়েছিল।

এদিকে আকাশে অনেকক্ষণ আগে চাঁদ মরে গেছে আর সূর্য জন্মেছে।

পরপর অতগুলো গুলির শব্দ শুনে ওরা পড়ি কি মরি করে একে একে স্লিপ কেটে নীচে যে নামছে তার আওয়াজ পেলাম। ধুপ ধুপ শব্দ করে ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে এবারে। আমি ঝড়ে পড়া শিমূল গাছের কাণ্ডের ওপরে বাঘিনীর রক্তখাকি মুখটি দেখে যত না চমকে উঠেছিলাম, ওরা সকলে খালি গায়ে পাইপ মুখে কিম্ভুতকিমাকার আমাকে বসে থাকতে দেখে তেমনই চমকে উঠল।

বাঘিনী আমার পাঞ্জাবি খুলে নিল? হয়তো ভাবছিল ওরা।

চৌকিদার এসে আমার পায়ে পড়ল। যা হারাবার তা তো সে হারিয়েইছে। বদলা যে নিতে পারা গেছে এই তার সান্ত্বনা।

তার পর ঋজুদা বলল, এবারে চল, খাবার লাগাতে বল, খিদে পেয়েছে। কমক্ষণ ধরে বকবক করছি না।

তা বাঘিনী কেন মানুষখেকো হল সেটা তদন্ত করে বের করলেন তো? পরে?

তাপসকাকু বললেন।

হ্যাঁ। বেলা প্রায় একটার সময়ে ভীমা আর আমি বাঘের চামড়া ছাড়াবার সময়ে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে সেই রহস্যের একাধিক সূত্র অবশ্যই আবিষ্কার করেছিলাম। প্রেমা সিংও এসে যোগ দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। তার আগে স্কিন করা যায়নি। চারদিকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে মানুষ এসেছিল বাঘিনীকে দেখতে। তারা নাচ-গান করছিল। লাড্ডু বিলোচ্ছিল। প্রেমা তার ছেলের হত্যাকারীর চামড়া আক্ষরিকভাবে ছাড়িয়ে সান্ত্বনা পেয়েছিল একটু।

কী আবিষ্কার করেছিলেন?

মৈত্রকাকু বললেন।

আবিষ্কার করেছিলাম যে, মানুষখেকো হওয়ার জন্যে বাঘিনীর কোনও অপরাধ ছিল না। মানুষেরাই এর জন্যে দায়ী। এবং ভটকাইয়ের মতো কিছু অতি-বাহাদুর অপরিণামদর্শী শিকারিই।

ভটকাই বলল, কথায় বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ। আর তুমি কি ভটকাইয়ের পিণ্ডি না গেলে কোনও কাহিনিই শেষ করতে পার না, ঋজুদা? তোমাকে দেখি রুদ্রর রোগে পেল।

প্রদীপ গাঙ্গুলি কাকু বললেন, তা তদন্তের ফলটা কী হল? মানে একটু ডিটেইলসে বলুন দাদা।

ঋজুদা বলল, বলব, খাওয়ার পরে। এখন চলো, ওঠো। খাই গিয়ে। অবশ্য ভটকাইয়ের ডিরেকশনে রান্না, মুখে দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

ওঁরা সকলে ডোংরি থেকে নেমে খানা কামরার দিকে এগোলেন। আলোকিত কেশকালের বাংলোর নীচের জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে চেয়ে হঠাৎই আমার গা ছমছম করে উঠল।

তাপসকাকু ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঋজুদাকে বললেন, বাঘিনী যখন মুখ তুলল এবং আপনাকে দেখে ফেলল, আপনার ভয় করল না?

করল আবার না! মানুষমাত্ররই ভয় করে। পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী মানুষেরা, যেমন এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলটরা কি ভীরু নন? প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভয় ও সাহস—দুইই লুকিয়ে থাকে। কোন মুহূর্তে যে কোনটার প্রকাশ হবে তা ওপরওলাই জানেন।

একটু থেমে, সমতলে নেমে ঋজুদা বলল, তবে একটা জিনিস জীবনে অনেকদিন পরে উপলব্ধি করেছি।

কী সেটা?

সঞ্জীবকাকু বললেন।

নিজে মরতে রাজি না থাকলে কারওকেই মারা যায় না। সে মানুষখেকো বাঘই হোক কী জঙ্গল-দস্যু বীরাপ্পান। বীরাপ্পান আমাদের সকলের লজ্জা। আমার ধারণা, যারা তাকে মারতে-ধরতে গিয়েছিল তারা কেউই মরতে রাজি ছিল না।

ভটকাই বলল, কেন? বহু মানুষই মরেছে এ পর্যন্ত।

মরেছে। কিন্তু বীরাপ্পানেরই ইচ্ছাতে। স্বেচ্ছায় নয়। স্বেচ্ছায় মরতে চাইতে হবে।

# লিলি সিম্পসন-এর বাঘ

উরি বাবাঃ। একেবারে কাঁড়িয়া পিরেত মারা শীত।

রুদ বাংলোর বসার ঘরের দরজাটা ফাঁক করে ট্রেতে করে এক থালা গরম পেঁয়াজি বাবুর্চিখানা থেকে এনেই দড়াম করে শালকাঠের পেল্লায় পাল্লাটাকে ভেতর থেকে বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ঢুকল ভটকাই। ঢুকে, ট্রেটাকে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল। বলল, যে যে গরম পেঁয়াজি খেতে চাও, খেয়ে নাও। দ্যাখো আনতে আনতেই বোধহয় কুলফি হয়ে গেল। বিলেতেও এত শীত নেই।

তুই কি বিলেতে গেছিস?

যাইনি, যাব কখনও নিশ্চয়ই।

ঋজুদা পাইপটা মুখ থেকে বাঁ হাত দিয়ে নামিয়ে ডান হাত দিয়ে একটা পেঁয়াজি তুলে নিতে নিতে আমাদের বলল, সত্যিই রে। খেলে খা। এখুনি ঠান্ডা হয়ে যাবে।

তারপর ভটকাইয়ের দিকে ফিরে বলল, কাঁড়িয়া পিরেত তো ভূশণ্ডির মাঠের পেতনিই, সে আবার নতুন করে মরবে কী করে!

বাংলার পেনেটির কাছের ভূশণ্ডির মাঠ আর পালামৌয়ের এই রুদ বাংলো। কীসের সঙ্গে ইসে। ভূত পেতনিও এই শীতে নির্ঘাত মারা যাবে।

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, এখানে তাই বাংলার ডিসপেপটিক, যখন-তখন চা খাওয়া টিংটিঙে এ ভূত বা নেকি পেতনি পাবি না। এখানের ভূতদের ব্যাপারই আলাদা।

তিতির বলল, তুমি কি পালামৌর ভূতদের ওপরে অথরিটি?

আমি নই। রমেনদা। ঋজুদাকে জিজ্ঞেস কর না। রমেনদাকে আমি মাত্র একবারই মিট করেছিলাম বেতলাতে। তাও অনেকদিন আগে। তখন রমেনদা লাঠি নিয়ে চলেন। জিপ অ্যাক্সিডেন্টে একটি পা কেটে বাদ দিয়ে ছোট করে দিতে হয়েছিল। ছিলেনও গড়িয়াহাটের প্রেসিডেন্সি নার্সিংহোমে বহুদিন। তখন ঋজুদার

সঙ্গে দেখতেও গেছিলাম ওঁকে একদিন। তাই না ঋজুদা?

হুঁ।

ঋজুদা বলল।

তা তোর রমেনদার সঙ্গে পালামৌর ভূতেদের কী সম্পর্ক?

সে তার নিজের মুখে শুনলে বুঝতি। তবে দুরকমের ভূতের কথা আমার মনে আছে। প্রথম রকম দারহা ভূত। তার সঙ্গে জঙ্গলের পথে একলা তোর যদি কখনও দেখা হয়ে যায় তো সে একবার শালগাছের মতো লম্বা আর একবার পুটুস ঝাড়ের মতো বেঁটে হয়ে যাবে। দেখতে অতি সাধারণ দেহাতি। খাটো ধুতি আর ফতুয়া বা শার্ট পরনে, শীতকাল হলে কাঁধে একটা কম্বল। সে ওমনি ক্রমাগত লম্বা আর বেঁটে হতে থাকবে।

তারপর?

ভটকাই ইন্টারেস্ট পেয়ে, পেঁয়াজিতে কামড় দিয়ে বলল।

তারপর, হয় তোমার জান বাঁচাবার জন্যে তার সঙ্গে কুস্তি লড়ো, নয়তো ফওত হয়ে যাও।

ফওত হয়ে যাও মানে?

ভটকাই প্রশ্ন করল।

মানে, তোর ভাষাতে ফুটে যাওয়া আর কী। তবে সে ওমনি ফোটা নয়। পার্মানেন্ট ফোটা। মরে তুমি হয় পুটুস ফুল নয় কেলাউন্দা হয়ে জঙ্গলের অঙ্গ হয়ে যাবে। মনুষ্যত্ব গায়েব হয়ে যাবে।

আর অন্যরকম ভূত?

সে ভূতকে দেখা যায় না। তারা কোয়েল নদীর খাত ধরে খাপু খাপু খাপু খাপু করে ডাকতে ডাকতে পাখি হয়ে ওড়ে। চাঁদনি রাতে বেশি ওড়ে অন্ধকার রাতের চেয়েও। সেই সময়ে কেউ যদি নদীর দিকে যায় তবে ঘাড় মটকে দেয় নিপুণ হাতে। ঘাড় মটকাবার শব্দটা পর্যন্ত শোনা যায় না।

যত্ত সব গ্যাঁজা গুল।

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, নিজের সাধের ঘাড়টি যখন মটকাবে তখনই জানবে গ্যাঁজা না গুল। গাড়ু বাংলোতে আমি একবার ঋজুদার সঙ্গে ছিলাম গরমের দিনে। চাঁদনি রাতে নদীর দৃশ্য একটু ভাল করে দেখতে নদীর দিকে নেমেছি কয়েক পা বাংলো ছেড়ে, শুনি খাপু খাপু খাপু ডাক।

তারপর?

তারপর আর কী? এক লাফ মেরে প্রায় দৌড়ে বাংলোর বসার ঘরে যেখানে ঋজুদা, মোহনদা, রমেনদা, বাবলুদা, নিমাইদারা সব বসে গল্প করছিল। এক পাটি স্লিপার পড়ে রইল বালিতেই।

ওরা সকলে সমস্বরে বললেন, কী হল? রুদ্র?

আমি বললাম, কিছু না তো।

পরদিন সকালে চটির পাটিটি উদ্ধার করি।

ঋজুদা হাসি হাসি মুখ করে আমার নির্জলা গুল শুনছিল। এমন রাতে, এমন পরিবেশে, এমন ঠান্ডায় ভূত-প্রেত সব কিছুই মানিয়ে নেওয়া যায়।

ঋজুদা বলল, গাড়ুর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে এত বড় কংক্রিটের ব্রিজ হয়ে। যখন ব্রিজ ছিল না তখন শীতকালে বাঁশের চাটাই পাতা থাকত, নদীতে যেখানে কম জল সেখানে। মোহনরাই পাতাত। যাদের অনেক ট্রাক বা জিপ ওপারে যেত-আসত, তারা ছাড়া আর কার গরজ? অনেক নির্জন ছিল জায়গাটা। গাড়ু বস্তিটাও এত বড় হয়ে ওঠেনি তখন। বড় বাঘের ডিপো ছিল তখন গাড়ু। ওপাশে কুটুকু আর ওদিকে মারুমার। মারুমারে অবশ্য নদী ছিল না। নালা ছিল একটা। গাড়ু আর কুটুকু ছিল নদীর ওপরেই।

আর কেচকি? ঔরঙ্গা আর কোয়েলের সঙ্গমে?

তিতির বলল।

হ্যাঁ কেচকি পিকনিক স্পট ছিল, শিকারের জায়গা ছিল না।

তারপর চুপ করে থেকে বলল, মাঝে মাঝে মনে হয় এই সমস্ত জায়গার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে যাই। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো এসব স্মৃতি মুছে যাবে। কতদিনের কতরকম স্মৃতি। কত মানুষ, শহরের, গ্রামের, জঙ্গলের। পালামৌতে এখনই আসি না, নইলে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর প্রতি বছর একাধিকবার এসেছি। তা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল মোহন বিশ্বাসের বাবা মুকুন্দলাল বিশ্বাস আর প্রিন্স অফ পালামৌ মোহন বিশ্বাসেরই জন্যে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার।

তুমি না লিখলে কী হবে, তোমার চেলা রুদ্র রায় তো কম লেখেনি তোমার সম্বন্ধে।

তা ঠিক। ওই তো বিখ্যাত করে দিল ঋজু বোসকে। নইলে, কে আর তাকে চিনত। এমনই বেশি বিখ্যাত করল যে মাঝে মাঝে এমব্যারাসিং লাগে।

তুমি কী বলছ ঋজুদা! আজকে বাংলার প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে একজন করে ঋজু হয়ে গেছে তা কি তুমি জান? সকলের ছেলের নামই দেখি ঋজু।

এমনকী বাস ও ট্যাক্সির নামও হয়ে গেছে ঋজু।

তাই? এ সবই রুদ্রর অপকীর্তি।

ঋজুদা বলল।

এই রুদ বাংলো ঘিরে তোমার কী স্মৃতি আছে?

স্মৃতি তো আছে অনেকই। তার মধ্যে রুদের মানুষখেকো বাঘ শিকারের স্মৃতিটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল।

মানুষখেকো বাঘ? রুদে? কত বছর আগে?

তা পঁয়ত্রিশ বছর তো হবেই কম করে। তখন আমি একেবারে ছেলেমানুষ।

জেঠুমনির মক্কেল ছিলেন মুকুন্দলাল বাবু। সেই সুবাদেই জেঠুমনি পালামৌতে প্রথমবার আসেন পঞ্চাশের দশকে। আমি তখন স্কুলে পড়ি। তারপর আঠারো বছর বয়স হতেই একা একাই আসতাম জেঠুমনি ও মুকুন্দবাবুর প্রশ্রয়ে। মোহন আমার ছোট ভাইয়ের মতো ছিল। অল্প বয়সে মুকুন্দবাবু মারা যাওয়ার পর মোহনই এত বড় ব্যবসাকে আরও অনেক বড় করে। মোহনের সাকরেদরা ছিল রমেনদা, বাবলু, নিমাই, শান্টু এবং আরও অনেকে। সেসব অন্য প্রসঙ্গ। কত আনন্দ যে করেছি ওদের সকলের সঙ্গে বহু বহু বছর, তা বলার নয়। ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতার যে ঋণ, তা এ জীবনে শোধবার নয়।

তারপর বলল, এ জন্যেই আজকাল সাঁওতাল পরগনাতেই আর আসতেই ইচ্ছে করে না। হাজারিবাগে গোপাল সেন নেই, সুব্রত চ্যাটার্জি নেই, মহম্মদ নাজিম নেই, ডালটনগঞ্জে মোহন নেই, বাবলু নেই, রমেনদাও কলকাতাতে। যাঁদের কথা বলতে গিয়ে 'নেই' বললাম তাঁরা একেবারেই নেই। মোহন আমার চেয়ে অনেক ছোট ছিল, বাবলুও। গোপাল ও সুব্রত সমবয়সি—আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু বনজঙ্গলের। নাজিম সাহেব যদিও বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু স্পিরিটে নয়। মনমৌজি, জিন্দা-দিল, জবরদস্ত পুরুষমানুষ। তোরা তো জানিস, শহরে আমার কোনও বন্ধু নেই, শত্রু আছে অনেক। বন্ধুরা সব জঙ্গলের বন্ধু ছিল। আজ তারা প্রায় কেউই নেই। অসময়ে চলে গেছে অনেকেই।

তারপরে বলল, হ্যাঁ থাকবার মধ্যে ওড়িশার কটকে আছেন চাঁদুবাবু, সমরেন্দ্রনাথ দে আর অঙ্গুলে বিমলবাবু, বিমল ঘোষ। কটকের ফুটুদা, পি কে সুরও চলে গেছেন। চাঁদুবাবু ও বিমলবাবু বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড় হলেও, তাঁরা ভালই আছেন। ওড়িশার জঙ্গলের সেসব দিনের কথাও ভোলার নয়।

তারপর বলল, বয়স তো কারওই বসে থাকে না। মেঘে মেঘে বেলা বাড়েই। চলে যাওয়ার আগে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা, নমস্কার জানাতে ইচ্ছা করে যদিও জানি না, যাঁদের উদ্দেশে তা জানানো, তা তাঁদের কাছে পৌঁছবে কি না!

রুদের বাঘের গল্পটা আমাদের শোনাবে না ঋজুকাকা?

তিতির বলল।

শোনাব না কেন? তবে আজকে নয়। আছি তো আরও দুদিন। আজ রাতে, কথা যে হয়েছে, শুধুই গান হবে। আগে তিতির তারপরে ভটকাই তারপরে রুদ্র।

আর তুমি? তিতির বলল।

আমি আবার গায়ক নাকি?

আমরা যদি গায়ক হই তো তুমি বড় গায়ক।

সে হবে। আর্টিস্ট বেশি হয়ে গেছে। দেখা যাবে।

## দুই

পরদিন আমরা মিরচাইয়া ফলস-এ পিকনিকে গেলাম। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঋজুদা আমাদের সুগা বাঁধ আর মারুমারের বনবাংলো দেখিয়ে আনল। মিরচাইয়াতে লছমন আর ইকবালকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল রসদপত্র দিয়ে। মিরচাইয়াতে এখন জল কম। বিরাট কালো চ্যাটালো পাথরগুলো, যাদের ওপর দিয়ে প্রপাতের জল নামে ওপর থেকে, এখন ন্যাড়া। ওই একটা পাথরের ওপরে রান্না-বান্নার বন্দোবস্ত করছে লছমনেরা। মুগের ডালের খিচুড়ি, বেগুনি, কষা মাংস আর টোম্যাটোর চাটনি। লছমন আবার টোম্যাটোকে বলে টোমাটম।

মারুমারের পুরনো বাংলোর পাশেই, ঠিক পাশে নয়, সামনের দিকে হুলুক পাহাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো একটি বড় কুসুমগাছের ওপরে একটি কটেজ বানিয়েছেন পালামৌর বনবিভাগ। সেই কটেজের নাম দিয়েছেন বুদ্ধদেব গুহ। "ক্স্মি"। এটা মারুমার বাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকেই জানতে পেলাম আমরা।

ঋজুদা বলল, কুসুম গাছে যে লাক্ষা হয় তাকে বলে কুস্মি। লেখক হয়তো লাক্ষার কোনও কারখানাতে গিয়ে থাকবেন নইলে নামের এই মিলটা কাকতালীয় বলতে হবে। গাছে যে লাক্ষা হয় তাকে বলে সিড ল্যাক আর সিড ল্যাক থেকে তৈরি হয় স্টিক ল্যাক।

তিতির বলল, ওই লেখকের 'সাসানডিরি' নামের একটি বইয়েতে আছে মুরহুর একটি লাক্ষা কারখানার কথা। 'মাধুকরী'র হাটচান্দ্রাতেও আছে লাক্ষা কারখানার কথা।

সাসানডিরি মানে কী?

আমি বললাম।

'সাসানডিরি' হচ্ছে মুন্ডাদের কবরখানা। তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, দেখলি। আমি কী আর এমনি এমনি বলি যে তিতির তোদের মধ্যে সবচেয়ে ওয়েল-ইনফর্মড।

ভটকাই বলল, তিতিরের যে খুব জ্ঞান তা আমরা জানি বলেই তো আমি ওকে মিস উইসডম বলে ডাকছি।

কবে থেকে ডাকছিস?

দু মাস হল।

বাজে কথা।

তিতির বলল।

তারপর বলল, তোমার যে কখন কী মতি হয়, তা তুমিই জান। তোমারও নাম আমি দিয়েছি একটা। এবার থেকে সকলেই সেই নামেই ডাকব তোমাকে।

কী?

মিস্টার গুলেরু।

গুল সকলে ইচ্ছে করলেই মারতে পারে না। গুল মারা একটা উঁচুদরের আর্ট।

তিতির বলল, কাল রুদ্র ভূতের গল্প বলছিলে তুমি। ঋজুকাকা, তুমি যে সারা পৃথিবীর বনে-জঙ্গলে এত ঘুরেছ, তোমার কোনও ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়নি।

ঠিক ভৌতিক বলব না, আধি-ভৌতিক বলতে পারিস।

আধি-ভৌতিক মানে কি আর্ধেক ভৌতিক?

ভটকাই বলল।

আমরা সকলে ভটকাইয়ের কথাতে হেসে উঠলাম।

জিপ তিতিরই চালাচ্ছিল। সামনে ঋজুদা বসেছিল। পেছনে আমি আর ভটকাই।

ঋজুদা বলল, হাসছিস কেন? ভটকাই বাংলাটা ভালই জানে। তা ছাড়া ওই স্ট্রং কমনসেন্স দিয়ে মানের প্রায় কাছাকাছি তো এসেছে।

বাংলা ও জানবে না কেন? আমাদের মধ্যে ওই তো একমাত্র যে বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়েছে এবং পড়ছে।

বাংলা জানব না কেন? তবে ওইসব ভূত-টুত সুপারস্টিশাস ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট নেই। তোরা ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুলে পড়ে কী করে যে এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলি, তা তোরাই জানিস।

আমরা আবার হাসলাম আর এক রাউন্ড।

তিতির বলল, আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু পুরো দিলে না তুমি ঋজুদা।

ঋজুদা মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে বলল, হ্যাঁ, সেই দুটোর মধ্যে একটা হয়েছিল এই অঞ্চলেই। বেতলার চেক নাকাতে। আর অন্যটা হয়েছিল ওড়িশার বামরাতে। ঠিক বামরাতে নয়। বামরা আগে করদ রাজ্য ছিল ইংরেজদের সময়ে। বামরা থেকে আমরা জিপে কনসর নদী পেরিয়ে কিলবগা বলে একটা জায়গাতে ঝুপড়ি বানিয়ে ছিলাম—সেইখানে। সঙ্গে জেঠুমনিও ছিলেন। তবে প্রথমটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিন্তু আমি সিদ্ধির গুলি খেয়েছিলাম। তাই ঘটনাটা গুলিজাত গুল না সত্যি তা আমি নিজেও জানি না।

ভটকাই বলল, আমরা আজকে রুদের বাঘের গল্প শুনব এমনই কথা ছিল। রয়েওছি যখন রুদ বাংলোতে তখন রুদের গল্পই আগে বলা উচিত তোমার।

এখন তো রুদে নেই, বিকেলে ফিরে যাব সেখানে। সেখানে গিয়েই শুনো।

দুসস। দিনের আলোতে ভূতের গল্প জমে না। ভূতের গল্পটা রাতের জন্যে তোলা থাক। এখন রুদের বাঘের গল্প বলো।

ডিরেক্টর ভটকাই বলল।

ততক্ষণে আমরা মিরচাইয়াতে প্রায় পৌঁছে গেছি। ঋজুদা বলল, তা হলে কী ডিসিশন হল?

তিতির বলল, ভটকাই বহুদিন পরে একটা মানবার মতো কথা বলেছে। মেনে নাও। কথাটা ঠিকই যে দিনের বেলা ভূতের গল্প জমে না।

তবে রুদের বাঘের গল্পটাই এখন শুনবি? গল্প শোনার আগে মিরচাইয়া পৌঁছে একটু কফির বন্দোবস্ত কর তো ভটকাই। এই রোদের মধ্যেও হাত যেন জমে যাচ্ছে। প্রতি বছর পূর্ব ভারতের অধিকাংশ বনে-জঙ্গলেই জানুয়ারির শেষে বৃষ্টি হয় আর ঠান্ডাটা জব্বর পড়ে! এবারেও ব্যতিক্রম নেই। তবে এখনও রোদ আছে। দেখবি, হয়তো রাত থেকে বৃষ্টি নামবে।

ঈরে বাবা। রোদের মধ্যেই হি হি করছি আর রাতে বৃষ্টি নামলে তো মরেই যাব।

তিতির বলল।

কিন্তু খিচুড়ি তো ওই দুপুরেই হয়ে গেল। রাতের মেনু কী হবে? কোয়ার্টার মাস্টার?

ঋজুদা ভটকাইকে জিজ্ঞেস করল।

ভটকাই বলল, ডিসিশন নেওয়া আছে। রাতে বার-বি কিউ হবে ক্যাম্পফায়ারে। ছোট শুয়োর, মানে, suckling pig জোগাড় করতে বলেছিলাম, তা পেল না চৌকিদারেরা। তার জায়গায় কেজি পাঁচেকের একটা পাঁঠা জোগাড় হয়েছে। জোগাড় করেছে ইকবাল।

ও এ জন্যেই শুয়োর পায়নি। শুয়োর ওদের হারাম না?

তাই তো। মনেই ছিল না। তাহলে অন্য কাউকে পাঠাতাম।

পাঁচ কেজি মাংস খাব চারজনে? আমরা কি রাক্ষস?

ডোন্ট বি সেলফিশ। চৌকিদার এবং আমাদের খিদমতগারেরা নেই? তারাই তো বেশি খাবে?

ম্যাগনানিমাস হয়ে ভটকাই বলল।

আর?

আর ঘিয়ে ভাজা গরম গরম পরোটার সঙ্গে খুব ঝাল করে আলুর তরকারি। আঁওলার আচার। তার ওপরে ভূতের গল্প তো আছেই।

তিতির বলল, জমে যাবে রাতে, কী বলো রুদ্র?

আমি বললাম, জমেই তো আছি কিন্তু এবারে শুরু করো ঋজুদা।

চল, জিপ থেকে নামি, ভটকাই কফিটা খাওয়াক তারপরে না হবে গল্প।

তা ঠিক।

ভটকাই বলল।

## তিন

জনি ম্যাকগাওয়েন আর লিলিয়ান সিম্পসন আমার সহপাঠী ছিল কানাডার মনট্রিয়ালের ম্যাকগিল উনির্ভাসিটিতে। লিলিয়ান আমাদের দুজনেরই বন্ধু ছিল। কিন্তু কী কারণে জানি না ওর আমার ওপরে বেশি দুর্বলতা ছিল। যে কারণে জনি আমাকে ঈর্ষা করত। যদিও আমাদের বিষয় ছিল আলাদা আলাদা। আমরা ছুটির দিনে, সামারে, স্লিপিং ব্যাগ পিঠে বেঁধে লম্বা লম্বা ট্রেকিংয়ে যেতাম। রাতের বেলা ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে রান্না করতে করতে, রান্না আর কী টিনের খাবার গরম করা আর কী, আমি ওদের ভারতবর্ষের জঙ্গলের গল্প বলতাম, জেঠুমনির গল্প। ওরা শুনতে শুনতে হেসে গড়াত। জনির এক মামা থাকতেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে। সেখানে জনি একবার ছুটিতে গেছিল। সেখান থেকে ফেরার পরে সে খুব উৎসাহের সঙ্গে আফ্রিকার গল্প শোনাত। ছেলেবেলাতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডঙ্কা বাজে' ইত্যাদি বই পড়ে আফ্রিকার প্রতি আমার এক দারুণ আকর্ষণ জন্মেছিল। তবে দক্ষিণ নয়, পূর্ব আফ্রিকা—যেখানে কিলিমানজারো পাহাড়, গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরি, সেরেঙ্গেটির ঘাসবন।

তারপর বলল, তোদের এসব কী বলছি, তোরা সকলেই তো আফ্রিকা-রিটার্নড।

সে তো তোমারই জন্যে। 'গুগুনোগুম্বারের দেশে', 'রুআহা' এসব জায়গাতে অ্যাডভেঞ্চার করা তুমি নইলে কি আর হত।

আমি কে? সবই ওপরওয়ালার করা। আমার মধ্যপ্রদেশীয় বন্ধু বদ্রিপ্রসাদ যাকে বলে 'সনযোগ'।

তিতির বলল, তুমি তো কানাডার মনট্রিয়াল দিয়ে শুরু করলে, বিশ্ববিখ্যাত ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, জনি ম্যাকগাওয়েন আর লিলিয়ান সিম্পসনকে দিয়ে সেখান থেকে পালামৌর রুদ বাংলো তো বহুদূর। একটু জলদি জলদি আগে বাড়ো ঋজুকাকা নইলে তো বাঘের গল্প শেষ হতে রাত হয়ে যাবে।

দেখি ভটকাই তোকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। নইলে আগে বাড়ো-টাড়ো তো তুই আগে বলতিস না।

বলে না, সঙ্গ দোষে স্বভাব নষ্ট। রুদ্র খুঁজে পেতে আমাদের জন্যে কী যে এক বাগবাজারি মাল এনে উপস্থিত করেছে। আমাদের সভ্যতা ভব্যতা স্বভাব নষ্ট হতে বসেছে।

তিতির বলল।

স্বভাব নষ্ট হচ্ছে কি না জানি না তবে 'মাল' 'টাল'-এর মতো শব্দ ব্যবহার না করাই ভাল। এসব তো প্রলেতারিয়েতদের শব্দ তোরা বুর্জোয়া আছিস বুর্জোয়াই থাক না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে এই দুর্লভ স্পেসি, 'চশমাচোখো' কি

'স্লো-লরিস' বাঁদরের মতোই আর দেখা যাবে না।

ঠিক বলেছ। ভদ্রলোকে যখন বলে না, বলা উচিত নয় অন্তত।

তিতির বলল।

ভটকাই বলল, যত দোষ নন্দের ঘোষ।

আমি বললাম, এবার গল্পে ফেরো ঋজুদা।

হ্যাঁ।

তা আমি ওদের বলতাম এই কানাডার জঙ্গলে ট্রেকিং করে কোনও উত্তেজনাই নেই। যে জঙ্গলে বাঘ নেই, চিতা নেই, হাতি নেই, ভালুক নেই, সাপ নেই আরও কত কিছুই নেই, সে জঙ্গলে ট্রেক করে বা প্রকৃতির মধ্যে রাত কাটিয়ে কোনওরকম উন্মাদনাই আসে না। মনে হয় ফুলের বাগানে শুয়ে আছি। এসো কখনও ভারতবর্ষে, জঙ্গল কাকে বলে দেখাব। আলো-ছায়ার রহস্য, বাঘের মতো দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বর প্রাণী, যে সারা জীবনই বলতে গেলে মুনি-ঋষিদের মতো একাই কাটায়।

জনি বলেছিল কোনওদিন ইন্ডিয়াতে গেলে বাঘ শিকার করাবে? আমি উত্তর আমেরিকার জঙ্গলে Moose শিকার করেছি আমার কাকার সঙ্গে।

আমি বলেছিলাম Moose তো তৃণভোজী। প্রকাণ্ড, মস্ত শিংওয়ালা অ্যান্টেলোপ আমাদের শম্বরের মতো, তা মারতে আর বাহাদুরি কী লাগে। তবে বাঘ মারতে বাহাদুরি লাগে। মাচায় বসে বাঘ দেখলেও তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে—এক্সট্রা ট্রাউজার নিয়ে এসো—সত্যিই যদি আসো কখনও।

শুনে লিলিয়ান খুব হেসেছিল।

আমি দেশে ফিরে আসার অনেক অনেকদিন পর প্রিন্সটন থেকে ওরা চিঠি লিখল যে ওরা বেড়াতে যাচ্ছে অনেকদিনের জন্যে অস্ট্রেলিয়াতে, যাবার পথে ইন্ডিয়া ঘুরে যেতে চায়—যদি বাঘ শিকার করিয়ে দিতে পারি তবেই আসবে নইলে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের মোলোকাই দ্বীপে ববি নেলসন-এর সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটিয়ে চলে যাবে অস্ট্রেলিয়া। ববিও আমারই মতো ব্যাচেলর এবং মোলোকাইয়ে ডোল মান্ডির মডেলের আনারসের ফার্ম করে দিন কাটাচ্ছিল। লিখেছিল, আসতে পারে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে। পুরনো দিনের মতো 'উই উইল বিট ইট আপ' কিন্তু বাঘ মারিয়ে দিতে হবে। ও ওর ফোর সিক্সটি ফাইভ ডাবল-ব্যারেল রাইফেল নিয়ে আসবে যা দিয়ে ও মুজ মেরেছিল।

উত্তরে আমি ফোন করে বললাম, বাঘ বাঁধা থাকে না। আফ্রিকান সিংহদের মতো অত সহজে তাদের দেখাও যায় না। মারবার কথা দেওয়া তো দূরস্থান দেখাবার কথা দেওয়াও মুশকিল। তবে দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করব খবর যখন এত আগে পেলাম। তবে বাঘ দেখতে পেলেই যে মারতে পারবেই এমন ধারণা নিয়ে এসো না। দেয়ার আর মেনি আ স্লিপস বিটউইন দ্য কাপ অ্যান্ড দ্য লিপ। বাঘ যে বাঘই। তাকে নিজে চোখে দেখলেই বুঝবে।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলল, যে ওরা আসবে। পরে, চিঠিতে বিস্তারিত সব জানাল। আসবে ডিসেম্বরের শেষে। অক্টোবরেই জঙ্গল খোলে। ওই সময়ে আন্ডারগ্রোথ খুব বেশি থাকে জঙ্গলে, জানোয়ার দেখতে অসুবিধে হয়, বিপজ্জনক জানোয়ার যদি এক গুলিতে না মরে তাহলে সে আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে ওই আন্ডারগ্রোথেরই জন্যে। কিন্তু এক গুলিতে মারা যাবে নাই বা কেন? 'আগেই নাই-চিন্তা করনের দরকারটা কী কও দেহি'? জ্যেঠুমনি যেমন বলতেন, আমিও তেমন করেই নিজেকে বললাম।

এবারে চলো মন রুদ-নিকেতনে।

ভটকাই বলল।

আর ধানাইপানাই করনের কাম নাই।

## চার

ওদের প্রোগ্রাম ফাইনালাইজ করে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি মুকুন্দবাবু, মানে মোহনের বাবাকে লিখলাম। মোহন তখনও ব্যবসার ভার নেয়নি। লিখলাম, বেতলার কেরকেটা এবং চিপাদোহরের তাঁদের মেট মুসলিমকে খবর দিতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমি এক সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে যাব—যে ফরেস্ট ব্লকে বাঘের পাকা খবর থাকবে সেই ব্লকের রিজার্ভেশন করে বাঘ মারার পারমিট আমার নামে বের করে সেই ব্লকেরই পুরো বাংলোর রিজার্ভেশন করে রাখতে। আর ফরেস্ট গার্ড এবং তাঁদের জঙ্গলের মেট মুন্সিদেরও বলে রাখতে বাঘের খোঁজখবর নিয়মিত রাখতে। সে কোথায় থাকে, তার 'রাহান-সাহান' কী? গোরুমোষ শিকার করে, নাকি জংলি জানোয়ার মেরেই খায়। প্রয়োজনে ডিসেম্বরের গোড়াতে আমি দিনদুয়েকের জন্যে চলে আসব বন্দোবস্ত পাকা করতে।

মুকুন্দবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি ফোন করে বললেন যে আমার আগে যাওয়ার দরকার নেই, আমার সাহেব বন্ধুর জন্যে তিনি বাঘকে জরুর তার সামনে হাজির করাবেন। এখন মারতে পারা না পারা তারই ভাগ্য অথবা বাঘের ভাগ্য।

দেশ স্বাধীন হবার পরে এবং বিশেষ করে জমিনদারি অ্যাবোলিশন অ্যাক্ট চালু হবার পরে অনেক রাজা-মহারাজারাই শিকারের কোম্পানি খুলে ফেলেছিলেন। বিদেশি শিকারিদের বাঘ মারবার জন্যে নিয়ে আসতেন—আফ্রিকাতে যা বহুদিন থেকেই চালু ছিল। শর্ত ছিল 'To produce a tiger within shootable distance'—ব্যাস তাহলেই পাঁচ-দশ হাজার ডলার দিতে হবে। অনেকের হাত ভাল ছিল না, অনেকেই বাঘ দেখে নিজেরাই কুপোকাত হতেন। তারপর সেই

বাঘকে নিজেদের মাইনে করা শিকারিদের দিয়ে মারিয়ে আরও পাঁচ-দশ হাজার ডলার নিতেন। বিদেশিরা দেশে ফিরে বলতেন তাঁদের মারা ট্রফি।

যাই হোক, জনি আর লিলিয়ান এলে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা জেঠুমনির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওঠালাম। জেঠুমনির বাড়ি আর গ্র্যান্ড হোটেলে খুব একটা তফাত ছিল না। তা ছাড়া তখন কলকাতাতে গ্র্যান্ড ছাড়া তেমন হোটেল ছিলই বা কোথায়? একদিন একরাত ওদের কলকাতা ঘুরিয়ে দেখিয়ে পরদিন রাঁচি এক্সপ্রেসে রাঁচি পৌঁছলাম। বি. এন. আর. থুড়ি এস. ই. আর. হোটেলে উঠে বাথরুম করে চান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওয়ানা হলাম পালামৌর দিকে। কিষুন ড্রাইভার এসেছিল গাড়ি নিয়ে। তখন সে ছেলেমানুষ। পরে সে মোহনের ব্যক্তিগত ড্রাইভার হয়েছিল এবং বহু বছর ধরে কার ও জিপে আমার ডিউটি করেছে। খুব ভাল হাত ছিল। ঠান্ডা মাথা, পাহাড়-জঙ্গলের পথে দিনে-রাতে আঠারো ঘণ্টা গাড়ি চালাতে দেখেছি আমি ওকে আর মুখে 'হুজৌর' ছাড়া কথা নেই। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিভাগের অধিকাংশ গাড়ির ড্রাইভারকে দেখে মনে হয় এখুনি কালাজ্বরে ভুগে উঠে আজই ডিউটিতে জয়েন করেছেন। ব্যবহারও তাঁদের বেশ রুক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়নগুলো তো কারওকে কাজটা ভাল করে করতে বলেনি শুধু মিটিং-মিছিল করে দাবি-দাওয়ার চিৎকার করতে শিখিয়েছে। অথচ বেসরকারি কাজ যারা করে তাদের মাইনে সরকারি কর্মচারিদের চেয়ে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যবহার একেবারেই অন্যরকম। এ কথা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি।

তারপর?

হ্যাঁ। কিষুনই বলল যে রুদ বাংলোতে বুকিং করা হয়েছে। সেখানে পৌঁছেই লাঞ্চ হবে। তবে পৌঁছতে পৌঁছতে চারটে বেজে যাবে। আপনারা যদি সাড়ে আটটার মধ্যে রাঁচি থেকে বেরোতে পারেন তো ভাল হয় তবে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।

ওদের তাই বলে দিলাম। ঠিক সাড়ে আটটাতেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। রাতুর রাজবাড়ি ডানদিকে রেখে বিজুপাড়া হয়ে কুরু হয়ে কুরু চাঁদোয়ার ঘাট হয়ে চাঁদোয়া টোড়ি লাতেহার হয়ে ডালটনগঞ্জের আগে সাত কিমিতে বাঁদিকে ঢুকে গেলাম বেতলার পথে। বেতলা পৌঁছে কেঁড় হয়ে মুণ্ডু হয়ে গাড়ু হয়ে আমরা রুদে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে তিনটে বাজে। পথে লাতেহারে দাঁড়িয়ে ওদের কালাজামুন আর নিমকি খাইয়েছিলাম ওদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও। ওরা বলল, স্টম্যাক আপসেট হবে। আমি বললাম, লাতেহারের এই পণ্ডিতের দোকানের কালাজামুন আর নিমকি না খেয়ে পালামৌতে কেউ বাঘ মারতে পারেনি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি খেয়েছিলেন?

ভটকাই বলল।

পালামৌ-এর লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো আর নিজে বাঘ মারেননি তাই হয়তো খাননি তা ছাড়া তাঁর সময়ে পণ্ডিতের এই দোকান আদৌ ছিল কিনা কে জানে!

যাই হোক, আমার কথাতে ভজে ওরা বাধ্য হয়ে গেল।

বিদেশিদের ধারণা ভারতবর্ষে জল আর খাবার খেলেই মৃত্যু অনিবার্য। কত রকমের ভুল ধারণাই যে চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। ভারতীয়দেরও কোনও চেষ্টা নেই এই ভুল ভাঙাবার।

বিদেশি কেন? এন আর আই ভারতীয়রাও তো তেমনই। ওঁদের হাব-ভাব দেখলে হাসি পায়।

বিকেলে একটা ঘুম দিয়ে উঠে মুসলিম, সুখরাম, আর তাহের আলির সঙ্গে বসলাম স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে। বেতলা থেকে কেরকেটাও এসেছিল ছুটি নিয়ে। স্ট্র্যাটেজি যা নেবার সে তো আমাকেই নিতে হবে। বাঘের ব্যাপারে এরা দুজনেই পুরো নভিস।

বাঘটা মদ্দা বাঘ। বেশ বড় বাঘ। গৃহপালিত গোরু মোষ একেবারে মারে না যে তা নয়। তবে বর্ষাকালেই বেশি মারে। তখন তো জঙ্গলের সব কাজ বন্ধ থাকে বলে আসাও বন্ধ থাকে বহিরাগতদের। নিরিবিলিতে শিকারি-রহিত হয়ে বাঘেদের ভোজ লাগাতেও সুবিধে হয়।

বাঘটার একটি ডেরা জঙ্গলের মধ্যের একটি গুহায়। নদীর ওপরে। সম্ভবত নদীতে জল-খেতে আসা বন্যজন্তুদের দেখতে পায় সে গুহা থেকে। বা গুহার বাইরের পাথরে বসে, তাই ওইখানে আস্তানা গেড়েছে।

মানুষও মারছে নাকি মাঝে মধ্যেই?

জন্তু বলতে?

তিতির বলল।

কী নেই তাই বল! হাতি, রুদের দিকে একটু কম আছে যদিও কিন্তু বাইসন বা ভারতীয় গাউর, বুনো মোষ, শম্বর, চিতল হরিণ, শুয়োর, বার্কিং ডিয়ার, শজারু, ভাল্লুক আরও কত জানোয়ার।

ভাল্লুক কি বাঘের খাদ্য?

না, খাদ্য তো নয়ই বরং মাঝে মাঝে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াইয়ে বাঘের প্রাণসংশয়ও হয়। আর শজারু যদিও খাদ্য কিন্তু খুব খিদে না পেলে শজারুকে ঘাঁটায় না বাঘ। শজারুর কাঁটা বাঘের গায়ে গলাতে বিঁধে গেলে গ্যাংগ্রিন হয়ে যায় এবং অনেক সময়ে তাতে বাঘ মারাও যায়। মারা যাক আর না যাক এই কাঁটার জন্যে, স্বাভাবিক খাদ্য যেসব জন্তু জানোয়ার তা ধরার ক্ষমতা থাকে না বলে অনেক সময়ে মানুষখেকোও হয়ে যায়। এই বাঘটাও তাই হয়েছিল কি না কে জানে!

আমি বললাম, বাইসনকেও ঘাঁটায় না বাঘ।

তা ঠিক। তবে বাচ্চার ওপরে লোভ আছে খুব। হাতির বাচ্চার ওপরেও।

তারপর?

তিতির বলল।

আমরা ঠিক করলাম পরদিন সকালে জঙ্গলে গিয়ে বাঘের যাতায়াতের পথ দেখতে হবে। পায়ের দাগও নিজের একবার দেখা দরকার। সেই গুহাটাতেও সরেজমিনে তদন্তে যাওয়া দরকার।

তারপর।

তারপর সাহেব-মেমসাহেব শীতে কাবু। পশ্চিমি দেশে সব জায়গাতে হিটিং থাকাতে শীত সহ্য করার ক্ষমতা তাদের অনেক কমে গেছে অথচ একদিন এদের পূর্বপুরুষেরাই ওই প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে কানাডা ও উত্তর আমেরিকাতে আস্তানা গেড়েছিল। এখন তারা অনেকেই আরাম আয়েসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

যাই হোক পরদিন ভোরে চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তবে লিলি আর জনি বাংলোর হাতাতে রোদে চেয়ার পেতে বসে থাকল। বাঘের খোঁজ করতে গিয়ে অত ভিড় বাড়াবার দরকার নেই তাই ওদের রেখে গেলাম।

বাংলো থেকে পাঁচশো গজ গিয়েই বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেল। কাল রাতের দাগ। তার মানে আমরা তাকে দেখার আগেই আমরা যখন ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে বার-কি-কিউ করছিলাম কচি শুয়োরের তখন বাঘ এসে আমাদের দেখে গেছে। পায়ের দাগ দেখেই বুঝলাম যে মদ্দা বাঘ এবং বেশ বড় বাঘ। এত বড় বাঘ দেখে আনাড়ি শিকারিদের অবস্থা কী হয় তাই চিন্তার।

ঘণ্টাখানেক চতুর্দিক ঘুরে আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে বাঘ বাংলোর ডানদিকের জঙ্গলেই আছে। তখন কেরকেটা বলল, দুপুরেই যদি হাঁকোয়া করা যায় তবে বাঘকে মারার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। কোনদিক দিয়ে হাঁকোয়া করা হবে এবং শিকারিদের ও স্টপারদের মাচা কোন কোন গাছে বাঁধা যেতে পারে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ফিরে এলাম ব্রেকফাস্টের আগেই রুদের বাংলোতে। সুখরাম, তাহের আলি এবং কেরকেটা গেল রুদ বস্তিতে হাঁকোয়াওয়ালা ঠিক করতে। সকাল সকাল গিয়ে তাদের ধরতে না পারলে সবাই জঙ্গলে বেরিয়ে যাবে কূপ কাটতে তাই ওদের তড়িঘড়ি পাঠিয়ে দিলাম। বেলা দশটা নাগাদ ওরা ফিরে এলে চৌকিদারকে বললাম ওদের নাস্তা দিতে। নাস্তা করে ফিরে এসে ওরা বলল আমরা এবারে যাই মাচা বাঁধতে। ঠিক হল দুপুরের খাওয়ার পরে বানারীর পথে যে মস্ত শিমূল গাছটা আছে পথের বাঁপাশে সেখানে আমরা জিপ নিয়ে যাব। সেখান থেকে মাচাতে নিয়ে যাবে ওরা। কেরকেটা থাকবে বিটার বা হাঁকাওয়ালাদের সঙ্গে আর তাহের আলি আর সুখরাম থাকবে স্টপারদের মাচাতে। অভিজ্ঞ স্টপার না হলে বাঘ এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে চলেও যেতে পারে শিকারিদের মাচার দিকে না এসে। হাঁকা করাও যেমন একটি বিশেষ কাজ তেমনি বাঘকে ঠিক পথে চালিত করাও বিশেষ কাজ। জোরে

আওয়াজ করলে বাঘ ভয় পেয়ে যেতে পারে এবং তা করলে বিটারদের মধ্যে কারও কারও বাঘের হাতে জখম অথবা নিহত হবারও আশঙ্কা থাকে। ঠিক করলাম ওদের এক মাচাতে চড়িয়ে দিয়ে আমি কাছাকাছি কোনও গাছে থাকব অবস্থা সামাল দেবার জন্যে।

তারপর?

দুপুর একটাতে লাঞ্চ সেরে আমরা জিপ নিয়ে সেই শিমূল গাছের নীচে গিয়ে পৌঁছলাম। কেরকেটা হাঁকাওয়ালাদের নিয়ে গুহাটার দিকে চলে গেছিল আগেই। গুহার পেছন থেকে হাঁকা করে গুহা থেকে বাঘকে বার করে শিকারিদের মাচার দিকে তাড়িয়ে আনবে ওরা। তাহের আলি তার লালরঙা সোয়েটারটা নাড়াবে একটা টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আর তাই দেখেই হাঁকোয়া শুরু করাবে কেরকেটা।

জনি ম্যাকগাওয়েনের হেভি রাইফেল তো ছিলই। আমার চার্চিল শটগানটি—ডাবল ব্যারেল, ত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের, লিলিকে দিলাম। কী করে গুলি ভরতে হয় তা শিখিয়ে দুটি অ্যালফাম্যাক্সের এল. জি. ওকে দিয়ে ফিসফিস করে বললাম যে মাচাতে উঠে গুলি ভরবে। সেফটি ক্যাচও দেখিয়ে দিলাম। বুড়ো আঙুল দিয়ে সামনে ঠেললেই বন্দুক আনসেফ হয়ে যাবে তখন ট্রিগার টানলেই গুলি বেরোবে। জনি দেখলাম আমার মাতব্বরি বিশেষ পছন্দ করছে না। সে তিনটি গুলি ম্যাগাজিনে দিয়ে চেম্বারে একটি দিয়ে রাইফেল সেফ করে নিল।

কেরকেটা খুবই অভিজ্ঞ। সাহেব-মেমসাহেব যে আমাদের মতো পা মুড়ে বসতে পারবে না তা জেনেই ওদের মাচার ওপরে দুটো বাঁশের মোড়াও ওরা পেতে দিয়েছিল। গাছের ডাল কেটে যে সিঁড়ি বানানো হয়েছিল তা দিয়ে ওরা ওপরে উঠে যেতেই সিঁড়িটাকে বয়ে নিয়ে আমরা দূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। আমি পাশের একটি কেঁদ গাছে উঠে যাওয়ার পরই তাহের আলি সোয়েটার নাড়িয়ে হাঁকোয়া শুরু করার নির্দেশ দেবার জন্যে চলে গেল। সেই নির্দেশ দিয়েই সে তার গাছে চড়ে পড়বে। স্টপারদের বা আমার কোনও মাচা ছিল না।

ওদের দেখে মনে হল জনি আর লিলি বেশ আরামেই বসেছে। তখন সূর্য মাথার ওপরে তাই তাদের টুপি দুটো খুলে তারা পেছনে রাখল। বলেছিলাম মাচাতে বসে নড়াচড়া বা কোনও শব্দ করবে না। বাঘ এলে তাকে কাছে আসতে দেবে এবং পঁচিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে এসে গেলে তবেই গুলি করবে। এবং গুলি করবে বুক, ঘাড় বা মাথাতে নিশানা নিয়ে। ভুলক্রমে যেন পেট বা পেটের নীচে গুলি না লাগে। ওরা মাথা নেড়ে বুঝেছে বলল।

নিজে শিকার করা আদৌ কঠিন নয় কিন্তু কোনও শুট-এ যদি কোনও অতিথিকে দিয়ে বাঘ মারাতে হয় তখন তা বিশেষ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত অতিথির নিশানা বা স্নায়ুর ওপরে নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। দ্বিতীয়ত বাঘকে যদি জায়গামতো গুলি করে ধরাশায়ী না করতে পারে তবে সেই বাঘের বিস্তর বেগ দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। আহত বাঘকে ছেড়ে চলে যাওয়া

কাপুরুষের লক্ষণ তো বটেই বাঘের যন্ত্রণা শেষ করাটাও বড় কর্তব্য। গুলি যে জায়গাতেই লাগুক যন্ত্রণা তো হবেই। তা ছাড়া রাইফেলের গুলি শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় যেহেতু, সেহেতু রক্তক্ষরণও প্রচুর হয়। এল. জি. বা বল, মানে বন্দুক দিয়ে মারলে এফোঁড় ওফোড় করার ক্ষমতা থাকে না সে গুলির, তাই বন্দুক দিয়ে মারা আহত বাঘকে খুঁজে বের করে শেষ না করতে পারলে সে বাঘের মানুষখেকো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এ বাঘ তো মানুষখেকোই।

এই সময়ে অভিজ্ঞ শিকারিরও প্রচণ্ড উত্তেজনা হয় আর নতুন শিকারিদের তো কথাই নাই।

হাঁকোয়া শুরু হয়ে গেল। মাদল, ধামসা ও শিঙের আওয়াজ এবং উঁচুগ্রামে বেচারি বাঘ এবং তার অদৃশ্য মা-বাবার প্রতি প্রচুর অশ্লীল গালগাল করতে করতে হাঁকোয়াওয়ালারা শিকারিদের রক্ত জল করে এগিয়ে আসতে লাগল। নানা পাখি, মুরগি, ময়ূর, তিতির, বটের আসকল এসব ভয় পেয়ে উড়ে আসতে লাগল। একটি কোটরা হরিণ বা বার্কিং ডিয়ার দৌড়ে গেল মাচার প্রায় সামনে দিয়েই। জনি রাইফেল ওঠাচ্ছিল, লিলি দেখলাম তার হাত চেপে ধরে বারণ করল। আমার পূর্ণ নিষেধ ছিল। বলেছিলাম বাঘ শিকারে এসে অন্য কোনও জানোয়ারকেই গুলি করা চলবে না। গুলি করলে বাঘ সেই গুলির শব্দেই সাবধান হয়ে বিটারস লাইন ভেঙে দু-চারজনকে জখম করে বেরিয়ে যাবে তা হলে অথবা স্টপারদের নিষেধ না শুনে হাঁকোয়ার পথের ডানদিকে বাঁদিকে বেরিয়ে যাবে।

হাঁকোয়াওয়ালারা যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই উত্তেজনাও বাড়তে লাগল। একটা মস্ত ভাল্লুক হন্তদন্ত হয়ে চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। জনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে শিকার করেছিল। সিংহও নাকি মেরেছিল একটা কিন্তু আফ্রিকাতে শিকার করা এবং সিংহ মারা আর ভারতে বাঘ মারা এক ব্যাপার নয়। এ কথা তোরাও জানিস আফ্রিকাতে গিয়ে নিজ চোখে সেখানকার বনজঙ্গল ও জানোয়ারদের দেখেছিস বলেই জানবি। ভারতের জঙ্গলের সৌন্দর্য ও ভয়াবহতাই আলাদা। অবশ্য পশ্চিম আফ্রিকার জঙ্গলও তাই কিন্তু পুব বা দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গল সেরকম নয়।

নিশ্চয়ই! বললাম আমরা সমস্বরে।

ভটকাই বলল, টেনশন এখন প্রচণ্ড, এখন অন্য প্রসঙ্গ এনো না। তারপরে কী হল বলো?

একদল মেয়ে শম্বর, যে দলে একটিও শিঙাল ছিল না, দুদ্দাড় করে তাদের খুরে খুরে মেদিনী কাঁপিয়ে চলে গেল। বিটাররা প্রায় এসে গেছে। সচরাচর বাঘ বা চিতা কিন্তু বিটারদের পায়ে পায়ে আসে। অনেক সময়ে আবার ছুলোয়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আসে—সেসব ক্ষেত্রে ধূর্ত বাঘ হাঁকোয়া বা ছুলোয়া যে হবে তার অনুমান আগেভাগেই করে নিতে পারে। প্রথম শব্দ শোনার পরই দ্রুতগতিতে বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে তারা পালাতে চায়। এই পূর্ণবয়স্ক বাঘ এর আগে

অনেকবার হাঁকোয়ার সম্মুখীন হয়েছে এবং হয়েও যে এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে তার মানে হাঁকোয়ার হাল-হকিকৎ সে ভালমতোই জানে।

এখন উত্তেজনা তুঙ্গে। এমন সময়ে ওই হো। বাঘোয়া যা রহা হ্যায় হো—বহুত বড়া বাঘ।

এসব কথার মানে তো জনি আর লিলি বুঝতে পারছিল না। তাতে ওদের উত্তেজনা আরও বেশি হচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল প্রকাণ্ড বাঘটি আসছে। গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে শীতের শেষ দুপুরের সূর্যের আলোর মধ্যে দিয়ে ফ্রিস্টাইলে সাঁতার কাটার মতো করে বাঘ এগিয়ে আসছে সোজা ওদের মাচার দিকেই। মাঝে তিন-চারবার স্টপারদের ঠক ঠক করে গাছের সঙ্গে কুড়ুলের বাড়ির শব্দ পেয়েছিলাম।

বাঘটা যেন বিজ্ঞাপনের মডেল। ক্যাটওয়াক করে এসে, যেন পোজ দিয়ে দাঁড়াল মাচার সামনে। যেন না-বলে বলল, আমি এসেছি।

I have finally arrived.

তারপর?

তারপর আর কী?

জনি ওয়েসম্যুলারের মতো চেহারার জনি ম্যাকগাওয়েন বলল, ওহ মাই গড।

তারপর?

তারপর বাঘ মাচার দিকে মুখ তুলে চাইল কে তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে বিজাতীয় ভাষায় কথা বলছে দেখার জন্যে।

জনির রাইফেল কিন্তু তার কোলের ওপরেই রয়ে গেল, যেমন ছিল, তাতে হাত পর্যন্ত লাগাল না সে।

তারপর?

তারপর লিলি বন্দুকটা তুলে দড়াম করে দেগে দিল। গুলিটা কোথায় লাগল বুঝলাম না। একটু পরে বুঝেছিলাম লেজে। লেজে গুলি লাগতেই বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে এক লাফ মারল ওদের দিকে কিন্তু ধরতে না পেরে মাটিতে পড়েই আরেক লাফে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর আর কী? মঞ্চে শ্মশানের নীরবতা কিন্তু আমাদের সামনে তো তখন ইংরেজিতে যাকে বলে Hell broke loose সেই অবস্থা।

কেরকেটা এসে দাঁড়াল আলোকিত রঙ্গমঞ্চে।

বলল কেয়া হুয়া?

আমার কিশোর কুমারের গানটা মনে পড়ে গেল: কেয়া হুয়া? ক্যায়সে হুয়া?

লিলির দিকে তাকালাম।

সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আই অ্যাম সরি। ভেরি ভেরি সরি ঋজু। বাট লুক অ্যাট জনি।

জনির অবস্থা শোচনীয়। বাকরুদ্ধ। সেই বেতালের গল্পে ভাল্লুকের থাপ্পড় খাওয়া মানুষের মতো অবস্থা তার। সে নামতেও পারছে না।

লিলি বল, ঋজু, গো টু দ্য বাংলো অ্যান্ড ব্রিং অ্যানাদার ট্রাউজার ফর হিম প্লিজ।

আমি সকলকে বলে ভিড় কাটাবার কথা বললাম। রইল শুধু তাহের আলি আমার সঙ্গে। ওকে সেখানে রেখে জিপ চালিয়ে রুদ বাংলোতে এসে জনির একটি ট্রাউজার এবং জলের বোতল এবং টয়লেট পেপারের একটা বাক্স নিয়ে ফিরে গেলাম।

আমরা হো-হো করে হাসতে লাগলাম।

ঋজুদা বলল, তোরা হাসছিস! বেচারা জনির অবস্থাটা ভাব একবার।

আমি বললাম, তুমি গুলি করলে না কেন?

কেন যে করলাম না তা আজও ভাবি।

কেন করলে না?

তিতির বলল।

এ নয় যে আমি মস্ত বীরপুরুষ এবং একটুও ভয় পাইনি। ভয় অবশ্যই পেয়েছিলাম। বড় বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা তো জীবনে কম করিনি কিন্তু অমন হুংকার কখনও শুনিনি। আমি যদি মানুষ না হয়ে বাঁদর হতাম তাহলে সেই হুংকারেই গাছের ডাল থেকে হাত ফসকে নীচে পড়ে যেতাম।

কেন? তোমার বন্ধু জনিও তো সহজেই পড়তে পারত। বড় কম্মোটি করে ফেলতেই বোধ হয় চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গিয়ে থাকবে।

প্রথমত, গুলি করিনি বাঘটা ওদের দিয়ে মারাব বলেই এ যাত্রাতে আসা। ওরা কত দূর দেশ থেকে এসেছে এবং দূর দেশে চলেও যাবে। জীবনে বাঘ মারার সুযোগ ওদের হয়তো আর কখনওই আসবে না। আমি মারলে তো সে বাঘ ওদের হত না। কোনও ভাল স্পোর্টসম্যানই অন্যের মারা ট্রফিকে নিজের বলে চালান না। তাই গুলি করিনি।

দ্বিতীয়ত আমি বুঝতেই পারিনি যে লিলি মার তো মার বাঘের লেজে গুলি করেছে। আমি ভেবেছিলাম গুলি লাগেইনি।

তারপর বলল, আমি মারলেও বাঘ যখন ব্রড সাইড টার্গেট হয়ে দুপুরের রোদে রাজার মতো দাঁড়াল ওকে তখনই মারতে পারতাম। যখন লাফাল তখন তাকে শূন্যেই মারতে পারতাম। তারপর যখন মাটিতে পড়েই অন্তর্হিত হল তখনও তার আগেও মারতে পারতাম। কিন্তু বললাম না, বাঘ আমার মারলে চলত না তাই মারিনি।

তারপর?

ইতিমধ্যে গিরিধারী বড় এক প্লেট গরম গরম পেঁয়াজি নিয়ে এসে বলল, জুম্মান বাবুর্চি পাঠাল ঝাল নুন সব ঠিক আছে কিনা চেখে দেখতে।

হাতে হাতে উঃ উঃ করতে করতেও পেঁয়াজিগুলো আমরা তুলে নিলাম। গরম পেঁয়াজি মুখেই ভটকাই বলল, তোমার কী রাইফেল ছিল?

আমার হাতে আমার প্রিয় থ্রি সিক্সটি-সিক্স রাইফেলটা ছিল। ম্যানলিকার শুনার। ও রাইফেল দিয়ে আমি জীবনে একটি গুলিও মিস করিনি। জেঠুমনি অস্ট্রিয়া থেকে ইমপোর্ট করিয়ে ছিলেন। যেমন ব্যালান্স, তেমন মার। অ্যাকুরেট টু দ্য পাওয়ার এন। গুলি করলে বাঘ ওইখানেই থাকত।

কিন্তু তাহলে তো রুদ-এর বাঘের গল্প হত না। বাঘ এল, মারলে, আর পড়ে গেল এমন শিকারের গল্প আমরা কেউই শুনতে চাই না।

তিতির বলল।

তোরা না শুনতে চাইলেও জনি ম্যাকগাওয়েন শুনতে অবশ্যই চাইত। ওর অপকম্মোর ব্যাপারটা আমি কেরকেটা, তাহের আলি আর সুখরাম ছাড়া আর কেউই জানল না যদিও কিন্তু বেচারি জনি। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি না ওই কম্মোজনিত লজ্জার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেয়েছিল ও বাঘের দর্শনে ও গর্জনে। ভূতে পাওয়ার মতো কেবলই মাথা নাড়ে দুদিকে আর বলে, নো কমপ্যারিজন উইথ আ লায়ন। আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যানিম্যাল। লেটস গেট ব্যাক টু ক্যাল।

কলকাতা ফিরব কী করে! লেজে হোক আর যেখানে হোক বাঘের গায়ে গুলি তো লেগেছে। আহত বাঘ, তাকে ছেড়ে চলে গেলে পুরো পালামৌতে টি-টি পড়ে যাবে। আমার ভবিষ্যতে আসার কোনও মুখই থাকবে না। তা ছাড়া মুকুন্দবাবুই বা কী বলবেন। বনবিভাগের সব হোমরাচোমরার সঙ্গে ওঁর অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক। তাঁর মুখেও চুনকালি পড়ে যাবে।

তারপর?

সন্ধের আগেই কেরকেটা, সুখরাম আর তাহের আলি ফিরে এল। আগুনের সামনে বসে আমরা আবার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়লাম। জনি আর লিলি ঘরেই থাকল ফায়ারপ্লেস-এর সামনে। হুইস্কির বোতল খুলে জনি প্রায় আগুনের মধ্যে পা দুটো সেঁধিয়ে দিয়ে এই বাঘের স্মৃতি ভোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে স্মৃতি তো ভোলার নয়। বড় বাঘের সঙ্গে যাদেরই মোকাবিলা হয়েছে সেই মোকাবিলার স্মৃতি আজীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। কখনও স্বপ্নে কখনও খোলা চোখেই একা থাকলে বা ওই জঙ্গলে আবার গেলে সেই স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হবে।

আমরা চারজনে আলোচনা করছিলাম গুলিটা, মানে এল. জি.-র দানা বাঘের লেজের আগায় লেগেছে না গোড়ায়। গোড়াতে লাগলে ব্যথা বেশি হবে এবং বাঘের মলত্যাগ করতেও অসুবিধা হতে পারে। তখন কথা হল বাঘের সঙ্গে মোলাকাত আবার কীভাবে করা যায়। হাঁকাতে সে আর বাইরে আসবে না। বিটারস বা হাঁকোয়ালাদের মেরে বেরিয়ে যাবে লাইন ক্রস করে।

কেরকেটা বলল, একটা নধর কিন্তু ছোট মোষ বেঁধে দেওয়া যাক আজই।

বাঘকে তো খেতে হবে। লেজের যন্ত্রণা নিয়ে তার পক্ষে বন্যপ্রাণী ধরে খাওয়া মুশকিল হবে কয়েকদিন। হয়তো মানুষ মারাও।

সুখরাম বলল, বেকারকা বাত। উ বাঘোয়া আভি নজদিকমে থোড়াই রহবে করে গা। বহুত দূর চল দিয়া হোগা ও। ফিন পাত্তা লাগানা পড়েগা উ হায় কাঁহা। পাতা লাগনেসে প্যায়দল যাকে উসকো পালসা শিকারমে মারনা হোগা।

তাহের আলি বলল, দো রোজ দিখা যায়।

চারদিকের বস্তির লোকদের বলে দিতে হবে বাঘের টাটকা পায়ের দাগ দেখলেই যেন আমাকে নইলে ওদের খবর দেয়। কেরকেটা বলল, অন্য ফরেস্ট গার্ডদেরও বলে দেবে ঘটনার কথা। কানকাটা বাঘের খোঁজ রাখবে তারা।

তিতির বলল, কানকাটা কেন?

ঋজুদা বলল, আমিও সেই প্রশ্নই করলাম তাহের আলিকে।

সে বলল, বাঘটার বাঁ কানটা ছেঁড়া আছে। হয় শিশুকালে নয় বড় হবার পর অন্য বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তার কান কাটা গেছে। কাটা মানে পুরো কাটা না। কানটা ছিঁড়ে গেছে। অথবা কোনও শিকারির বাঘের মাথা লক্ষ্য করে করা গুলি মাথা মিস করে তার কানের মধ্যে দিয়ে চলে গেছিল হয়তো। এ জঙ্গলে বাঘটা এসেছে বছর তিনেক হল। যারা তাকে দেখেছে সেই সব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ীই বলল তাহের ও কথা। তা ছাড়া হরিণের সেনসাস যখন হয় তখন বছর দুয়েক আগে বাঘটাকে কেউ কাছ থেকে দেখেছিল। কেউ দেখেছে যে বাঘের বাঁ কানটা ঝুলে আছে।

তারপর?

তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে দুদিন দেখাই যাক। আমাদের হাতে আরও পাঁচদিন সময় আছে। ষষ্ঠ দিনে লাঞ্চের পরই রওনা দিতে হবে রাঁচির দিকে, রাঁচি থেকে রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরার জন্যে। তখন রাস্তাঘাট এত ভাল ছিল না। অনেক সময় লাগত রাঁচি পৌঁছতে। রাঁচি এক্সপ্রেস তখন রাঁচি থেকেই ছাড়ত। হাটিয়া থেকে আসত না ট্রেন। হেভি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারখানার পত্তন যদিও হয়ে গেছে ট্রেন হাটিয়া থেকে ছাড়ত না।

তারপর?

আমাদের পারমিটে একটি ভাল্লুক, একটি শম্বর, একটি স্পটেড ডিয়ার এবং যত খুশি শুয়োর মারার ছাড়পত্র ছিল। কিন্তু বাঘের একটা হিল্লে না করা পর্যন্ত অন্য কিছু শিকারের ইচ্ছে এবং উপায়ও ছিল না। লিলির গুলিতে শব্দ তো হয়েইছে আবারও রাইফেল বন্দুকের আওয়াজ শুনলে বাঘ যদি এ তল্লাটে থাকেও তাহলে সে বহুদূরে চলে যাবে।

ঋজুদা বলল, যা ঘটল তার পরে জনি ও লিলিও আর শিকারের কথা মুখেও আনবে না মনে হয়।

রাতেরবেলা যখন জুম্মান ডিনার সার্ভ করল তখন জনি প্রায় ড্রাঙ্ক হয়ে গেছে।

কেবলই বলছে হোয়াট আ শেম। হোয়াট আ শেম।

আমি বললাম, এরকম অনেকেরই হয় তোমার বিশেষ লজ্জিত হবার কারণ নেই।

তারপরই বলল, তোদের কি কন্টিপেটাংয়ের গল্পটা বলেছি?

কন্টিপেটাং? সেটা আবার কী জিনিস?

আমি বললাম।

সে হাজারিবাগের সীতাগড়ার মানুষখেকোর গল্প। কখনও বলা যাবে।

কখনও নয়, আজ রাতেই বলতে হবে।

ভটকাইও বলল, হ্যাঁ আমরা আজ রাতেই শুনব।

ঋজুদা বলল, দেখা যাবে, রাত তো হোক।

আর ভূতের গল্প দুটো?

আমি বললাম।

তিতির বলল হ্যাঁ সে দুটো তো শুনতে হবেই তবে সে দুটো কালকের রাতের জন্যে তোলা থাক।

তাহলে কানকাটার গল্প কখন শোনা যাবে?

আমি বললাম।

হবে রে হবে। সব হবে। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না আর আমরা তো শিকারে আসিনি—গল্প করেই সময় কাটবে। সময়ের অভাব কোথায়।

ভটকাই বলল, হ্যাঁ। গল্প আর ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া।

বলেই বলল, আজ রাতের মেনু কী হবে?

ঋজুদা বলল, জুম্মান বলেছে আজ রাতে সে ছাতুর লিট্টি বানাবে সঙ্গে আচার আর মুরগির কাবাব।

ফাইন। জমে যাবে।

ভটকাই বলল।

লছমন বলে পাঠাল আধঘণ্টার মধ্যে খিচুড়ি হয়ে যাবে। গরম গরম খেয়ে নিলে আর গরম করার ঝামেলা থাকবে না।

ঋজুদা বলল, আমাদের ডাকলেই আমরা চলে যাব। কালো কালো পাথরের ওপরে বসে গরম গরম সার্ভ করা খাবার রোদে পিঠ দিয়ে বসে খাব। গল্প না-হয় মুলতুবি থাকবে রাতের জন্যে। ডিসেম্বরের দিন। আকাশও মেঘলা করে এসেছে। ঋজুদার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি করে সেই ডিসেম্বর শেষের বৃষ্টিটা এবারে আসছে মনে হয়। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়াও বইবে কনকনে।

রুদ-এর বাংলোতে ফিরে আমরা ঋজুদাকে ধরে বসলাম যে আগে কন্টিপেটাংয়ের গল্পটা আমরা শুনতে চাই।

বিকেলে সকলে মিলে হেঁটে এলাম কিছুটা। তারপর সন্ধে নামলে ঋজুদাকে ঘিরে ক্যাম্পফায়ারের সামনে গোল হয়ে বসে আমরা বললাম, এবারে কন্টিপেটাং। বৃষ্টি এখনও নামেনি তবে মনে হচ্ছে রাতেই নামবে। চৌকিদার এসে আগুনে নতুন কাঠ দিয়ে আগুনটাকে জোর করে দিয়ে গেল।

মোহনদা একবার ঘুরে গেল বাবলু আর রমেনদাকে নিয়ে। প্রতি সন্ধেতে, সে ডালটনগঞ্জে থাকলে চিপাদোহরে আসে ব্যবসার কাজে। যেখানে তার ট্রাকের গারাজ এবং কারখানা আছে। মুসলিম এই ডিপোর ইনচার্জ। চিপাদোহর থেকে ডালটনগঞ্জ আঠারো মাইল। আর মারুমার বেশ দূরে।

মোহনদা এসে বলল, কোনও রকম অসুবিধে হচ্ছে না তো ঋজুদা?

ঋজুদা বলল, তুমি আবার এতদূর এলে কেন? বৃষ্টি নামবে যে কোনও সময়ে।

দেখে গেলাম। না এলে আমার চাকরিটাই তো যাবে। তবে এক কাপ করে চা খেয়েই রওনা দেব কারণ আজ শান্টুর ছেলে রনির জন্মদিন। শান্টু মোহনদার মাসতুতো ভাই। এখন হুলুক পাহাড়ের কাজের জিম্মাতে আছে।

মোহনদারা যেতে যেতে অন্ধকারও হয়ে গেল। আমরা বললাম, এবারে শুরু করো।

ঋজুদা পাইপটা ভাল করে ধরিয়ে নিয়ে বলল, এ পঞ্চাশের দশকের গল্প। আমি তখন একেবারেই ছেলেমানুষ। কলেজে পড়ি। হাজারিবাগের সুব্রত এবং গোপালও তাই। আমি আর গোপাল হাজারিবাগে গেছি। বর্ষাকাল। খবর পেলাম সীতাগড় পাহাড়ে একটি মস্ত বড় বাঘ ম্যানইটার হয়েছে। মানুষ তো মারছেই তার ওপরে পাহাড়ে যে পিঁজরাপোল আছে তার গোরু-মোষও মারছে যথেষ্ট।

গোপাল মানে, তোমার বন্ধু গোপাল সেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ। আর অন্য কোনও গোপালকে চিনি না আমি। গোপালদের গয়া রোডের পূর্বাচল বাড়িতে আছি। চমন রান্না-বান্না করে। রান্না মানে আমরা যা তিতির মুরগি খরগোশ মারি তাই রান্না করে। দুজনেই ছাত্র। আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। শিকার হলে মাংস নয়তো এবেলা খিচুড়ি ওবেলা খিচুড়ি। তাই অমৃত। তখন সদ্য যৌবন—ভাললাগার ক্ষমতা—একটুতে হেসে গড়ানো—এখন যেমন তোদের। সেসব দিনের কথা মনে হলে মন বড় বিধুর হয়ে যায়। সুব্রত চ্যাটার্জির সঙ্গে আমরাই যেচে আলাপ করি। সেবারেই। ওর বাবা তখন হাজারিবাগের পুলিশ সাহেব। ওর সঙ্গে আলাপ করলে যদি জিপ-টিপ-এর সুবিধা হয় এই ছিল উদ্দেশ্য। তা হয়নি কিন্তু সমবয়সি সুব্রত ও তার ছোট ভাই মুকুলের সঙ্গ

পেয়েছিলাম। কত যে শিকার আমরা করেছি একসঙ্গে সেই সব বেহিসেবি বিপজ্জনক দিনে তা আজ মনে হলে রোমাঞ্চ হয়।

সুব্রত এবং গোপাল আজ কেউই নেই তাই ওদের স্মৃতিমাখা গল্প করতে বসলে মনে হয় ওদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করছি।

বলেই ঋজুদা চুপ করে গেল।

বুঝলাম, মন ভারাক্রান্ত। আমরাও চুপ করে রইলাম ঋজুদা নিজে না যতক্ষণ কথা শুরু করে।

পাইপটা পরিষ্কার করে ঋজুদা বলল, সুব্রত চলে গেল তার বাবার সঙ্গে কোডারমাতে। তখন হাজারিবাগ মস্ত বড় জেলা ছিল। গিরিডি, কোডারমা, চাতরা এসব আলাদা জেলা হয়নি। তাই আমি আর গোপাল নাজিম সাহেব—মহম্মদ নাজিম—আমাদের হাজারিবাগের শিকারের গুরুর সঙ্গে সাইকেল রিকশা করে পাঁচ-ছ মাইল গিয়ে বন্দুক কাঁধে পায়ে হেঁটে সীতাগড় পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছলাম বাঘের খোঁজে। কপাল ভাল। পথের পাশেই একটি নালাতে বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। অতবড় বাঘের পায়ের দাগ তার আগে বা পরেও কখনও দেখিনি। সেই বাঘের চামড়া এখনও সুব্রতর বাড়িতে আছে—দশ ফিট ছ ইঞ্চি লম্বা—বিটউইন দ্য পেগস।

ভটকাই বলল, আরেকটা মাপ কী যেন হয় বাঘের?

আমি বললাম, ওভার দ্য কার্ভস।

ঋজুদা বলল, বিটউইন দ্য পেগস মানে বাঘের লেজ আর নাকের সামনে খোঁটা পুঁতে সেই দুই খোঁটার মধ্যের দুরত্ব। আর ওভার দ্য কার্ভস হচ্ছে বাঘের গায়ের ওপর দিয়ে মেজারিং টেপ শুইয়ে নিয়ে লেজ অবধি পৌঁছে তার দুরত্ব মাপা। বলা বাহুল্য, ওভার দ্য কার্ভস মাপলে বিটউইন দ্য পেগস-এর চেয়ে বেশি হয়।

তিতির বলল, গল্পে ফেরো ঋজুকাকা।

হ্যাঁ। বাঘের পায়ের দাগ যে নালাতে দেখেছিলাম সে নালাটি থেকে উঠে পথ পেরিয়ে বাঘ চলে গেছিল সীতাগড়া পাহাড়ের গায়ে। এই যাতায়াতের পথেই একটি ঝাঁকড়া আমগাছ দেখে আমরা ঠিক করলাম বিকেলে এসে ওই গাছে মাচা বেঁধে বসব।

একটু থেমে বলল, তখন আমাদের কারওরই রাইফেল ছিল না। বন্দুকই ভরসা।

নাজিম সাহেব বললেন, চলুন একবার সীতাগড়া গ্রামে যাওয়া যাক। মাচা বাঁধার বন্দোবস্ত করে একটি মোষও বাঁধার বন্দোবস্ত করে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে হাজারিবাগ যাতে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে এখানে আবার ফিরে আসতে পারি। বর্ষাকাল। সূর্য ডুববে সাড়ে ছটা নাগাদ। দু ঘণ্টা সময় থাকবে হাতে—গোছগাছ করে নিয়ে মাচায় বসার জন্যে।

তার আগের দিন গোপালের তিন-চারজন বন্ধু কলকাতা থেকে একটি সিঁএয় গাড়িতে করে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন নতুন বন্দুক কিনেছে। সে হাজারিবাগে বাঘ মারতে এসেছে যদিও বকও মারেনি তার আগে। তাদের মিথ্যে কথা বলে, আমাদের বন্দুক ভেঙে বাজারের থলেতে ঢুকিয়ে সাইকেল রিকশা করে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাছারির মোড়ে নাজিম সাহেবের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সীতাগড়া যাই।

আমরা যখন সেই নালা থেকে উঠে লালমাটির বড় রাস্তাতে উঠেছি সীতাগড়া গ্রামে যাব বলে, সেই সময়ে সেই সিঁএয় গাড়ি সেখানে এসে হাজির। গোপালের ভাষায় 'চারগাছা' শিকারি সমেত।

যার গাড়ি ও বন্দুক সে গাড়ি থেকে নেমেই বলল, আমাদের বাদ দিয়েই বাঘ মারবে। চালাকি পেয়েছ? চমনলালকে জেরা করে আমরা সব জেনে নিয়েছি। আমাদেরও সঙ্গে রাখতে হবে।

নাজিম সাহেব বললেন, আপলোগ সামনা যাকে সীতাগড়া গাঁওমে ইন্তেজার কিজিয়ে হামলোঁগ সব আভ্‌ভি আতা হ্যায়। তব বাতচিত হোগা।

কী ভেবে, ওরা গাড়িতে চড়ে চলে গেল।

তারপর ঋজুদা বলল, ওই পয়েন্ট থেকে আমরা কাট-অফ্‌ফ হয়ে যাচ্ছি। এরপরে কন্টিপেটাংয়ের গল্পটা শোন।

তারা গিয়ে গ্রামের সামনের মস্ত পিপ্পলগাছের নীচে গাড়ি দাঁড় করাল। বুড়ো মাহাতো এসে তাদের ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার ঘটি থেকে জল আর গুড় খাওয়াল।

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, হুজৌররা কেন এসেছেন?

মুখ্য শিকারি বলল, বাঘ মারনেকে লিয়ে। হিঁয়াপর হ্যায় বাঘ?

বাঘ?

বলল, বুড়ো মাহাতো। তারপর বলল, বাঘোয়া যো হ্যায় উ দিখকর আপলোগোঁকো দিমাগ খরাব হো যায়গা। ইতনা বড়া উঁচা। বলে ডান হাত দিয়ে নিজের বুক দেখাল।

তারপর বলল, মগর সাব আপলোগ পইলে বাঘোয়া মারা ক্যেয়া?

মুখ্য শিকারি বলল, বহুত মারা। সুন্দরবন তো কলকাত্তা কি নজদিকমেই হ্যায় না। বহত বাঘ মারা।

বুড়ো বলল, তব তো আচ্ছাই হ্যায়। মগর আপ কি কন্টিপেটাং হ্যায় ক্যা?

কন্টিপেটাং? উও কোন চিজ?

বাঁতাউ আপকো?

জরুর জরুর। বাতাইয়ে।

দেখিয়ে হুজৌর, কলকাত্তাসে এক ভারী শিকারি আয়া হুয়া থা। নাম থা চুনিবাবু। বহত ভারী শিকারি। সুন্দরবনমে বহত বাঘোয়া মারকর আয়া।

তারপর?

উসবাদ বহত সারা তাম্বু লগ গ্যয়া। বহত মেহমান ভি থে। নাচনা-গানা ফালানা ঢামকানা। তো বাঘোয়া মারনেকি লিয়ে বহত বড়া নরপাঠ্ঠা কাঁড়া ভি বন্ধা গিয়া ঔর উসকি ওপর মাচান।

কাঁড়াটা কী জিনিস?

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, কাঁড়া আর ভইষা মানে, পুরুষ মোষ আর মেয়ে মোষ আমাদের যেমন বলদ আর গোরু, বুঝেছিস?

ভটকাই ইয়ার্কি মেরে বলল, হ্যাঁ জি। অব সমঝা।

তারপর?

তিতির বলল, এই ভটকাইটা মিছিমিছি ডিসট্রাক্ট করে দেয় গল্পটাকে। বলো ঋজুকাকা।

হ্যাঁ। বলি।

তো বুড়ো মাহাতো বলল, মাচান মে হাম ঔর চুনিবাবু বৈঠ গ্যয়া চার বাজি। চুনিবাবু কি ডাহিনে বন্দুকোয়া আর বাঁয়া রাইফেলোয়া।

মুখ্য শিকারি বলল, তারপর? উস বাদ।

—ক্যা বলেগা হুজৌর, সুরজ বুড়হা নেহি, ঘোড়া যেইসি বাঘোয়া আকর পৌঁছ গ্যয়া। পৌঁছকর ইকদফে কাঁড়াকা তরফ দেখিন ওঁর ইক দফে মাচান কি তরফ দেখিন।

ম্যায় বোলা উনকি কানপট্টিয়ামে মু লাগাকর, মারিয়ে চুনিবাবু, মারিয়ে চুনিবাবু।

উসবাদ?

না বাত, না চিত, না বন্দুক উঠাইস, না রাইফেলোয়া। ঔর নীচে খাড়া হো কর বাঘোয়া ইস্মে উস্মে গাস্মাতা হ্যায়।

গাস্মাতা মানে?

মানে, দেখছিল।

উস বাদ?

উস বাদ আচানক ইতনা আওয়াজ ওর উতনাহি বদবু।

উস বাদ?

কেয়া করে ম্যায় ছুঁওড়া পুতানিয়া, উপরমে চুনিবাবু নিচুমে বাঘোয়া।

উস বাদ?

আওয়াজ না শুনকর বাঘোয়া তো ভাগ গিয়া ওঁর ম্যায় তুরন্ত উতর আয়া মাচানসে। অংগলি সে নাক বন্ধ কর ম্যায় বলিন, আপ ঈ ক্যা কর দিয়া চুনিবাবু। বাঘোয়া ইতনা আহসান সে মারনে শকতে থে।

উস বাদ?

উস বাদ চুনিবাবু হামারা উপর বহুতই বিগড়ে। বিগড়কে কহিন চুপ রহো। চুপ রহো। জলদি যাও, পায়জামা লাও।

পায়জামা?

হ্যাঁ হ্যাঁ পায়জামা। হামারা সো মাহিনেসে কিলিয়ার নেহি থে। হামারা কন্টিপেটাং থা। বাঘোয়া দিখকর সো মাহিনাকা—...এক মরতবে হো গ্যারা।

বলেই, বুড়ো মাহাতো চুপ করে গেল।

সমবেত জনমণ্ডলি এবং মুখ্য শিকারিও নির্বাক।

বুড়ো বলল, পহিলে বাতাইয়ে আপকি কন্টিপেটাং হ্যায় ক্যা? কন্টিপেটাং রহনেসে বাঘোয়া ম্যায় নেহি দিখলাউঙ্গা।

বলতেই, আমরা সকলে হো হো হো করে হাসতে লাগলাম।

হাসি শেষ হলে তিতির বলল, তোমাদের বাঘ মারার কী হল?

আমরা পরে মেরেছিলাম, তবে ওই সন্ধেতে নয়। না মারলে আর সুব্রতর দেওয়ালে বাঘের চামড়া ঝোলে কী করে।

তিতির বলল, তা হলে আর বেচারি জনি ম্যাকগাওয়েনের দোষ কী? সে তো আর একলা নয়।

অবশ্যই একলা নয়। এবং সে কথাই তো আমি বলেছিলাম জনিকে।

কী বলেছিলে?

ইতে লজ্জা পাওনের কিছু হয় নাই।

ভটকাই বলল।

## ছয়

একপ্রস্থ করে চা খাওয়ার পরে এবং ঋজুদার পাইপ-ক্লিনিং-এর রিচুয়াল-এর পরে তিতির জিজ্ঞেস করল, গোপালকাকার সেই বন্ধুরা তারপরে কী বলল তোমাকে?

তারা আর কী বলবে। আমরা যখন হেঁটে হেঁটে সীতাগড়া গ্রামের প্রায় কাছে চলে এসেছি, দেখলাম ছাই-রঙা সিএয় গাড়ি তিরবেগে এদিকে আসছে গ্রামের দিক থেকে, পেছনে লাল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে।

আমাদের দেখে গাড়ি দাঁড়াল। গাড়ির মালিক, বন্দুকের মালিক এবং ল্যান্সডাউন টেরাসের বন্ধু (নাম বলা যাবে না) মুখ বের করে চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে বলল, উই আর আউট অফ দ্য শুট।

গোপালের মুখ দেখে মনে হল যে সে বাঁচল। আমরা তো বাঁচলামই। কিন্তু মনে তীব্র হতাশা মাখিয়ে গোপাল বলল, কিন্তু কেন? তারপর বলল, আমরা স্কাউটিং করতে এসেছিলাম তাই ইচ্ছে করেই তোমাদের জানাইনি কিন্তু যত বড় বাঘ দেখলাম...

বাঘ দেখলে?

ওরা সমস্বরে বলল।

বাঘ দেখলাম মানে বাঘের পায়ের দাগ দেখলাম। তাতেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। এই বাঘ শিকার করতে more the merrier—মানে শিকারিদের কথা বলছি।

ভটকাই বলল, এ কী। চিরদিন তো শুনেছি বাঘ মারতে একা যাওয়াই ভাল বিশেষ করে মানুষখেকো বাঘ, বড়জোর একজন সঙ্গী থাকতে পারেন—এ কী ফুটবল খেলা যে এগারোজন লাগবে?

ঋজুদা বলল, সে তো সবাই জানে। গোপাল ওদের স্তোক দিল।

তারপর সেই বন্ধু আবার বলল, চোপ। উই হ্যাভ মেড দ্য ডিসিশান। আমরা লাঞ্চের পরই চলে যাব তিলাইয়া। রাতটা সেখানে কাটিয়ে কাল বার্নপুরে। তার পরদিন কলকাতা। বাই-ই-ই। তোমরা দেরি করে ফিরলে আর হয়তো দেখা হবে না হাজারিবাগে।

আমাদের তো দেরি হবেই।

তারপর গাড়ি স্টার্ট করে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ব্যাক করে ফিরে এল। এসে বলল, দ্যাট ওল্ড ম্যান...

নাজিম সাহেব বললেন, কিসকা বাত কর রহে হ্যায় আপ?

আরে ওই মাহাতো।

উনোনে তো বহতই আচ্ছা আদমি হ্যায়। আপলোগোঁকি গুড় কি সাথ ঠান্ডা পানি পিলায়া কি নেহি? সবহি কো তো পিলাতা।

উও তো পিলায়া। উসকো গুড়-পানিকি লিয়ে হামলোগ থোড়ি আয়াথা হিঁয়া।

বলেই, গোপালের দিকে চেয়ে বলল, হি ইজ আ ফার্স্ট রেট খস্‌সর।

কী বললে?

খচ্চর।

বলেই, অ্যাকসিলেটর দাবিয়ে টিকিয়া উড়ান চালিয়ে চলে গেল।

'টিকিয়া উড়ান' কী ব্যাপার ঋজুকাকা?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

জানিস না তুই? আমি জানি, তোরা সকলেই জানিস। রুদ্র তো জানেই। এটা সুব্রতর ছোট ভাই মুকুলের কয়েনেজ। মানে, হুড নামানো, কাচ নামানো, পর্দা তোলা, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডওয়ার-এর ডিসপোজাল-এর জিপ এমনই জোরে চালানো হবে যে মাথার টিকি মাথার পেছনে পত পত করে উড়তে থাকবে এবং তখনই হবে 'টিকিয়া উড়ান' চালানো।

তিতির বলল, সত্যি! পারও তুমি আর তোমার বন্ধুরা।

এখন আর পারি না। তবে সে ছিল একদিন। নবযৌবনের দল ছিলাম আমরা।

'ভালমানুষ নইরে মোরা ভালমানুষ নই।

পুঁথির কথা কইনে মোরা উল্টোকথা কই।'

ভটকাই বলল।

কটা বাজে রে?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

আজকাল বেশ কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে ঋজুদা, হয়তো একটু বুড়োও। নিজের হাতে বাঁধা রোলেক্স-এর ক্রনোমিটার থাকা সত্ত্বেও কষ্ট করে হাত তুলে নিজে সময়টা দেখবে না, অন্য কারওকে জিজ্ঞেস করবে। বেশ কিছুদিন হয় এমন করছে।

তিতির বলল, মোটে পৌনে সাতটা। সূর্য তো ডুবে গেছে পাঁচটাতে।

এমন সময় জোর হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এল। দৌড়াদৌড়ি করে সবাই রুদ বাংলোর ভিতরে গিয়ে সেঁধোলাম। চৌকিদার, গিরিধারী, ওরা সব দৌড়ে এল চেয়ারগুলো ভিতরে করতে। ভিতরেও ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছিল। সব ঘরে। তখনই তাই নিয়ম ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো ইলেকট্রিসিটি এসে যাবে এখানেও, তখন ডবল হিটার জ্বলবে। এই সুপ্রাচীন ও রইসি প্রথা উঠে যাবে। পৃথিবী অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আগেরকার দিনের আর কিছুই থাকছে না।

তা ঠিক। ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, সবচেয়ে বেশি যা বদলাচ্ছে তা মূল্যবোধ। আগেরকার দিনের সমস্ত মূল্যবোধই বদলে যাচ্ছে। অথবা কী জানি! বয়স হচ্ছে বলেই হয়তো আমার এমন মনে হয়। তোরাই বলতে পারবি।

তিতির অস্ফুটে বলল, আমরা আগেরকার দিনের মানুষ না হয়েও একথা বুঝতে পারি ঋজুকাকা। আমরা একটা সাংঘাতিক সময়ে বড় হচ্ছি। এক আঁধির মধ্যে। এই অন্ধ আঁধির মধ্যে অনেকেই পথ হারাবে যদি তাদের হাত ধরে এই অন্ধকার পার করে নিয়ে যাবার কেউ না থাকে। আমাদের তুমি আছ। আমাদের হারিয়ে যাবার ভয় নেই কোনও।

আমি কে? আমি নিজেই দিশেহারা হয়ে যাই আজকাল মাঝে মাঝে। গত দশ বছরের মধ্যে বদলটা সাংঘাতিক হয়েছে।

ভালই তো ঋজুদা। ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যে এত উন্নতি হয়েছে এ কি খারাপ?

সত্যি কথা বলতে কী আমি নিজে এখনও নিশ্চিত নই। ব্যবসা-বাণিজ্যর পক্ষে অবশ্যই ভাল তবে মানুষের জীবনে তো ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও অন্য অনেক দিক আছে। সেই সব দিকের পক্ষে ভাল কী না তা এখনও নিশ্চিত করে বলার সময় বোধহয় আসেনি।

এখন আর সিরিয়াস কথার মধ্যে যেতে ইচ্ছে করছে না। জনি সাহেবের বাঘের কী হল তাই এখন শুনতে চাই। গল্পটা পুরো না শুনলে রাতে ঘুম হবে না।

ভটকাই বলল।

আমরা সবাই ভিতরে এসে গুছিয়ে বসলে ঋজুদা বলল, রাতে খাবার সময়ে

লিলিয়ানকে বললাম, তোমার বাঘটার চামড়া অস্ট্রেলিয়াতে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। আমাদের কলকাতাতে কাথবার্টসন অ্যান্ড হার্পার, ওয়াটার্লু স্ট্রিটের মোড়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাশে, তারা খুব ভাল taxidermist। নইলে, মাদ্রাসেও পাঠাতে পার ভ্যান ইনজেন অ্যান্ড ভ্যান ইনজেন-এ। তোমাদের States-এর ঠিকানা দিয়ে দিলে তোমরা যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে ছুটির পরে ফিরবে তখন সেখানে পাঠিয়ে দেবেন ওঁদের মধ্যে যে কেউই।

ঋজুদা তারপরে বলল, লিলি সিম্পসনও হুইস্কি খাচ্ছিল। এমনিতে সে এসব খায় না। খেলে, সামান্য ওয়াইন খায়। কিন্তু ওয়াইন ছিল না আমাদের সঙ্গে। সে বলল, তোমার ঠাট্টা কি এখনও শেষ হয়নি? আমাদের এমন দুরবস্থা ঘটানোর পরও? জনি বলছে, আমি কী করে ওই কেরকেটা-টেরকেটাদের সামনে মুখ দেখাব কাল? লজ্জাতে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

আমি একটু রাগ করেই বললাম, লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায় লিলি।

ভটকাই চেপে ধরল ঋজুদাকে। বলল, 'লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যাওয়ার' ইংরেজি কী? তুমি ঠিক কী বলেছিলে?

ঋজুদা হেসে ফেলে বলল, ভটকাইটা দিনে দিনে সত্যিই মহা বাঁদর হয়ে উঠছে। তোরা ঠিকই বলিস।

তারপর বলল, ইংরেজিতে বলেছিলাম, 'এনাফ ইজ এনাফ, উ্য আর গোয়িং টু হিট দ্য সিলিং'। এরই ভাবার্থ করলে 'লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়' হয়ে যায়।

তাতে লিলি অবাক হয়ে বলল, কান্ট উ্য সি? উই মিন এভরিওয়ার্ড অফ ইট।

আমি বললাম, শিকারের নিয়ম হল যে বাঘের শরীর থেকে প্রথম রক্তপাত ঘটাবে বাঘ তার। তুমি লেজেই মার আর যেখানেই মার, তুমি প্রথমে মেরেছ যখন তখন আমি বা তাহের আলি বা সুখরাম বা কেরকেটা যেই বাঘকে মারি না কেন, বাঘ তোমারই থাকবে।

সত্যি!

উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল লিলি।

তারপর বলল, তুমি কী করে শিওর হলে যে আমার গুলি লেজ-এ লেগেছিল। আমি তো কিছু বুঝতেই পারিনি।

—তুমি যখন অভিজ্ঞ হবে তখন বুঝতে পারবে। আমরা সকলেই লক্ষ করেছিলাম যে একগুচ্ছ বাঘের চুল আর কিমার মতো একটু মাংস মাটিতে পড়ে আছে। খুব সম্ভব তোমার গুলিটা লেজ ভেদ করে যায়নি, লেজ ছুঁয়ে গেছে। এল. জি.-র দানা লেজ ভেদ করতেই পারত কারণ দূরত্বও বেশি ছিল না। কিন্তু গুলিটা গেছে লেজ ঘেঁষে।

বাঘ যে লাফিয়েছিল, আমাদের যদি ধরে ফেলত?

ধরে ফেললে তো ফুরিয়েই যেত। আজকে এ প্রশ্ন তুমি আমাকে করতে পারতে না। তবে বাঘটা সম্ভবত তোমাদের ধরবার জন্যে লাফায়নি। লেজে গুলি

লাগায় হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গিয়ে রিফ্লেক্স অ্যাকশানে লাফিয়েছিল। আমি দেখেছি পেটে, পিঠে বা লেজে গুলি লাগলে এবং শিকারি যদি অদৃশ্য থাকে তখন বাঘ প্রচণ্ড আক্রোশে ঘাড় ঘুরিয়ে তার ব্যথার জায়গাটাকেই কামড়ে ধরে। কেন ধরে, তা বলতে পারব না কিন্তু দেখেছি যে ধরে।

তুমি কি কাল ওই বাঘের খোঁজে যাবে ঋজু?

যেতে তো হবেই। লেজের চোট কেমন তা তো জানা নেই। তা ছাড়া তোমাদের বাঘ মারবার জন্যে নিয়ে এলাম পালামৌ। বাঘ না মারিয়ে ফেরত পাঠাই কী করে।

তা হলে আমি যাব তোমার সঙ্গে।

জনি বলল।

না, তুমি যাবে না। লিলি বলল।

জনি বলল, না, তুমি বুঝছ না, আমার নিজের কাছে, এত মানুষের কাছে আমার নিজেকে প্রমাণ করতে হবে নইলে সারাজীবন এই লজ্জা বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে।

কে জানবে? এই কেরকেটারা জানল তো কী হল? সভ্য সমাজের কেউই তো জানছে না। আমি তো আর কাউকে বলছি না।

ঋজুদা বলল।

জনি বলল, না না, আমি তো জানব। তা হয় না। উ্য মাস্ট টেক বোথ অফ আস অ্যালং।

এ তো সিটুর প্রসেশন নয় বাছা যে লাল ঝান্ডা নিয়ে কাতারে কাতারে মানুষকে যেতে হবে। কিন্তু ওদের বলে কী লাভ?

আমি বললাম, আচ্ছা, আগে খোঁজ করি গিয়ে। এ সময়ে প্রসেশন করে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। কী করে নিঃশব্দে চোখ-কান খোলা রেখে সব ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে বাঘের জঙ্গলে চলতে হয় তা শিখতে দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় লাগে। একদিনেই সব হয় না। শিকার মানে, অনেক মূর্খরই ধারণা যে, ট্রিগার টানা। ট্রিগার টানাটা শিকারের সবচেয়ে কম জরুরি ব্যাপার। ট্রিগার টানার আগে যত জায়গায় যেতে হয়, যত মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়, যত পশুপাখি গাছপালা পাহাড় নদীর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, সেইটেই হচ্ছে আসল। মূর্খরা তা জানে না বলেই বলে, বাঘ মারা আর কী কঠিন কাজ, মাচাতে বসে ট্রিগার টেনে দিলেই তো হয়ে গেল। তোমরা দেখলে তো কঠিন কাজ কি না। ট্রিগার টানাটাও কঠিন কাজ নইলে জনি পারল না কেন ট্রিগার টানতে আর তুমিই বা মিস করলে কেন?

অবশ্যই দেখলাম। আমাদের কাছে এমন স্টুপিডের মতো কথা কেউ বলতে এলে আমরা তাদের বলব যে যা তারা ভাবে তা নয়।

ওক্কে। লিলি বলল। যদি হঠাৎ করে বাঘের সঙ্গে তোমাদের দেখা না হয়, মানে, যদি সুযোগসুবিধা হয় তবে আমাদের সঙ্গে নিয়ো। আমরা এতটাই

এমব্যারাসড হয়ে আছি যে বলতেও লজ্জা করছে।

আমি বললাম, কাম অন। আই অ্যাম অ্যান ওল্ড ফ্রেন্ড অফ বোথ অফ উ্য। উ্য শুডনট ফিল এমব্যারাসড অ্যাট অল।

তারপর বললাম, কানাডাতে ট্রেকিং করার সময় যে বলতাম, আমাদের দেশের জঙ্গল অন্যরকম, আমাদের বাঘ অন্যরকম, ঠিক কিনা।

ঠিক। হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক।

এই অবধি বলে ঋজুদা বলল, এবার গান-টান হোক। তারপর লিট্টি সেরিমনি তো আছে। কালকে বাকি অংশটি হবে।

আর ভূতের গল্প?

হবে। হবে। সময়ে সব হবে। সময়কে সময় দিতে হয়।

আবার শুরু করো ঋজুদা।

হ্যাঁ।

## সাত

ওরা, মানে জনি আর লিলিয়ান শুয়েই ছিল। যা ঠান্ডা এখন পালামৌতে ঘুমোবার মতন আরাম আর কিছুই নেই। জেঠুমনি বলতেন, ঘুম হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং নিখরচাতে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ান থেকে শিবাজি, যাঁরাই মানুষের মতো মানুষ ছিলেন, তাঁরাই ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে ঘুমোতে পারতেন, আর আমাদের চেনা মানুষের মতো মানুষ পটকাদা, পোর্ট কমিশনারস-এর হেড ক্লার্ক, ট্রাম বাসে অকাতরে ঘুমোতে পারতেন। এরকম মেড টু অর্ডার ঘুম কারওই দেখিনি আমি। রাসবিহারী-রসা রোডের মোড় থেকে ট্রামে চড়েই ঘুমিয়ে পড়তেন আর নিজের স্টপেজ এলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নেমে যেতেন। কন্ডাক্টরকে পয়সাও দিতেন ঘুমেরই মধ্যে এবং টিকিটটা হাতঘড়ির নীচে গুঁজে রাখতেন।

জুম্মানকে বলাই ছিল। আমি দরজা খোলামাত্র কাচের একটা বড় গ্লাসে করে ধোঁয়া-ওঠা চা নিয়ে এল। আমি তৈরি হয়ে বেরিয়েছিলাম। তখনও প্রচণ্ড ঠান্ডা। সারারাত শিশির পড়েছে। এখন গাছগাছালির পাতা থেকে টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়ার মতো জল ঝরছে। শীতের বনের গায়ের একটা থম-মারা গা-শিরশির করা গন্ধ, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে 'ম-ম' করছে চারধার।

শীতের দিনে গ্লাসে করে চা খেলে চা অনেকক্ষণ গরম থাকে এবং দু হাতে ধরে থেকে হাত দুটোও গরম হয়ে ওঠে। আমার অবশ্য হাত গরম করার অন্য সহায় আছে। পাইপ।

চা খাওয়া শেষ করে জুম্মানকে বললাম, আমি কখন ফিরব ঠিক নেই। সকালের নাস্তা এমনকী দুপুরের খাবারও সাহেব মেমসাহেবকে দিয়ে দিয়ো।

আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। ওঁদের বোলো যে, আমি এ কথা বলে গেছি।

মাথার টুপিটা কান অবধি টেনে দিয়ে ফোর ফিফটি ফোর হান্ড্রেড জেফরি নাম্বার টু রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম গাড়ুর দিকে। এই কান-কাটা ঠান্ডাতে টুপি কান অবধি না নামালেই নয়। তবে, কিছুক্ষণ চলার পরেই গা গরম হয়ে যাবে, মাথাও। তবে টুপি তো পরে থাকতেই হবে, তবে হালকা করে। পাইপটা পুরো ফিল করে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে বাঁ হাতের মুঠিতে ধরে ডান হাতে রাইফেলের ব্যারেল ধরে রাইফেলটাকে কাঁধে শুইয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দামি রাইফেল-বন্দুকের এই এক অসুবিধা। ব্যারেলে ও বাট-এ স্লিং থাকে না, যে কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া যাবে। এসব রাইফেল বন্দুক তৈরি হত রাজা মহারাজাদের জন্যে। তাঁরা হেঁটেই শিকার করুন, কি হাতির পিঠে বসে, ভারতে বা আফ্রিকাতে, তাঁদের বন্দুক রাইফেলও বইত গান-বেয়ারাররা। দু-তিনটি বিভিন্ন বোর-এর রাইফেল বন্দুক কাঁধে করে সঙ্গে হাওদাতে অথবা মাটিতে থাকত দু-তিনজন ভাল স্থানীয় শিকারি। বন্যপ্রাণী দেখলে যার দিকে হাত বাড়াতেন, রাজা বা মহারাজা বা গভর্নর, বা ভাইসরয়, জেনারেল সে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের আগ্নেয়াস্ত্র এগিয়ে দিত শিকারির দিকে। বিপজ্জনক হয়ে উঠলে প্রয়োজনে সঙ্গী শিকারিরাও গুলি করত। তবে তা করত নিতান্ত প্রয়োজন হলেই। আমি তো রাজা মহারাজা নই, তাই আমার রাইফেল আমাকেই বইতে হচ্ছে।

তখন পুবে সবে আলো ফুটেছে। পথের পাশের একটা বড় কালো পাথরের ওপরে বসলাম আমি একটু এগিয়েই। জায়গাটার পাশ দিয়ে একটি নালা বয়ে গেছে। তার বালিতে এবং পথের ভেজা মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ যদি দেখা যায় সেই আশাতেই বসলাম যদিও কিছু অন্য কারণও ছিল। নির্মলকুমারী মহলানবিশ-এর 'বাইশে শ্রাবণ' বইয়েতে অনেকদিন আগে পড়েছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন: 'রোজ শেষ রাতে সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত নিজের মনকে আমি চান করাই। 'শান্তম্' আমার মন্ত্র। রাতেও শুতে যাওয়ার আগে সেই জন্যে কিছুক্ষণ আমি একা বসে থাকি। সেই সময়টা আমার নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার সময়। সারাদিন কত তুচ্ছ কারণে নিজের কাছে নিজের পরাজয় ঘটে, তাতে মন ক্লিষ্ট হয়ে থাকে, রাতে শুতে যাওয়ার আগে মনকে শান্ত করে পরিষ্কার করে নিতে না পারলে শান্তি পাই না। আর শেষ রাত্রে আমার নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কাজ চলতে থাকে। সেই সময়টা খুব ভাল সময়। বাইরের কোনও কোলাহল থাকে থাকে না, নিজেকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।'

তিতির বলল, তোমার ওপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এমনভাবে পড়েছে যে মনে হয়, জেঠুমনির প্রভাবও তেমনভাবে পড়েনি।

জেঠুমনি যতই বৈচিত্র্যময় মানুষ হন না কেন, তিনি মানুষই ছিলেন। আর

রবীন্দ্রনাথ তো আমার দেবতা।

ভটকাই বলল, চারদিকে যখন লোকে রবীন্দ্রনাথকে হ্যাটা দিচ্ছে, 'উচ্ছ্বাস বর্জিত' নতুন জীবনী লিখছে 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, আর তুমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলে।

হ্যাঁ, অনেক মানুষই এখন রবীন্দ্রনাথ যে আর দশটা সাধারণ মানুষেরই মতো ছিলেন, তাঁর বিস্তর দোষ ছিল, তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক ছিল—এই সব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, সেটা ঠিক। কিন্তু তাঁরা তা করুন। ঈশ্বরবোধেরই মতো রবীন্দ্রবোধও একটা বিশেষ ব্যাপার। শিক্ষা, মানসিকতা এবং রুচিতে যাঁরা আলাদা নন, তাঁদের মতো mundane ক্রিয়াকর্মকরা মানুষদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করা তো সহজ নয়। যার যেমন অভিরুচি, যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গি, যার যেমন শিক্ষা, তিনি সেই মতোই কাজ করবেন। এসব নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

ঋজুদা হেসে বলল, আমি কিছুই বলছি না। তবে এই সব ছোটখাটো অশিক্ষিত, নির্গুণ, কুরুচিসম্পন্ন মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা খুশি বলতে পারেন।

ভটকাইই আমাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, ঋজুদা যাচ্ছিল ল্যাজে গুলি খাওয়া বাঘের খোঁজে আর কোথা থেকে এই রুদ-এর বাংলোতে তোরা সব ভারী ভারী ব্যাপার এনে ফেললি। ঋজুদারও দোষ আছে।

ঋজুদা বলল, মানছি, আছে। রবীন্দ্রনাথকে আমি আমার বাবার চেয়েও বেশি সম্মান করি। তাঁকে কেউ কিছু বললে, বা ছোট করলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। কিছু মানুষ নিজের নিজের বই বিক্রি ও পয়সাওয়ালা মালিককে খুশি করার জন্য নিজেদের যে কত নীচে নামাতে পারেন, তা ভাবলেও বড় ঘেন্না হয়।

তিতির বলল, তাঁরা যা করছেন করুন। বাঙালি তাঁদের মুখে ঝাল খাবে না। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত এখন এক প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। এ কোনও গুরুবাদের কথা নয়। বাঙালির মনের কথা—অনেক প্রজন্মের বাঙালির মনের কথা। কিছুক্ষণের দুর্গন্ধবাহী হাওয়া এই পরিবেশকে দূষিত করতে পারবে না।

এবারে তুমি লিলিয়ান সিম্পসনের বাঘ-এর গল্পটাতে ফিরে যাবে ঋজুদা, প্লিজ।

হ্যাঁ। যাচ্ছি।

সেই পাথরটার ওপরে বসে থাকতে থাকতেই রোদ উঠল। আমি উঠে গিয়ে নালার বালি এবং পায়ের ধুলো ভাল করে পরীক্ষা করলাম। না, বাঘের পায়ের দাগ নেই কোনও।

তারপরে পাইপটা কিছুক্ষণ খেয়ে এগোলাম। আস্তে আস্তে রোদটার জোর বাড়তে লাগল। ওপরে নীল, পলিউশনহীন আকাশ, নীচে শিশির ভেজা প্রকৃতির মধ্যে লাল মাটির শিশির ভেজা পথ চলে গেছে। জোরে নিশ্বাস নিলে নাক হিম হয়ে যায়—এখনও এত ঠান্ডা।

মাইলখানেক মাটিতে চোখ রেখে হাঁটার পরে একটা জানোয়ার চলা পথ,

ইংরেজিতে যাকে গেম-ট্র্যাক বলে, তার সন্ধান পেলাম। পথটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে গেছে বড় রাস্তাকে কেটে। অথবা অন্যভাবে বললে বলতে হয়, ডানদিক থেকে বাঁদিকে গেছে। নদী ডানদিকে। আর সেই নদীই কোয়েল। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে আমি ডানদিকেই যাওয়া মনস্থ করলাম।

এই পায়েচলা পথে অনেক জানোয়ারের পায়ের দাগ পেলাম। বাইসনের একটি দল, শম্বরের একটি দল, কোটরা হরিণ, চিতল হরিণ, হায়না, ভাল্লুক, বড়কা বুনো শুয়োর এবং একটি বড় বাঘ। বাঘের পায়ের দাগটি সম্ভবত গতকালের। তার ওপরে এত জানোয়ারের শোভাযাত্রার চিহ্ন যে, সেই দাগকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। তবে মনে হল, এ লিলির বাঘই।

তারপরই বলল, তোরা কুটকু যাসনি, না?

কুটকু? না তো।

আমরা বললাম।

দেখি, এবারে হয় কিনা। সম্ভব হলে নিয়ে যাব। তবে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। হুটার, মোড়োয়াই হয়ে। কুটকুর কাছে কোয়েলের রূপই আলাদা। বাংলার সামনে নদীর ওপরে পিলার তুলে নদীর বেশ কিছুটা ভিতরে বসবার জায়গা করা আছে একটি। সাহেবরা বানিয়ে গেছিল। ব্যাটাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল খুব।

তারপরই বলল, তোরা কেউ 'কোয়েলের কাছে' পড়েছিস?'

তিতির হাত তুলে বলল, পড়েছি।

তবে তো পড়েছিসই। যেখানে সুগত হাঁকোয়া শিকারে গিয়ে মারা গেল, সেই কুটকু।

তিতির আমাদের বলল, পালামৌতে আসার আগে তোদেরও পড়ে আসা উচিত ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে লেখা বই কিন্তু কোনওদিনও পুরনো হবে না। ক্ল্যাসিক হয়ে গেছে।

তা হোক গে, এখন ঋজুদা আগে বাড়ো। আবার তুমি অফ্‌ফ-ট্র্যাক হয়ে যাচ্ছ।

ঠিকই বলেছিস। নাঃ আর নো ভেজাল। তোরাও অন্য প্রসঙ্গ আনবি না আর। লিলিয়ান সিম্পসন-এর বাঘের গল্প শেষ না হলে খাওয়া-দাওয়াও হবে না কিন্তু।

মাঝে একটু কফি ব্রেক?

ভটকাই বলল।

তা হতে পারে। কিন্তু নিঃশব্দে। এতদিন আগের ঘটনা আমার কি ছাই সব মনেও আছে?

যাই হোক, আবার শুরু করো।

হ্যাঁ, গেম-ট্র্যাকটা এঁকে বেঁকে প্রায় আধ মাইল চলে গেছে নদীর দিকে। এদিকে কিন্তু মিশ্র জঙ্গল। শাল, শিশু, ক্বচিৎ মহুয়া, আরও ক্বচিৎ সেগুন, মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড় হাতি আর বাইসনদের প্রিয়। কুঁচফলের গাছ, কোলাউন্দা, করৌঞ্জ, জংলি নিম, আমলকী, শিমূল আরও কত কী গাছ।

এমন সময়ে পথের ডানদিকে ওপরে একটা ঝটপট আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। চার-পাঁচটি ঘোর লালরঙা পাখি বসে আছে সেখানে। এরকম পাখি আগে দেখিনি। আয়তনে পায়রার মতো। তবে লাল মানে আর্টিস্টরা যাকে বলে পোস্ট অফিস রেড, সেরকম লাল—অরেঞ্জ মিনিভিট-এর শরীর বা সিপাহি বুলবুল-এর মাথার মতো লাল নয়। এ পাখি কখনও দেখিনি, কোথাও শুনিওনি। শুনিওনি বললে ভুল হবে, ওড়িশার সুন্দরগড়ের মহুলসুখা ম্যাঙ্গানিজ খাদানের কাছের কুড়ারি নদীর পাশের একটি আদিবাসী গ্রামের আদিবাসীদের মুখে এইরকম পাখিদের কথা শুনেছিলাম। তবে সে পাখি পরিযায়ী। এবং জোড়া। কোনও কোনও বছরে সেই জোড়া পাখি তাদের গ্রামে এলে ফসল খুব ভাল হয়। তাই সে পাখি এলে যে শিমুলগাছের মগডালে তারা এসে আস্তানা গাড়ে তার তলায় দেবতার থানের মতো পুজো চড়ায় আদিবাসীরা। এই পাখির কথা 'মহুলসুখার চিঠি' নামের একটা বইতেও পড়েছিলাম। সঙ্গে দূরবিন নেই, থাকলে আরও ভাল করে দেখা যেত পাখিগুলোকে, মনোযোগ সহকারে পারিপার্শ্বিক ভুলে ওপরে তাকিয়ে আছি এমন সময়ে হালকা পায়ের আওয়াজ শুনলাম পেছনে। চকিতে রাইফেল বাগিয়ে ফিরেই দেখি সুখরাম। সে ভয়ার্ত মুখে আমাকে বলল, মুখ নামান, মুখ নামান, ঋজুবাবু, ওই পাখিদের দেখবেন না।

কেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম।

বাঘের জঙ্গলে কেউ জোরে কথা বলে না, বিশেষ করে বাঘ খুঁজতে এসে, তাই সুখরাম ফিসফিস করে কথা বলছিল।

বললাম, কী ব্যাপার?

ওগুলো মায়া পাখি। ও পাখি যে দেখে তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যু তো সকলেরই হবে একদিন না একদিন।

তা নয়, তার মৃত্যু হয় তাড়াতাড়ি। ওগুলো পাখি নয়, মায়া পাখি।

মায়া পাখি?

হ্যাঁ।

যত্ত বোগাস।

আমি বললাম। তারপর আবার ওপরে তাকালাম। দেখি একটিও পাখি নেই। তারা ভোজবাড়ির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের উড়ন্ত ডানার ফটাফট শব্দও শুনতে পেলাম না অথচ তারা উড়ে চলে গেল। কী করে হয়। ধন্দে পড়লাম আমি। ওই সব অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জংলি মানুষদের খপ্পরে পড়ে আমিও কি অমনই হয়ে যাব? ভেবে দুশ্চিন্তা হল আমার।

সুখরাম বলল, ওদের নাম লালি। ওরা বুঢ়া দেও-এর আশ্রিত।

পনেরো-কুড়ি বছর পরে কখনও কখনও হঠাৎ দেখা যায় এদের। এদের দেখা গেলে বাঁশগাছে ফুল আসে এবং সব বাঁশগাছ মরে যায়। এরা অমঙ্গলের দূতী।

বনের পশুপাখির ক্ষতি করতে এলে কখনও কখনও বুড়হা দেও এদের পাঠান সাবধান করতে। ওই বাঘ বুঢ়া দেও-র আশ্রিত। ওকে মারার চেষ্টা করাটা ঠিক হবে না বাবু।

আমি টোব্যাকোর পাউচ থেকে একটু তামাক দিলাম সুখরামকে। সে বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খইনির মতো মেরে নিয়ে তার নীচের ঠোঁটের নীচে চালান করে দিল। তারপর সেই সুগন্ধি বিলিতি গোল্ডব্লক টোব্যাকোর রস তার পাকস্থলীতে যাওয়াতে সে একটু চাঙ্গা হল। বলল, কেরকেটা আর তাহের আলি অন্য দিক দিয়ে ওই গুহাগুলোর দিকেই রওনা হয়েছে। এতক্ষণ বোধহয় কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে। তাহের আলির কাছে বন্দুক আছে, যদিও বে-পাশি, তবে আপনার ভরসাতেই সে এনেছে বন্দুক। জানে আপনার পারমিট আছে আর বিশ্বাসবাবুদের মেহমান আপনি। আপনাকে ছোঁয় এমন হিম্মত বনবিভাগের কোনও আমলার নেই।

আমি বললাম, চলো এবারে এগোই। আর কথা নয়।

লালি পাখি দেখার পরও ওই বাঘের পেছনে যাওয়াটা কি ঠিক হবে আপনার?

আমি বললাম, বিপদ হলে আমার হবে। তোমার তো হবে না। তবে আর কী? চলো এগোই। এই রাইফেল হাতে থাকতে স্বয়ং যমরাজকেও পরোয়া করি না আমি।

নিমরাজি হয়ে সুখরাম বলল, চলুন।

প্রায় নদীর কাছাকাছি এসে যখন পড়েছি তখন দেখি কেরকেটা আর তাহের আলি গুহার নীচে একটা গোল পাথরের ওপরে বসে আছে। তার মানে, ওরা নদীতে বালিতে বাঘের পায়ের দাগ পেয়েছে এবং সে গুহাতেই আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে। গুহাটার সামনে একটা মস্ত বড় চ্যাটালো কালো পাথর বুক চিতিয়ে আছে আদিবাসী ছেলের বুকের মতন। বাঘ যদি গুহাতে গিয়ে শেষ রাতে সেঁধিয়ে থাকে তা হলে এই শীতের সকালে পাথরের শিশির শুকিয়ে গেলেই সে ওই চ্যাটালো পাথরের ওপর শুয়ে রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘুমুবে। গুহামুখে একটা অল্পবয়সি পিপ্পাল গাছ আছে। গ্রীষ্মে তার ছায়াতে সে শুয়ে থাকে। শীতের সূর্যর অয়নপথের ফারাক হওয়াতে সেই পিপ্পাল গাছের ছায়া পড়ে না সকাল বেলায়।

ততক্ষণে চনমনে রোদ উঠে গেছে। গুহার নীচে একজোড়া র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো ওড়াউড়ি করে ঝগড়া করছে। পাখিগুলোর গলার স্বর ধাতব। ভারী ঝগড়াটে পাখি। এরা বনমোরগ জাগবারও আগে জেগে উঠে ডাকাডাকি শুরু করে। তাদের বাসার কাছে অন্য পাখি এলে তারা তেড়ে যায় তাদের, তা বাসাতে বাচ্চা ডিম থাকুক আর নাই থাকুক। তাদের চেয়ে আকারে অনেকগুণ বড় পাখিদের সঙ্গেও টক্কর দিতে তারা পিছপা হয় না। তাদের লম্বা চেরা লেজ উড়িয়ে ঘাড়ের কেশর ফুলিয়ে ভীমবিক্রমে তারা আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে।

গুহার কাছেই আছে ওরা তাই কথা বলতে পারবে না। আমি আর সুখারাম আকারে-ইঙ্গিতে ওদের কাছে শুধোলাম, ব্যাপার কী?

ওরাও কিছু বলল আকারে-ইঙ্গিতে কিন্তু কী বলল তা আমরা বুঝতে পারলাম না। আমিও গুহার কাছে যাব কি না তা জানা দরকার। ওরা কি গুহামুখে আওয়াজ করে বাঘকে গুহা থেকে বের করে আনতে চায়? তা যদি করে, তবে তাহের আলিরই মারতে হবে বাঘকে। নদীর ওপারে গুহা। বেশ দূর। আমার ফোরফিফটি ফোর হান্ড্রেড হেভি রাইফেল দিয়ে অত দূরে গুলি করলে মিসও হতে পারে। থ্রি-সিক্সটি সিক্স রাইফেলটা কেন নিয়ে এলাম না তা ভেবে আপসোস হচ্ছিল। ওই রাইফেল দিয়ে আরও দূর থেকে আমি নির্ভুল নিশানায় নানা জানোয়ারকে গুলি করেছি দিনেরাতে। আমার গর্ব ছিল যে ওই রাইফেলে আমি একটা গুলিও মিস করিনি কখনও।

আমি বললাম, রাইফেলটা দেখি না আজকাল। গেল কোথায় ঋজুদা?

ঋজুদা হেসে বলল, ওটা ভাল লোকের কাছেই আছে।

কার কাছে?

ভিক্টর ব্যানার্জি।

অভিনেতা?

হ্যাঁ, ভিক্টরের ভিলা আছে মুসৌরি পাহাড়ে। তার আশেপাশে সে হয়তো ঘুরাল-টুরাল মারে। সেই নিয়েছে রাইফেলটা। তবে দাম দিয়ে নিয়েছে।

দেওয়াটা উচিত হয়নি তোমার। কত স্মৃতি ও রাইফেল ঘিরে তোমার।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, সব স্মৃতিই একদিন মুছে যায়, মুছে যেতে বাধ্য। আমি মরে গেলে আমার স্মৃতিও মুছে যাবে তোদের মন থেকে। কালের এই নিয়ম। স্মৃতি আঁকড়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কোনও স্মৃতিই। পুরনোকে পেছনে না ফেলতে পারলে সামনে এগোবি কী করে।

ভটকাই বলে, আবার চলো গুহার কাছে।

হ্যাঁ।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, একটু কফি হতে পারে তো? কী কোয়ার্টার মাস্টার?

ভটকাই তড়াক করে উঠে বাবুর্চিখানাতে বলেই ফিরে এসে আবার সেই অভিব্যক্তি করল। ইরে। কী শীত। কাঁড়িয়া পিরেত মারা শীত।

বলেই বলল, ভূতের গল্পটা হবে তো।

তিতির বলল, আগে বাঘের গল্প শেষ হোক।

ঠিক।

ভটকাই বলল।

সুখরামই বলল, আমি বরং যাই ওদের কাছে। কী মতলব জেনে আসি আর

আপনাকে কী করতে হবে তাও।

ভেবে বললাম, তাই ভাল। ওরা যদি আমাকে ওখানে যেতে বলে তবে হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকলেই এগিয়ে যাব। নইলে, নদীর মধ্যে যে সাদা পাথরের স্তূপটা আছে আমি সেই অবধি এগিয়ে গিয়ে পাথরের ওপরে আড়াল নিয়ে বসতে পারি। সেখান থেকে বাঘ গুহামুখের চাতালে এসে দাঁড়ালে অথবা কোনও কারণে যদি তাড়া খেয়ে বা আহত হয়ে পালাতে চায় তবে হয়তো এই গেম-ট্র্যাক ধরেই দৌড়ে এসে পথের গভীর জঙ্গলের আশ্রয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে তখন নদী পেরুবার সময়ে সে আমার এই রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে থাকবে। তাকে মারতে অসুবিধে হবে না।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা দুজনেই এগোলাম নিঃশব্দে। ঠিক নিঃশব্দে নয়, যথাসম্ভব কম শব্দ করে। তার পর আমি গিয়ে ওই পাথরের স্তূপে আড়াল নিয়ে উঠে বসলে, সুখরাম এগিয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, আমরা তো শখের শিকারি আর সুখরাম কেরকেটা তাহের আলিরা বনেরই মানুষ। ওরা যেমন নিঃশব্দে বনের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে আমরা হাজার চেষ্টা করলেও পারব না।

আমাকে বসিয়ে সুখরাম এগিয়ে গেল।

এমন সময়ে দেখলাম যে তাহের আলি পকেট থেকে বিড়ি বের করে বিড়ি ধরাল একটা। বাঘের গুহার এত কাছে দেশলাইয়ের শব্দ বা বিড়ির গন্ধ দুই-ই বাঘের কানে ও নাকে যেতে পারে। কাজটা ভাল করল না। ভাবলাম আমি।

ওরা যেখানে বসে আছে, বাঘ গুহা থেকে বেরিয়ে ওই চাতালে এসে দাঁড়ালে ওদের দেখতে পাবে না। চাতালের শেষ প্রান্তে এসে উঁকি মেরে দেখলেই চোখে পড়বে ওদের, নইলে নয়।

সুখরাম নদীর চারভাগের তিনভাগ অতিক্রম করে গেছে এমন সময়ে দেখলাম বাঘ গুহা থেকে বেরিয়ে চাতালে এসে দাঁড়াল। তাকে থিতু অবস্থাতে দেখে বোঝা গেল সে কত বড় বাঘ। সকালের রোদ এসে পড়েছে তার ঝলমলে পাটকিলে কালো শরীরে। সে এক রাজকীয় দৃশ্য। সে বাইরে আসতেই বনের মধ্যে থেকে ময়ূর, হনুমান এবং নানা পাখি একসঙ্গে ডেকে উঠল। লেজেই লাগুক গুলি আর যেখানেই লাগুক আহত বাঘ তো আহত বটেই, তা ছাড়া কাল রাতে হয়তো শিকারও ধরতে পারেনি কিছু শরীরে যন্ত্রণাতে। বাঘের মেজাজ বিলক্ষণ খারাপ ছিল। সে গুহামুখে দাঁড়িয়েই এক হুংকার দিল এবং হুংকার দিয়েই নদীর বুকে সুখরামকে দেখতে পেয়ে পাথরের পর পাথর এক এক লাফে টপকে সুখরামের দিকে ধেয়ে এল। ব্যাপারটার অভাবনীয়তাতে সুখরাম তো চমকালই তাহের সিং আর কেরকেটাও কম চমকাল না।

বাঘ নদীতে নামতেই তাহের আলি বাঘকে লক্ষ করে গুলি করল। আশ্চর্য! বাঘ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাহের আলি আর কেরকেটা দুজনকেই দেখল কিন্তু

তার আততায়ীকে আক্রমণ না করে সে ততক্ষণে দৌড়-লাগানো সুখরামের দিকেই ধেয়ে গেল।

কেন?

তিতির বলল।

কেন, তা বলতে পারব না তবে বাঘ বা চিতা ওরকমই করে, কুকুরও যেমন করে। কেউ দৌড়ে গেলে তারা তার পেছনেই দৌড়ে গিয়ে লাফ মেরে ধরে বা ঘাড় মটকায়।

সুখরামটা ইডিয়েটের মতো আমার দিকে দৌড়ে আসছিল ফলে বাঘ আর সুখরাম একই লাইনে পড়ে যাওয়াতে আমি গুলি করতে পারছিলাম না। সেই একই কারণে ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠে বাঘের পেছন পেছন দৌড়ে আসা তাহের আলিও গুলি করতে পারছিল না, পাছে সুখরামের গায়ে গুলি লাগে।

তখন আমি ওরে ব্যাটা বাঘ! বলে ডাকাতদের মতো চিৎকার করে পাথরের স্তূপ থেকে লাফিয়ে নেমে সুখরামের দিকে দৌড়ে গেলাম এবং সুখরামকে রাইফেলের নলের এক ধাক্কাতে বালিতে ফেলে দিয়ে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

এত কিছু ঘটে গেল কিন্তু এক-দেড় মিনিটের মধ্যে। বাঘ আমাকে দেখে যেই আমার ওপরে লাফাতে যাবে আমি ডানদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম তার বুক লক্ষ করে। তাতে সে পড়ে গেল কিন্তু পড়ে গিয়ে আবারও উঠে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসার মতো এগিয়ে আসতে লাগল প্রচণ্ড বেগে। তখন আমি বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম তার কপাল লক্ষ করে। বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করতেই বাঘ সামনের দু থাবা জড়ো করে বালির মধ্যে থাবার ওপরে তার মুখখানি রেখে স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার চোখের পাতাদুটি বন্ধ হয়ে গেল।

এক আকাশ আলোর মধ্যে, এত গাছ, ফুল, পাখিকে সাক্ষী রেখে আমি একটি খুন করলাম। আর কাকে করলাম? না, যে বনের রাজা, যে সাহসী শ্রেষ্ঠ, যে পৌরুষের সংজ্ঞা। বিলেতে তৈরি দামি রাইফেলের হেভি বুলেট তার বুকের মাঝখানটা আর কপালের মাঝখানটা চিরে দিল?

ভারী মন খারাপ হয়ে গেল আমার। পেছনে কিছুটা হেঁটে গিয়ে একটা পাথরে বসে পকেট থেকে পাইপটা বের করে আগুন ধরালাম। মাথা থেকে টুপিটা খুললাম যেন, বাঘকে সম্মান জানাতেই।

সুখরামের জ্ঞান নেই। কেরকেটা এবং তাহের আলি দৌড়ে এসে তাকে চিত করে শোওয়াল। মুখে চোখে নদীর জলের ঝাপটা দিল। অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার ছিল আমাদের। সুখরামের কাছ থেকে তো বটেই, নিজেদের কাছ থেকেও।

তিতির বলল, নিজেদের কাছ থেকে কেন?

শোন। কফিটা খেয়ে নিয়ে বলছি।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে ঋজুদা বলল, কিছুক্ষণ পর সুখরামের জ্ঞান এল। আমার রাইফেলের নলের ধাক্কাটা তার পেটে বেশ জোরেই লেগেছিল কিন্তু

কোনও উপায় ছিল না। তাকে লাইন অফ ফায়ার থেকে সরাতে না পারলে আমি গুলি করতে পারতাম না, তা ছাড়া বাঘও ধরে ফেলত তাকে।

তাহের আলি ওই অসময়ে বিড়ি ধরাতে গেল কেন?

জিজ্ঞেস করেছিলে তাকে?

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, করেছিলাম। সে কী বলল, বলছি।

সুখরামের মুখের ওপরে ওরা দুজন ঝুঁকে পড়ে ওর নাম ধরে ডাকছিল। কিছুক্ষণ পরে সুখরাম চোখ খুলে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, লালি। লালি।

তাহের আলি আর কেরকেটা তাকে সায় দিয়ে বলে উঠল, হামলোগোনে ভি দিখা থা। আয়া থা উও চিড়িয়া।

কেরকেটা বলল, সায়েদ উ বাঘোয়া ভি দিখা থা নেহি তো অ্যাইসা অজিবসা বেওহার কাহে করেগা বাঘোয়া?

তবে এটা ঠিক বাঘের এরকম ব্যবহার সত্যিই অবাক করা ব্যাপার। ওই বাঘ লিলিয়ানের গুলির পর এবং সুখরামকে দেখে যেমন হুংকার দিয়ে উঠেছিল তা একেবারেই আশ্চর্যের ব্যাপার। বাঘ, শিকারি শ্রেষ্ঠ। তার যতই যন্ত্রণা হোক সে মুখ দিয়ে সচরাচর টুঁ শব্দটি করে না। গুলি লাগলেও নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যায়, না লাগলেও। আওয়াজ করে তার অবস্থান সে কিছুতেই জানান দিতে চায় না। তা ছাড়া দিনমানে সে কখনও ফাঁকা জায়গাতে যেখানে তাকে সহজে দেখা যায় তেমন ভাবে চলাফেরাই করে না। সবসময়েই আড়ালে আড়ালে আলোছায়ার হেঁয়ালির মধ্যে নিঃশব্দে চলাফেরা করে। কেরকেটা ও তাহের আলিকে সে দেখতে পায়নি। হয়তো দেশলাই জ্বালাবার শব্দ ও বিড়ির উগ্র গন্ধ পেয়ে থাকবে কিন্তু গুহার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে সে নদীর বুকে সুখরামকে দেখতে পেয়ে একেবারে ফাঁকা সম্পূর্ণ আড়ালহীন জায়গাতে অতখানি তেড়ে আসবে যে কেন সেটা বোধগম্য হল না। তাহের আলি বক্তব্য হল, আজ সকালে অমঙ্গলের লালি পাখিরা যেমন আমাদের সকলের নজরেই এসেছে বিভিন্ন সময়ে তা বাঘের নজরেও এসেছে।

ঋজুদা বলল, আমি বললাম, বাঘ তো সচরাচর ওপরে তাকিয়ে চলে না।

কেরকেটা বলল, লালি পাখিরা তো নীচেও নামে। হয়তো নদীর বুকে নেমে জল খাচ্ছিল তখন বাঘ তাদের দেখে থাকবে।

তোমাদের কুসংস্কার নিয়ে তোমরা থাকো। ওসব লালি পাখির অমঙ্গলের কথা আমি মানি না।

কিন্তু অমন পাখি কি দেখেছেন আগে কখনও ঋজুবাবু! আপনি তো এই সব পাহাড়-জঙ্গলে আঠারো বছর বয়স থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আমি ওদের বললাম না যে শুধু পালামৌর জঙ্গলই নয় বিহারের অন্য নানা জায়গার জঙ্গল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম এবং দক্ষিণ ভারতের নানা জঙ্গল

এবং সুন্দরবনেও আমি অনেক বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি কিন্তু সুন্দরগড়ের মহুলসুখা খাদানের কাছের একটি আদিবাসী গ্রামে এরকম পাখি, তাও মাত্র একজোড়ার গল্প শোনা ছাড়া এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। তখনও আমার মন বলছিল যে সকালে যা দেখেছিলাম তা আসলে সত্য নয়। হয় মনের ভুল, নয় optical illusion. কিন্তু আমি তো একাই নই। ওরা তিনজনও দেখেছিল। তা ছাড়া ওদের কথা মানতে হলে একথা মানতে হয় যে বাঘও এই অমঙ্গুলে পাখি দেখার কারণেই তার অন্ধকার গুহার আশ্রয় ছেড়ে আমার ফোর-ফিফটি ফোর হানড্রেড রাইফেলের গুলি খেয়ে মরার জন্যে এই সকালে এতখানি পথ ফাঁকাতে এসে আমার সামনে পৌঁছত না। অমঙ্গল বাঘেরও হয়েছিল।

তাহের আলি গেল রুদ গাঁয়ে লোক জোগাড় করতে বাঘকে বয়ে বাংলোয় নিয়ে যাবার জন্যে। শালকাঠের গুড়ি কেটে বাঘকে চৌদোলার মতো বয়ে আনতে জনাবারো লোক লাগবে। লতা দিয়ে সেই ডালগুলো বেঁধে চৌদোলা করবে। বাঘের ওজন তো কম নয়। তার ওপরে অত বড় বাঘ।

আমার কিছু ভাল লাগছিল না। পাইপের টোব্যাকো সব ফুরিয়ে গেলে ছাই ফেলে আবার টোব্যাকো ভরে কিছুটা টোব্যাকো সুখরাম আর কেরকেটাকে দিয়ে আমি বাংলোর দিকে এগোলাম। ওরা বাঘকে নিয়ে এলে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ বাঘ। পাকা মানুষখেকোও নয়। তাকে মারা মানুষের মিথ্যে শ্লাঘা ও বাহাদুরি প্রবণতাকেই উজ্জীবিত করা মাত্র। এই হত্যার কোনও মানে নেই। অথচ বন্ধুকৃত্যের জন্যে করতে হল।

তারপর একটু থেমে বলল, তোরা জানিস যে আমি একা বা তোদের সঙ্গে নিয়েও বা জেঠুমনির সঙ্গে যত বাঘ মেরেছি তার মধ্যে মানুষখেকো বা আকছার গাঁয়ের গোরু-মোষ মারা বাঘই বেশি। আমার বড় অপরাধী লাগে। বাঘ এমনই এক জানোয়ার যাকে আমি admire করিই শুধু নয়, adore করি। এই বাঘ মানুষ খেয়ে থাকতে পারে তবে তাকে মানুষখেকো আখ্যা দেওয়া যায়নি। দেয়ওনি কেউ। তা হলে তো আমরা যাবার আগে অন্য শিকারিরাই তাকে মেরে দিত।

তারপর?

কফির কাপগুলো ট্রেতে সাজাতে সাজাতে বলল তিতির।

তারপর কী? আমি যখন রুদ বাংলোর হাতাতে ঢুকলাম গেট দিয়ে তখন দেখি লিলি আর জনি রোদে বসে ব্রেকফাস্ট করছে। জুম্মান দাঁড়িয়ে ওদের খিদমতগারি করছে। গুলির শব্দ ওরা শুনেছিল এবং শুনে, বলাই বাহুল্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই দুজনে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, কী হল?

কী আবার হবে। লিলিয়ান সিম্পসন-এর বাঘ ওরা নিয়ে আসবে একঘণ্টার মধ্যে। হাতাতে শুইয়ে দেবে। তোমরা ছবি-টবি তুললে তাহের আলিরা চামড়া ছাড়িয়ে দেবে ওই নালার কাছে নিয়ে গিয়ে। চামড়া ছাড়ানো হলেই দিনে শকুন এবং রাতে শেয়াল ও হায়েনারা তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। এই নিয়ম প্রকৃতির।

জুম্মান বলল, নাস্তা ক্যা লাউ হুজুর?

বললাম স্ক্যামবলড এগস উইথ বেকন অ্যান্ড ফিঙ্গার চিপস। আর দুটো টোস্ট দিও মার্মালেড দিয়ে আর একপট কফি।

আমি বললাম, তাহের আলি যে গুলি করেছিল সেটা কোথায় লেগেছিল বাঘের?

ঋজুদা হেসে বলল, সেও এক রহস্য। তাহের আলি আমার-তোর চেয়ে অনেক ভাল শিকারি। সবরকম ওয়েপনই ও চালিয়ে অভ্যস্ত নানা সাহেব-সুবোর কল্যাণে।

কী মেরেছিল ও? এল. জি. না বল?

আমি বললাম।

রোটাক্স বল।

কোথায় লেগেছিল গুলি?

লেজে। তবে লেজের ডগাতে নয় গোড়াতে।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

ভটকাই বলল, এমন লেজে-খেলানো বাঘের কথা শুনিনি কোথাও।

তারপর বলল, এবার ভূতের গল্প দুটো?

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বলল, এ যাত্রা নয়। সব একসঙ্গে হয় না। গলা ব্যথা হয়ে গেছে। পালামৌর বেতলার আর বামরার কিলবগার ভূতের গল্প পরের বার যখন কোথাও যাব তখন হবে।

তিতির বলল, ইটস ভেরি মিন অফ উ্য ঋজুদা। তুমি কথা দিয়ে কথা রাখলে না।

রাখলাম না তা তো নয়। একটু পিছিয়ে দিলাম এই যা।

তারপর বলল, বলে ফেললেই তো ফুরিয়ে যাবে। থাক না বাকি।

আমি বললাম, খাবার লাগাতে বলি?

ঋজুদা বলল, বল। কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই। কাল জঙ্গলে তোদের দশ মাইল ট্রেকিং করিয়ে আনব। তোরা সইদূপ ঘাটে গেছিস? বারেষান-এ? মহুয়াডাঁর? যেসব জায়গাতে, ব্রেকফাস্ট খাবার পরে জিপে যাওয়া যাবে, মানে কোনও এক জায়গাতে। একেবারে সাতসকালে উঠে তার আগে ট্রেকিং।

ভটকাই দুটো হাতের পাতা ঘষে বলল ঈরে বাবাঃ। কী শীতরে বাবা। একেবারে কাঁড়িয়া পিরেত মারা শীত।